তবলীগে হেদায়াত

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রাঃ)

ভাষান্তর ঃ মৌলভী এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার (মরহুম)

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

বাংলা প্রথম সংস্করণ
রজব — ১৪২০
আশ্বিন — ১৪০৬
জানুয়ারী — ২০০০

২,০০০ কপি

মুদ্রণে ঃ
ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
মতিঝিল, ঢাকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

দু'টি কথা

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ, (রাঃ) আহমদীয়তের সেবায় বহু মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদি প্রণয়ন করেছেন। 'তবলীগে হেদায়াত' পুস্তকখানা তাঁর নিখুঁত সৃষ্টি। এতে আহমদীয়তের পরিচিতি তিনি দলীল-প্রমাণ ও যুক্তি মূলে জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি-অভিযোগের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক মরহুম মৌলভী এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার সাহেব কর্তৃক এ পুস্তকখানার বঙ্গানুবাদ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৫ সন থেকে আগষ্ট, ১৯৫৭ সন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পাক্ষিক আহ্‌মদীতে প্রকাশিত হয়ে আসছিলো। অনুবাদক গোটা পুস্তক খানা অনুবাদ করে যেতে পারেন নি। যতটা পাক্ষিক আহ্‌মদীতে প্রকাশিত হয়েছে সামান্য সম্পাদনাসহ হুবহু লেখকের ভাষায় ও বানান পদ্ধতি অনুসরণ করে তা এখন পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হলো। আল্লাহ্‌তাআলা মরহুম এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার সাহেবকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

পুস্তকখানা সম্পাদনা ও প্রুফ রিডিং-এর কাজ যৌথভাবে সম্পন্ন করেছেন মরহুমের সুযোগ্য পুত্র মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী এবং মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, নির্বাহী সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী। আল্লাহ্‌তাআলা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

এ পুস্তকখানা বাংলা ভাষা-ভাষীদের আহমদীয়তের হেদায়াত লাভে সহায়তা করলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

খাকসার

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ন্যাশনাল আমীর

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ ২৮ জানুয়ারী, ২০০০ইং

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

গ্রন্থকারের মুখবন্ধ

(মূলগ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণ উপলক্ষ্যে)

'তবলীগে-হেদায়াত' পুস্তকখানা আমি ১৯২২ সালের গোড়ার দিকে প্রণয়ন করেছিলাম। তখন আমি যুবক ছিলাম এবং আমার অধ্যয়নও ছিল অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু এ পুস্তকটিকে আল্লাহ্‌তাআলা স্বীয় আশীসক্রমে বরণীয় করেছেন, কবুলীয়ত দান করেছেন। সুতরাং আমাকে জানান হয়েছে যে, অনেকে এর সাহায্যে সত্যের সন্ধান পেয়ে হেদায়াত লাভ করেছেন এবং সাধারণভাবে সব শ্রেণীর লোকই পুস্তকটি অত্যন্ত পসন্দ করেছেন। 'ফাল্‌হাম্‌দুলিল্লাহি ওয়া মা তওফীকী ইল্লা বিল্লাহ্‌'- (এজন্য সমস্ত প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌রই এবং মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ও অনুগ্রহ ব্যতীত আমার কোনও যোগ্যতা নেই)।

এ যাবৎ এ গ্রন্থের পাঁচটি সংস্করণ ছাপার পরও এর সব কপি ফুরিয়ে যায়। এখন এটি হ'ল ৬ষ্ঠ সংস্করণ। এ সংস্করণটিতে আমি যৎসামান্য পরিবর্তন করেছি যার বেশীর ভাগই শব্দগত। কেননা, আমি ভাবলাম, যে-জিনিষটির সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা স্বীয় কৃপা ও আশিসক্রমে বরণীয়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন সেটি পরিবর্তন করা সমীচীন নয়। তবে দু'তিন জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী উদ্ধৃতি সংযোজিত করা হয়েছে এবং একটি জায়গায় বহির্বিশ্বে আহ্‌মদীয়া জামাত কর্তৃক ইসলাম প্রচার ও প্রসার সম্পর্কে তথ্যগত কিছু বিবরণ সংযোজিত হয়েছে। এই যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন সহকারে পুস্তকটির ৬ষ্ঠ সংস্করণ (সিন্ধি ভাষায় অনূদিত এর সংস্করণটি ব্যতীত) এই দোয়ার সাথে মুদ্রণালয়ে পাঠাচ্ছি যে, আল্লাহ্‌তাআলা ইহাকে পূর্বাপেক্ষাও অধিক কবুলিয়ত দান করুন এবং মানুষের হেদায়াত লাভের কারণ করুন। বস্তুতঃ এটাই পুস্তকটির একমাত্র লক্ষ্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিনীত

মির্যা বশীর আহমদ

রাবওয়া, ২৮শে মে, ১৯৫৮ইং

সূচীপত্র

তবলীগে হেদায়াত

মূল-হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)

অনুবাদ - এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার

অবতরণিকা

রেসালতের ধারাবাহিকতা ঃ

বিশ্ব-জগতের ধর্ম্মসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, আদিকাল হইতেই আল্লাহ্‌তাআলার এই অপরিবর্তিত বিধান চলিয়া আসিয়াছে যে, আঁধার ও অধর্ম্মের যুগে তিনি তাঁহার নিকট হইতে জগদ্বাসীর পথ প্রদর্শনের জন্য কোনো পবিত্র ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা সেই পবিত্র পুরুষের দ্বারা লোকের সংস্কার সাধন করেন এবং নিত্য নতুন জ্বলন্ত নিদর্শনসমূহের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করেন। ইহারই ফলে, মানুষ নাস্তিকতার তিমির হইতে মুক্তি লাভ করে। এই যে বিধান, ইহাই 'রেসালতের সেল্‌সেলা' বা ধারাবাহিকতা বলিয়া অভিহিত হয়।

অনন্তকাল হইতে এই ঐশী-বিধান কার্য্য করিতেছে। পূর্ব্বকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশবাসী ও জাতির মধ্যে পরস্পর মেলামেশার উপায়- উপকরণ ছিল না, থাকিলেও অত্যল্প ছিল। এক দেশের সহিত অন্য দেশের কোন যোগাযোগ ছিল না। এক জাতি অন্য জাতিকে জানিত না। বলিতে কি, তখন এক একটি দেশ ও জাতি লইয়া ছিল এক একটি পৃথক জগৎ। তখন আল্লাহ্‌তাআলার নিকট হইতেও ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রসূলগণ আগমন করিতেন।

কোর্‌আন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ-

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

"এমন কোন জাতি নাই যে, আল্লাহতাআলার নিকট হইতে তাহার মধ্যে কোন সতর্ককারী আসেন নাই" (সূরাহ্ ফাতের; রুকু ৩)।

সিরিয়া, মিশর, এরাক প্রভৃতি দেশে যেমন আল্লাহ্‌তাআলার রসূল আসিয়াছেন, ভারতবর্ষ, চীন, পারশ্য প্রভৃতি দেশেও তাঁহার রসূল আসিয়াছেন, এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহেও আসিয়াছেন। এইজন্য আমরা বিশ্বের সকল দেশের ও সকল জাতির মধ্যে যত রসূল আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই সত্যতা স্বীকার করি এবং তাঁহাদিগকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। হযরত নূহ্, হযরত ইব্‌রাহীম, হযরত মূসা এবং

হযরত ঈসা আলায়হেমুস্ সালামের উপর ঈমান আনিবার ন্যায় আমরা পারসিকদের যরথুস্ত্র, বৌদ্ধগণের গৌতমবুদ্ধ, চীনাদের কন্‌ফিউসিয়াস্ এবং হিন্দুদের শ্রীকৃষ্ণের (আলায়হেমুস্‌সালাম) প্রেরিত্ব-'রেসালত' স্বীকার করি; এবং নবীদের প্রাপ্য সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে আমরা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করি।

রেসালতের চরম উন্নতি

উল্লিখিত নবীগণ (আলায়হেমুস্ সালাম) এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য নবীগণ যে যুগে আগমন করিয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি একে অপরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল। এক দেশ অন্য দেশ হইতে পৃথক ছিল। তখন মানবজাতির মানসিক বিকাশের প্রারম্ভাবস্থা মাত্র। কিন্তু যখন সেই সময় ঘনাইয়া আসিল, যখন সমগ্র বিশ্ব একই দেশরূপে গড়িয়া উঠিবে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার সাড়া পড়িবে-উন্নতির পথে মানবজাতির যৌবনের উন্মেষ ঘটবে, তখন আল্লাহ্‌তাআলা ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন রসূল প্রেরণ করিবার পরিবর্তে, সমগ্র বিশ্বের জন্য একজন রসূল পাঠাইলেন; এবং বিশেষ সময়োপযোগী ও জাতি বিশেষের বিশেষ প্রয়োজন পূরণার্থে পৃথক পৃথক শিক্ষা না পাঠাইয়া সকল সময় এবং বিশ্বের সকল জাতির জন্য একটি মাত্র সর্ব্বাঙ্গীণ, পরিপূর্ণ গ্রন্থ অবতীর্ণ করিলেন। এই রসূল ছিলেন আব্‌দুল্লাহ্ নন্দন মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে আরব দেশে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি যে পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন, উহাই কোর্‌আন মজীদ।

ইসলামের জীবনী-শক্তির প্রমাণ - কোরআনের শিক্ষার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ঃ

এই পবিত্র রসূলের এবং এই পবিত্র কেতাবের মধ্যে রসূলগণের আগমন এবং ঐশী গ্রন্থ অবতরণের শৃঙ্খল উন্নতির চরমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ

" মোহাম্মদ (সাঃ আঃ) আল্লাহতাআলার এমন রসূল যে, তাঁহার মধ্যে রেসালতের যাবতীয় সৌন্দর্য ও গুণাবলী চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে" (সূরাহ্ আহ্‌যাব, রুকু ৫)।

"এই জন্য আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ করিয়াছি, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করিয়াছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে ধর্ম্মরূপে মনোনীত করিয়াছি" (সূরাহ্ মায়েদা, রুকু ১)।

কোর্‌আন করীমের দ্বারা খোদার শিক্ষা পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে এবং ইহার পর আর কোনো শরীয়ত বা ধর্ম্মবিধান নাই বলিয়া আল্লাহ্‌তাআলা বলিয়াছেন ঃ-

"নিশ্চয় আমিই কোর্‌আন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই ইহার হেফাযত করিব" (সূরাহ্ হিজর, রুকু ১)।

এইরূপ হেফাযতের অঙ্গীকার অপর কোন ঐশীগ্রন্থের জন্য করা হয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্তাআলার তরফ হইতে ছিল না, ইহার এই কারণ নয়। উপরে বলা হইয়াছে যে, কোর্আন শরীফের পূর্ব্বে যত কেতাব নাযেল হইয়াছিল, কাল ও স্থান উভয় দিক হইতেই উহাদের সীমা নির্দিষ্ট ছিল। উহাদের দ্বারা শুধু জাতি বিশেষের ও সময় বিশেষের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ হইত। সমগ্র বিশ্ব ও সর্ব্ব যুগের জন্য উহারা ছিল না।

অবশেষে, উহাদের যুগের অবসান হয়। তজ্জন্য, ঐসকল কেতাবের সহিত এই প্রকার অঙ্গীকারের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কোরআন শরীফের হেফাযতের প্রয়োজন ছিল। কারণ ইহা বিশ্বের সকল জাতির ও সর্ব্বযুগের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার ছিল। এই নিমিত্ত ইহা মৌলিক অবস্থায় সর্ব্বদা সুরক্ষিত হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।

এই হেফাযত দুইভাবে করা হইল–প্রথমতঃ শাব্দিক হেফাযত। দ্বিতীয়তঃ তাত্ত্বিক হেফাযত। হেফাযতের এই দুই দিকই আছে। হেফাযতের এক দিক হইল কোর্আন শরীফের শব্দগত হেফাযত অর্থাৎ, যে আকারে ইহা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল, অবিকল সেই আকারেই সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থায়, কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ব্যতীত ইহার শব্দগুলি সুরক্ষিত হইবে। হেফাযতের অপর দিক হইল কোর্আন শরীফের বিশুদ্ধ অর্থ প্রচলিত থাকা এবং ইহার শিক্ষার রূহ্ বিনষ্ট না হওয়া। কোর্আন শরীফ এই উভয় প্রকারেই সুরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মসমূহ এই প্রকার হেফাযত হইতে বঞ্চিত। পূর্ব্ববর্ত্তী কেতাবসমূহের শব্দগুলিও সুরক্ষিত হয় নাই এবং আল্লাহ্তাআলার তরফ হইতে উহাদের বিশুদ্ধ অর্থ অক্ষুণ্ন রাখিবার এবং উহাদের শিক্ষার অন্তরাত্মাকে সজীব রাখিবারও কোনই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কারণ, উহারা উহাদের কার্য্য সমাধা করিয়াছে এবং এখন উহাদের প্রয়োজন আর নাই। সুতরাং, উহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে, এবং নাম ব্যতীত ঐসকল গ্রন্থের কিছুই বাকী নাই। উহারা সেই বাগানের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহার বৃক্ষসকল আয়ুষ্কাল সমাপ্ত হওয়ায় বাগানের মালিক উহার তত্ত্বাবধান পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং এক নূতন বাগান লাগাইয়াছেন। কিন্তু ইসলামের অবস্থা ইহা নয়। ইস্লাম সজীব ধর্ম্ম, এবং চিরদিন সজীব থাকার জন্য ইহার প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

ইহা নাযেল হওয়ার সময় হইতেই, বহু ব্যক্তিকে হরফে হরফে কণ্ঠস্থ করানোর দ্বারা শাব্দিক হেফাযতের ব্যবস্থা হয়। তারপর, ইহার বহু অনুলিপি লিখিয়া সংরক্ষণ করা হয়। তারপর, ইসলামী রাষ্ট্রের দিক হইতে ইহার হেফাযতের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। শীঘ্রই ইহার লক্ষ লক্ষ অনুলিপি প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে প্রচার ও প্রসার লাভ করে। আজিও পৃথিবীর কোণে কোণে কোর্আন করীমের লক্ষ লক্ষ হাফেয আছেন। বস্তুতঃ ইহার এমনি হেফাযত হইয়াছে যে, ইসলামের শত্রুগণও স্বীকার করেন যে, বাস্তবিক বর্ত্তমান কোর্আন সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত, অক্ষুণ্ন অবস্থায় সেই কোর্আনই, যাহা সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর (সাঃ আঃ) উপর নাযেল হইয়াছিল। ইহার

হেফাযত বিশ্বের সর্ব্বত্র স্বীকৃত। (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্যার উইলিয়াম মুরকৃত 'লাইফ অব্ মোহাম্মদ' দ্রষ্টব্য)

তারপর, তাত্ত্বিক হেফাযতের কথা। ইহার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার তরফ হইতে এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক যুগে এরূপ ব্যক্তিগণ হইয়া আসিয়াছেন, যাঁহারা কোর্‌আন করীমের শিক্ষার রূহ্ জিন্দা রাখিবার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের দ্বারা ইহার শিক্ষা কায়েম হইয়া আসিতেছে।

তাঁহাদের প্রচেষ্টার ফলে সর্ব্বদাই ইসলাম ইহার জীবনী শক্তি হারানো হইতে–ইহার অন্তরাত্মার মৃত্যু এবং বাহ্যিকতা মাত্র বিদ্যমান থাকা হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। শুধু বহিরাবরণ রহিয়াছে এবং অন্তরাত্মার বিয়োগ সম্পূর্ণ ঘটিয়াছে, ইসলামের এইরূপ অবস্থা কখনো ঘটে নাই। যখনি মুসলমানগণ ধর্ম্মহীনতা ও অসদাচারের দিকে অবনত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইস্‌লামী শিক্ষার রূহ্ দুর্ব্বল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কুধারণাসমূহ ইসলামে প্রবেশ করিতে শুরু হইয়াছে, মুসলমানের ঈমান দুর্ব্বলতার দিকে যাত্রা করিয়াছে, নাস্তিকতার আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ হইয়াছে এবং আধ্যাত্মিক (রূহানী) অবস্থার পতন দেখা দিয়াছে–বস্তুতঃ যখনি অধার্ম্মিকতা জোর বাঁধিয়াছে, আল্লাহ্‌তাআলার ইহাই তখন রীতি রহিয়াছে যে, তিনি মুসলমানগণের হেদায়াতের জন্য তাঁহার আদেশসহ কোনো 'মোজাদ্দেদ' (ধর্ম্ম সংস্কারক) দাঁড় করিয়াছেন, যেন তিনি খোদাতাআলার তাজা নিদর্শনসমূহের দ্বারা লোকের ঈমান সঞ্জীবিত করেন, এবং মোজাদ্দেদ তাঁহার পবিত্র আদর্শের সাহায্যে তাহাদিগকে আবার ধর্ম্মের উপর দৃঢ়রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দ্বারা ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন, এবং তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বিকৃত ধারণাসমূহের সংস্কার সাধন করেন। এইরূপ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই ইসলামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং ইহাই ইসলামের প্রাণ-শক্তি জীবিত থাকিবার প্রমাণ।

কারণ, ইহা হইতে জানা যায় যে, ইসলাম একটি পরিত্যক্ত বাগানের মত নহে, বরং ইহার মালী সর্ব্বক্ষণ ইহার সংরক্ষণের, ইহার সংস্কারের ধ্যানে নিবিষ্ট। ইহার বৃক্ষগুলির আয়ুষ্কাল শেষ হয় নাই। উহারা এখনো ফলোৎপাদন করিতেছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মগুলির অবস্থা ইহা নয়। উহাদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তিদের কোন অস্তিত্ব নাই, যাহারা খোদার আদেশে জগৎ সংস্কারের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং খোদার বাণী ও নৈকট্য লাভের মহাসম্মান লাভ করেন।

বাহ্যিক জ্ঞান জীবনী-শক্তির পরিচায়ক নয় জীবনপ্রদও নয়ঃ

অবশ্য, বাহ্যিক জ্ঞানের দিক দিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মেরই উলামা আছেন। কিন্তু এই প্রকার জ্ঞান জীবনী শক্তির পরিচায়ক নহে। কারণ, এই সকল জ্ঞানীদের মূল্য উজাড় বাগানে প্রাপ্ত শুষ্ক কাষ্ঠগুলির চাইতে অধিক কিছু নয়। 'জীবন' অর্থে বুঝায়

আল্লাহ্‌তাআলার নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবন্ত বাণীর দ্বারা জীবন লাভপূর্ব্বক বিশ্বের সংস্কারার্থে কাহারো দাঁড়ানো। কিন্তু খুব অনুসন্ধান করুন, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোথাও এইরূপ লোক দেখা যায় না। বিশ্বের সংস্কার যে কেহ করিতে পারে না। শুধু বাহ্যিক জ্ঞানের সাহায্যে নাস্তিকতার তিমির গহ্বর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তৌহীদ ও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানকে অবিচলিত সুদৃঢ় মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। জাহেরী জ্ঞানের বলে খোদার অস্তিত্ব কেহ শুধু এই পর্য্যন্তই স্বীকার করাইতে পারে যে একজন খোদা থাকা আবশ্যক। ইহার অধিক নয়। কিন্তু এই ঈমান কি নাজাতের পক্ষে যথেষ্ট? এই পর্য্যায়ের ঐশীজ্ঞান মানব জীবনে কোন যথার্থ 'ইনক্লাব'-প্রকৃত আমূল পরিবর্ত্তন আনিতে পারে কি? কখনো নহে। নাজাতের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা সম্বন্ধীয় আমাদের প্রত্যয়, তাঁহার প্রতি আমাদের ঈমান এই পর্য্যায়ের হওয়া অত্যাবশ্যক, যেন আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের ঈমান "থাকা আবশ্যক" সীমায় না থাকিয়া "আছেন" এই পর্য্যায়ের নিশ্চিত জ্ঞান ও ধ্রুব প্রত্যয়-'একীনের' সীমায় পৌঁছিতে হইবে। এই প্রকার ঈমানের দ্বারা আত্মসংস্কার হয়, মনে যথার্থ প্রত্যয় জন্মে, প্রবৃত্তির নীচাকাঙ্ক্ষা দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, মানুষ এক প্রকার নব জীবন লাভ করে, তাহার মধ্যে এক নতুন আত্মার সৃষ্টি হয় এবং স্রষ্টার সহিত তাহার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এমন কি খোদা স্বয়ং বান্দার সহিত বাক্যালাপ করেন, তাহার দোয়া শোনেন এবং তাহার প্রার্থনার উত্তর দেন। কিন্তু এই সকল বিষয় জাহেরী, বাহ্যিক জ্ঞানের দ্বারা সাধন হয় না। বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিতদের পক্ষে উল্লিখিত জ্ঞান থাকা জরুরীও নয়।

ইসলামে মোজাদ্দেদের ব্যবস্থা ঃ

বস্তুতঃ ইহা ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রয়োজনকালে ইসলামে সর্ব্বদাই এইরূপ ব্যক্তিগণ বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহারা আল্লাহ্‌তাআলার সহিত বাক্যালাপ করিতেন, এবং খোদা হইতে আত্ম-সংস্কার লাভকরতঃ যাঁহারা বিশ্বের সংস্কারে ব্রতী হইতেন। তাঁহাদের দ্বারা ইসলামের শিক্ষার প্রাণ জীবিত থাকিত। এহেন ব্যক্তিগণ সব সময়েই ইসলামে জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শতাব্দীর শিরোভাগে তাঁহারা বিশেষতঃ আবির্ভূত হন। কারণ, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ঃ-

"আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যেক শতাব্দীর শীর্ষভাগে এরূপ কোন ব্যক্তিকে উত্থিত করিবেন, যিনি তাহাদের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ভ্রান্তিসমূহের ইসলাহ্ করিয়া তাহাদিগকে নব জীবন প্রদান করিবেন" (আবূ দাউদ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২১)।

বস্তুতঃ অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যায় যে, এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে বিশেষরূপে এবং অন্য সময়ে সাধারণভাবে, এরূপ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদেরই দ্বারা কোর্‌আন শরীফের মৌলিক শিক্ষা এবং ইসলামের প্রকৃত আত্মিক শক্তি যুগোপযোগীরূপে সুপ্রকাশিত হইতেছে। খোদাতাআলার

জিন্দা কালামের সাহায্যে তাঁহারা লোকের জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সংশোধন (ইস্‌লাহ্) করিয়া আসিয়াছেন। শেখ আব্দুল কাদের জিলানী, মোজাদ্দেদ আলফে-সানী, শেখ আহমদ সাহেব সরহেন্দী, শাহ্ অলিউল্লাহ সাহেব দেহ্‌লবী, সৈয়দ আহমদ সাহেব বেরেলবী প্রভৃতি (রহমতুল্লাহে আলায়হিম আজমায়ীন) এই পবিত্র সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল ব্যক্তিগণ খোদা হইতে হেদায়াত প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বের ইসলাহ্ -সংস্কার সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা স্ব স্ব জামানার ঐ সকল ভ্রান্তির অপনোদন করিয়াছেন, যাহা সংশোধন করিবার সময় তখন উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহা পরিষ্কৃত করা তখন খোদাতাআলার কিছুটা অভিপ্সিত ছিল।

শিক্ষার পূর্ণতা সত্ত্বেও সংস্কারকের আবশ্যকতা

এখানে কাহারো মনে এই সংশয়ের উদ্রেক হওয়া বিচিত্র নয় যে, কোর্‌আন শরীফের শিক্ষা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ও পরিণত থাকিতে কোনো সংস্কারকের প্রয়োজন কি? এই শিক্ষা বিদ্যমান থাকিতে কোনো সংস্কারকের প্রয়োজন কী? এই শিক্ষা পালনের ফলে প্রত্যেকেই তাহার আত্ম-সংস্কার করিতে পারে।

ইহা একটি ভ্রমাত্মক ধারণা। যেহেতু ঃ—

প্রথম, আমাদের অভিজ্ঞতা ইহাকে একটি ভ্রান্ত ধারণা বলিয়া নির্ধারণ করে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, কামেল শিক্ষা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা—কি ধর্ম্মের, কি দুনিয়ার—উভয় দিকেই দিন দিন অবনতির দিকে যাইতেছে। অধোগমনের বোধ সত্ত্বেও তাহারা উঠিতে পারিতেছে না। অতীত যুগসমূহের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর ইতিহাস যখন হইতে সুরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, ধর্ম্মের দিক হইতে পতনের পর কোনো জাতিই নিজে নিজে উঠে নাই, উঠিতে পারে নাই।

দ্বিতীয়, খোদাতাআলার 'সুন্নত'—তাঁহার চিরাচরিত নিয়ম এই ধারণাকে বৃথা বলিয়া নির্ধারণ করে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই, আদিকাল হইতে খোদাতাআলার এই বিধানই কার্য্য করিতেছে যে, প্রত্যেক অন্ধকার যুগে তিনি কোনো সংস্কারক প্রেরণ করেন। দেখুন, হযরত মূসার (আঃ) উম্মতের জন্য তৌরাতে পূর্ণাঙ্গীণ শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শিক্ষা তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেক আঁধারের সময় তাঁহার নিকট হইতে কোনো সংস্কারক প্রেরণের দ্বারা তাঁহার সাহায্যে মূসায়ী উম্মতের সংস্কার করিয়াছেন। কোর্‌আন শরীফে উক্ত হইয়াছেঃ—

"আমরা মূসার পর তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে রসূলের পর রসূল পাঠাইয়াছি" (সূরাহ্ বাকারাহ্ রুকু ১১)।

তৃতীয়, আমাদের শিক্ষা কামেল হওয়ার অর্থ, আল্লাহ্‌তাআলা আধ্যাত্মিক উন্নতির যাবতীয় পন্থা ইহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণরূপে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের

আধার। কিন্তু মানুষের ব্যাখ্যার ফলে এই শিক্ষার অবয়বের বিকৃতি ঘটিলে এবং ইহার আত্মা নষ্ট হইলে, সকল আবরণমুক্ত হইয়া আবার ইহাতে মৌলিক রূহ উৎপাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত, ইহা বাস্তবিক কোনো প্রকার সংস্কার কার্য্য সাধন করিতে পারে না। পূর্ণ শিক্ষা অবশ্য সুতীক্ষ্ণ তরবারিস্বরূপ। কিন্তু উহা পরিচালনার জন্য বিশেষ ব্যক্তির প্রয়োজন।

চতুর্থ, কোনো শিক্ষা যতই পূর্ণ হউক না কেন, পূর্ণ আদর্শ ব্যতীত উহা অসম্পূর্ণই থাকে। সুতরাং খোদাতাআলার পথে পদক্ষেপ রাখিবার মত যাবতীয় স্তরসমূহের প্রত্যক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন আধ্যাত্মিক সংস্কারকের দ্বারা আল্লাহ্তাআলা জগতে ইসলামী শিক্ষার আদর্শ সংস্থাপন করেন।

পঞ্চম, আল্লাহ্তাআলার উপর ঈমান এমন এক বৃক্ষ যে, তাজা নিদর্শনাবলীর দ্বারা ইহাতে জল সিঞ্চন না করা হইলে এই বৃক্ষটির মৃত্যু হয়। যখন, "তিনি থাকা সম্ভবপর" এই বিপদ সঙ্কুল পর্যায় আসিয়া দাঁড়ায়, তখন সন্দেহ-সংশয়ের বিষময় বায়ু উহাকে অচিরাৎ শুষ্ক করিয়া ফেলে। কিন্তু নবী এবং আওলিয়াদের সংস্পর্শে যে ঈমান উৎপন্ন হয়, তাহা এক জ্বলন্ত, জীবন্ত বস্তু। উহার দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। মানুষ আল্লাহ্তাআলার সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্যতা লাভ করে। সে এক নতুন জীবন পায়। সুতরাং পূর্ণ শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও এইরূপ ব্যক্তিগণের আবশ্যকতা আছে, যাঁহারা খোদাতাআলার গুণাবলীর মূর্ত্ত প্রকাশস্বরূপ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের দ্বারা তাজা নিদর্শনসমূহের প্রবাহ হয়। ইহা ছাড়া, খোদাতাআলার জিন্দা কালামের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক সংস্কারকের মধ্যে এক প্রকার আকর্ষণী শক্তি থাকে। উহার দ্বারা তিনি উপযুক্ত আত্মাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন। প্রকৃতপক্ষে, এই আকর্ষণই ঘুমন্ত ব্যক্তিদিগকে জাগ্রত করে।

ষষ্ঠ, 'ইস্লাহ্' বা সংস্কার প্রকৃত সংস্কার না হইলে সুফল উৎপন্ন না হইয়া কুফল ফলে। আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের সম্পর্ক হইতেছে আল্লাহ্তাআলার সহিত। তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হন–তাঁহার তাজা, জিন্দা কালাম হইতে জীবন লাভ করেন–এইরূপ কোনো কামেল, সিদ্ধ পুরুষের সাহায্য ব্যতীত, সুনিশ্চিত উপায়ে, বিশুদ্ধ সংস্কার কখনো সম্ভবপর নহে। একজন জাহেরী আলেম ও তাঁহার জাহেরী জ্ঞানের দ্বারা যে সংস্কার হওয়া সম্ভবপর, তাহা কোনো কোনো বিষয়ে ঠিক হইলেও বহু বিষয়েই ঠিক হইবে না। সুতরাং, আজ ইসলামী জগতে মত-বিরোধের যে দৈত্য বিরাজ করিতেছে, খোদাতাআলার নিকট হইতে কোনো ব্যক্তি "হাকাম্" বা "মীমাংসাকারী" হইয়া মীমাংসা না করা পর্য্যন্ত, তাহা কীরূপে দূরীভূত হইতে পারে?

সপ্তম, রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'ইসলামে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ আবির্ভূত হইতে থাকিবেন'। ইহা স্বয়ং এ কথার সাক্ষ্য যে, শরীয়ত পূর্ণ ও মোকাম্মেল হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে।

অষ্টম, ইসলামে এই প্রকার যে সকল মহাব্যক্তিগণের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের অস্তিত্বও কার্য্যতঃ তাঁহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করে।

বস্তুতঃ প্রত্যেক আঁধারের সময় খোদাতাআলার নিকট হইতে কোনো আধ্যাত্মিক সংস্কারকের আবির্ভাব হওয়া অত্যাবশ্যক। কার্য্যতঃ ইসলামের সহিত আজ পর্য্যন্ত তাঁহার এই অলঙ্ঘ্য নিয়মই চলিয়া আসিয়াছে। তিনি তাঁহার 'এল্‌হাম' সহ তাঁহার 'পাক' বান্দাদিগকে ইস্‌লামের সাহায্য এবং মোসলমানগণের সংস্কারের উদ্দেশ্যে দাঁড় করিয়া আসিতেছেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীও ইহাই নির্দেশ করে যে, প্রত্যেক আঁধারের সময়ে সাধারণতঃ এবং শতাব্দীর শীর্ষভাগে বিশেষতঃ মোজাদ্দেদ পাঠানো হইবে।

আখেরী জামানায় বিশেষ ফেৎনার ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

আঁ হযরত সল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়াসাল্লাম সাধারণ মোজাদ্দেদগণ সম্বন্ধে যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি মোসলমানদিগকে এই খবরও দিয়াছিলেন যে, শেষ যুগে অসাধারণ উপায়ে বহু দারুণ ফেৎনা দেখা দিবে।

তিনি বলিয়াছেন ঃ–

"সত্যিকার জ্ঞান লোপ পাইবে। কোর্‌আন শরীফের মূল শিক্ষা লোকের মন হইতে মুছিয়া যাইবে। নাস্তিকতা জোর বাঁধিবে। লোকের 'আমল' খারাপ হইবে। মোসলমানগণ তাহাদের দুষ্ক্রিয়ায় ইহুদীদের পদে পদে চলিবে। তাহাদের নিজেদের মধ্যে বহু মতানৈক্য ঘটিবে। মোসলমানেরা অনেক 'ফিরকায়' বিভক্ত হইবে। উলামাদের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। এমন কি, আস্‌মানের নীচে উলামারা নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হইবে। ইস্‌লাম চারিদিক হইতে নানা প্রকার বিপদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। যাবতীয় ধর্ম্মগুলি ইস্‌লামের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা করিবে। বিশেষতঃ খৃষ্টান ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইবে। 'দাজ্জাল' সদলবলে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবে। বস্তুতঃ, কি অভ্যন্তরীণ, কি বাহির–উভয় দিক হইতেই সেই যুগ ইস্‌লামের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। এইরূপ যুগ ইতঃপূর্ব্বে কখনো আসে নাই, পরেও আসিবে না" (হাদীসের কেতাবসমূহে 'বাবুল্ ফেতান' প্রভৃতি অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

ইস্‌লাম ও মুসলমানদের বর্ত্তমান অবস্থা ঃ

এখন দেখিতে হইবে, সেই যুগ আসিয়াছে কিনা? মুসলমানের ধর্ম্মাবস্থা কি উপরের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ এক নয়? কতজন আছেন যাঁহারা প্রকৃতই খোদার উপর ঈমান রাখেন? মৌখিক, গতানুগতিক ঈমান নহে, বরং যে ঈমানের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে–সেই ঈমান। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের রেসালতের উপর মনে-প্রাণে একীন রাখেন, এরূপ কতজন আছেন? ঐশীবাণী–

এলহাম, ফিরিশ্‌তাগণ, মৃত্যুর পর জীবন, তক্‌দীর, আমলের প্রতিফল প্রভৃতি আকায়েদের বিষয়গুলি কতজন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন? ইস্‌লামের শিক্ষার সহিত কয়জনের পরিচয় আছে? কয়জন ইসলামের মর্ম্ম অবগত আছেন? কয়জন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি পালন করেন? কতজন ধর্ম্মকে পার্থিব যাবতীয় বিষয়-আশয়ের উপরে স্থান দেন? ইস্‌লামী জাহানে কি মদ্যপান, জেনা, জুয়া, সুদ, ডাকাতি, খুন, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যা, অন্যায়রূপে অর্থ আহরণ ও নিষিদ্ধ ভোজন প্রভৃতি জোর চলিতেছে না? মৌলবীদের জীবন পদ্ধতি কি ইসলামী জীবন যাত্রার আদর্শের অনুরূপ? অধিকাংশ মৌলবীই চরম বে-দীন, চরিত্রহীন ও 'বদ-আমল', একথা কি সত্য নয়? তাহারা ধর্ম্মের আকৃতিই বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে, সত্য নয় কি? অভ্যন্তরীণ মত বিরোধের কোনো সীমা আছে কি? ইস্‌লামের বাহ্যিক প্রভাব প্রতাপ–ইহার জাহেরী 'শান-শওকত' কি শবাধারে শায়িত নহে?

এই ত গেল ইস্‌লামের অভ্যন্তরীণ অবস্থা। চিত্রের অন্য দিক্! ইস্‌লাম বাহির হইতেও আক্রান্ত হইতেছে। ইহা যেন আজও নাই, কালও নাই। প্রত্যেক জাতিই ইস্‌লামের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে এবং চারিদিক হইতেই আক্রমণ চালাইতেছে। নবীদের প্রধান মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ঘৃণিত হইতেও ঘৃণিত আপত্তিসমূহ উত্থাপিত হইতেছে। তাঁহার বিরুদ্ধে অতি জঘন্য অভিযোগ আনয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইসলামের শিক্ষা অত্যন্ত বিকৃতভাবে উপস্থাপনপূর্বক তাহা লইয়া হাসি-বিদ্রূপ করা হয়। খৃষ্টীয়ানধর্ম অত্যন্ত প্রবল রূপ ধারণ করিতেছে, এবং রাষ্ট্র শক্তির বাহুমূলে অবস্থানের ফলে অপরাপর ধর্ম্মের রক্তে প্রতিপালিত হইয়া উন্নতি করিতেছে। হিন্দু-ধর্মও আর্য্য সমাজের পতাকার অধীনে মাথা চাড়া দিয়াছে এবং ইস্‌লামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করিতেছে। নাস্তিকতা সুশ্রী রূপ ধারণপূর্বক আপনাকে উপস্থিত করিতেছে, এবং পৃথিবীর সর্বত্র জাল বিস্তার করিয়াছে।

বস্তুতঃ, ইস্‌লাম তুমুল বাত্যায় নিপতিত। যদি খোদার হাত ইহার রক্ষার্থে সম্প্রসারিত না হয়, ইহার তীরে ভীড়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই সকল অবস্থা একত্রে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, এই যুগ সম্বন্ধেই নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছিলেন। চিন্তা করিলে দেখা যায়, শুধু ইস্‌লামের প্রবর্ত্তকই নহেন– প্রত্যেক নবীই এই যুগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব উম্মতকে এই তুফানের সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছিলেন। এই যুগ, প্রকৃতপক্ষে, শুধু ইস্‌লামের জন্যই বিপজ্জনক নহে, বরং যাবতীয় ধর্মাবলীর পক্ষেই এক সাধারণ আপদ- স্বরূপ। খৃষ্টীয়ান ধর্মের জোর দেখা গেলেও, ইহা বাস্তবিক খৃষ্টীয়ান ধর্মের বল নহে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে, খৃষ্টীয়ান ধর্ম ইসলামের বহির্ভূত নয়-ইহা ইসলামেরই অন্তর্গত। খৃষ্টের পর, তাঁহার শিক্ষায় যে সকল ধারণা অনুপ্রবেশ করে, ঐ সকল ভ্রান্ত ধারণাই জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুত:, সেগুলিও জোর বাঁধে নাই, বরং খৃষ্টীয়ান জাতির শক্তি বৃদ্ধি হওয়াতেই প্রবল বেগে অধর্ম ও নাস্তিকতা জগতময় ছড়াইয়া

পড়িতেছে। বস্তুতঃ, ইহা এক সর্বব্যাপক ফেৎতা-ফাসাদের যুগ। ইহার সম্বন্ধে সকল নবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং স্ব স্ব উম্মতকে সতর্ক করিয়াছিলেন।

আখেরী জামানার ফেৎনার প্রতিকার

কেবলমাত্র সতর্কীকরণ ও ভয় প্রদর্শনই নবীর কাজ নয়। নবী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারও বলিয়া দেন, যেন প্রতিকার অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিরা রক্ষা পায়। উল্লিখিত বিপ্লবগুলি উল্লেখপূর্বক সকল নবীই এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা তখন একজন আধ্যাত্মিক সংস্কারক তাঁহার চিরাচরিত প্রথানুসারে প্রেরণ করিবেন। এই সংস্কারকের দ্বারা তিনি বিশ্বের সংস্কার করিবেন এবং আঁধার দূরীভূত করিবেন। যে সকল লক্ষণাবলীর সাহায্যে এই সংস্কারকের পরিচয় পাওয়া যাইবে, নবীগণ তাহাও জ্ঞাপন করিয়াছেন। বর্তমানে সকল জাতিই স্ব স্ব সংস্কারকের অপেক্ষা করিতেছেন। সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, এই যুগ সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। মোসলমানগণ মসীহ্-মাহ্‌দীর অপেক্ষায় আছেন। খৃষ্টীয়ান ধর্মাবলম্বীরা যিশুর পুনরাগমনের আশা পোষণ করেন। হিন্দুরা তাঁহাদের অবতারের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। এইরূপই অন্যান্য জাতিদের কথা। কিন্তু, ইসলাম ব্যতীত সকলেই একটা ভুল করিতেছেন। প্রত্যেকেই মনে করিতেছেন যে, তাহাদের ধর্মই জীবন্ত ধর্ম। কিন্তু ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল ধর্মেরই মৃত্যু হইয়াছে। উহাদের আয়ুষ্কাল পূর্বেই শেষ হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই যে, ইস্‌লাম প্রবর্ত্তকের পর, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে ঐশীবাণী প্রাপ্ত কেহই আগমন করেন নাই– যাঁহাকে খোদা তাঁহার বাণীর দ্বারা বিশ্ব সংস্কারের জন্য দাঁড় করিয়াছেন– যিনি খোদার তাজা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে যিনি তাঁহার প্রেরিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। যখন ইহাই নাই, তখন ধর্মের সজীবতার অর্থ কি? বস্তুতঃ, এখন কোনো সংস্কারক ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো উম্মতে আবির্ভূত হইতে পারে না। এই কারণে, ইহাই সুনির্দিষ্ট ছিল যে, আখেরী জামানায় সমস্ত নবীর প্রতিবিম্বরূপে একই মহাপুরুষ ইসলামে আবির্ভূত হইবেন। তিনি সব ধর্মমতাবলম্বীদের সংস্কার সাধন করিবেন। সুতরাং, যাঁহার আসিবার কথা, তিনি এক দিকে মোসলমানগণের মাহ্‌দী, অন্য দিকে খৃষ্টীয়ানদের মসীহ্; তিনি হিন্দুদের জন্য কৃষ্ণ। এইরূপে, তিনি বিভিন্ন নামে সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত শেষ যুগের সংস্কারক।

আমরা বিশ্বের নিকট সুসংবাদ দিতেছি, যিনি আসিবার ছিলেন, তিনি আসিয়াছেন। তিনি হযরত **মির্যা গোলাম আহ্‌মদ** সাহেব কাদিয়ানীর ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছেন। যাহার চক্ষু আছে, দেখিতে পারে। যাহার কান আছে, শুনিতে পারে। খোদা তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন, এবং নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। এখন মানা, না মানা প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্তব্য। ধন্য তিনিই, যিনি সময়ের পরিচয় লাভ করেন এবং এই সংস্কারককে গ্রহণপূর্বক খোদাতাআলার সেই সকল পুরস্কারের উত্তরাধিকারী

হন, যাহা তিনি অনন্তকাল হইতে নবীগণের অনুবর্তী জামাতসমূহের জন্য সুনির্দিষ্ট করিয়াছেন। আক্ষেপের পর আক্ষেপ যে, যারা সংস্কারকের প্রতীক্ষায় দিবা-রাত্রি পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, যেই তিনি আসিলেন, তাঁহাকে অস্বীকার করিল এবং খোদার গজব মাথায় লইল। যদি প্রমাণ চাও অভাব নাই, কিন্তু দেখিবার মত চক্ষুর প্রয়োজন। কারণ সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্তি ও প্রমাণসহ আসিয়াছিলেন মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম। কিন্তু দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষু তাঁহাকেও দেখিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন আলোর চাঁদ, হেদায়াতের সূর্য্য। কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে কয় জন? "মক্কার হাকীম"* তাঁহাকে চিনিয়াছিল কি? গ্রিক্‌পন্থী ফিলসফারগণ তাঁহাকে চিনিয়াছিল কি? বর্তমানে ইয়ুরোপীয় তাত্ত্বিকগণের চক্ষু তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছে কি? কোরআন করীমে যথার্থই বলা হইয়াছে ঃ-

"যাহাকে খোদা বিপথগামী বলিয়া নির্ধারণ করেন, তাহাকে হেদায়াত করিতে পারে কে? খোদা শুধু অন্তর্চক্ষুহীন ব্যক্তিদিগকেই বিপথাচারী বলিয়া নির্ধারণ করেন" (সূরাহ্ বাকারাহ্, রুকু ৩)

"নতুবা, আমাদের পথে যাহারা প্রকৃত সংকল্প হইয়া প্রচেষ্টা করে, আমরা তাহাদিগকে অবশ্যই সোজা পথ দেখাইয়া থাকি" (সূরাহ্ আন্‌কবূত, রুকু ৭)।

হযরত মির্যা সাহেবের দাবী ঃ

উপরে আমরা বলিয়াছি, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী খোদা হইতে এল্‌হাম প্রাপ্ত হইয়া দাবী করেন যে, তিনি মোসলমানগণের জন্য মাহ্‌দী, খৃষ্টীয়ানদের জন্য মসীহ্, হিন্দুদের জন্য কৃষ্ণ এবং অন্যান্য জাতিদের জন্য তাহাদের প্রতিশ্রুত সংস্কারক। খোদা তাঁহাকে এযুগে বিশ্বের আধ্যাত্মিক সংস্কার সাধনের জন্য পাঠাইয়াছেন। কিন্তু খোদাতাআলার চির বিধান অনুসারে, এখন পর্যাপ্ত অল্প সংখ্যক ব্যক্তিগণই মাত্র তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে যাহারা, তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক। খোদা তাহাকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়াছেন ঃ-

"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছে, পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই; কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহের দ্বারা তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করিবেন।"

ইহা আল্লাহ্‌র বাণী। ইহা পূর্ণ হইবেই হইবে। ধন্য তাহারা, যাঁহারা শাস্তির কারণে নহে, প্রেমের আবেগে গ্রহণ করেন; এবং ভয়ে নহে, প্রেমভরে আহ্বানকারীর আহ্বানে কান দেন। আমরা তাঁহাদেরই উদ্দেশ্যে এই পুস্তকে সংক্ষেপে এই আধ্যাত্মিক সংস্কারক–এই রূহানী মোসলেহের সত্যতার প্রমাণ লিখিতে চাহিতেছি, যেন তৃষ্ণাতুরগণ

টীকা ঃ আবূ জাহল আঁ হযরতের (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) ঘোরতম শত্রু ছিল। তাহার বুদ্ধি বিবেচনার জন্য মক্কাবাসীগণের মধ্যে সে "আল হাকাম্" নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, 'জ্ঞান ও বুদ্ধির পিতা'। তবু, সে হেদায়াত হইতে বঞ্চিত ছিল।

পানি পাইয়া পরিতৃপ্ত হন, ক্ষুধার্তেরা আহার পাইয়া উদর পূর্ণ করেন, এবং যাঁহারা সন্দেহ-সংশয়ের বাত্যায় কম্পন করিতেছেন, তাঁহারা এই আধ্যাত্মিক সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হন।

আমরা এই পুস্তকে শুধু ইসলামী পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের দাবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিব এবং কোরআন শরীফ, সহীহ্ হাদীস এবং খোদা-প্রদত্ত বিচার- বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে তাঁহার সত্যতা পর্যালোচনা করিব। অন্যান্য ধর্ম্মসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি এবং উহাদের বর্ণিত লক্ষণাবলীর দিক হইতে, তাঁহাকে যাচাই করিবার মত স্থান সংকুলান, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে সম্ভবপর নহে। এই প্রশ্নের বিচার এখন আমাদের লক্ষ্য-বস্তু নয়।

'সৃষ্টির নিয়ন্তা আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া আমাদের কোনো সামর্থ্য নাই'–'ওয়া-মা তৌফিকুনা ইল্লাবিল্লাহিল আযীম।'

গবেষণার উপায়

প্রথমে আমরা গবেষণার পদ্ধতি কি হইবে, এই প্রশ্নের বিচার করিতেছি। গবেষণা সর্বদা কোন নীতি অবলম্বনে করিতে হয়। নতুবা, কখনো যথার্থ ফল পাওয়া যায় না, বরং অন্ধকারেই হাতড়াতে হয়। অন্ধের হাতী দেখিবার গল্প প্রসিদ্ধ। একবার চারি অন্ধের হাতী দেখার আগ্রহ হওয়ায় তাহারা একজন প্রতিবেশীকে বলিল, "এখানে কোন হাতী আসিলে আমাদিগকে বলিবেন। আমরা হাতী কেমন দেখিতে চাই।" কিছু দিন পর একটি হাতী ঐ স্থান অতিক্রমকালে ঐ ব্যক্তি তাহাদিগকে খবর দিল। তাহারা হাতীর নিকট গেল। একজন হাতীর পেটে হাত দিল, একজন হাতীর পায়ে হাত দিল, একজন হাতীর শুঁড় স্পর্শ করিল এবং চতুর্থ ব্যক্তি হাতীর কানে হাত রাখিল। তাহারা ঐ সকল স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে দেখা শেষ করিলে, কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, হাফেজ সাহেবান, বলুন, হাতী কেমন? প্রথম অন্ধ বলিল, "হাতী মোটা সোটা একটা বিরাট দেহ-ই দেহ।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, "না, না ইহা সত্য নয়। হাতী একটি দীর্ঘ উচ্চ স্তম্ভের ন্যায়।" তৃতীয়জন কহিল, "ইহারা উভয়েই মিথ্যা কথা বলিয়াছে। হাতী গরুর লেজ বিশেষের ন্যায় একটি কোমল মাংসপিন্ডস্বরূপ।" চতুর্থ ব্যক্তি উঁচু আওয়াজে বলিল, "মনে হয়, ইহারা সকলেই ভুল করিতেছে। হাতী একটি চৌড়া পাখার ন্যায়।" ইহা একটি গল্প বটে। কিন্তু ইহা হইতে শিখিবার আছে। যে পর্যন্ত অন্তর্চক্ষু মেলিয়া কোনো বিহিত নীতি অনুযায়ী কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করা না হয়, ফল সর্বদাই ভুল হইয়া থাকে। সুতরাং আমরা হযরত মির্যা সাহেবের দাবী সম্বন্ধে কোন সঙ্গত, সঠিক নীতি অবলম্বনের দ্বারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। যথার্থ, অভ্রান্ত নীতি আমরা পাই, কোরআন শরীফ, সহীহ্ হাদীস, পূর্ববর্তী নবীগণের অবস্থা হইতে এবং খোদা-প্রদত্ত বিচার, বুদ্ধি ও যুক্তিতে।

গবেষণার বিশ্লেষণ ঃ

গবেষণার নীতি স্থির করিবার পূর্বে গবেষণার প্রকার পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং জানা আবশ্যক, গবেষণার দুইটি উপায়ে আছে। প্রথম, গ্রন্থীয় বিচার। দ্বিতীয়, যৌক্তিক বিচার। প্রথমোক্ত উপায় দেখিতে হয় যে, গ্রন্থোল্লেখিত যুক্তিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন শ্রুতি, বিবৃতি, বাণী বা লিপির উপর নির্ভরমূলে যুক্তিসমূহের দিক হইতে দাবীকারকের দাবীর উপর কীরূপ আলোক পাওয়া যায়। তারপর দেখিতে হয় গ্রন্থোক্ত যুক্তি-প্রমাণ যাহাই থাকুক না কেন, বিশুদ্ধ যুক্তি বিচার-বিবেচনার দিক হইতে দাবী গ্রহণের যোগ কিনা। দৃষ্টান্ত স্থলে যদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়া থাকে যে, প্রতিশ্রুত সংস্কারক মধ্যমাকৃতি ও গোধূম বর্ণের হইবেন, তবে ইহা তাঁহার সাহায্যার্থে একটি গ্রন্থোক্ত প্রমাণ হইবে মাত্র। কারণ শুধু বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ যুক্তির দিক দিয়া উক্ত সংস্কারক মধ্যমাকৃতি ও গোধূম বর্ণের হওয়া কখনো জরুরী নয়। কিন্তু দৃষ্টান্ত স্থলে, দাবীকারকের দাবীর সময় দেখিতে হইবে, তখন কোন সংস্কারকের আবশ্যকতা আছে কিনা। যেহেতু, আল্লাহ্‌তাআলার কোন কাজই নিষ্প্রয়োজনে করা হয় না। ইহা একটি যৌক্তিক প্রমাণ। বস্তুতঃ গবেষণার এই দুইটি উপায়, একটি গ্রন্থীয়, একটি যৌক্তিক।

গ্রন্থীয় প্রমাণের দ্বারা অনুসন্ধানঃ

প্রথমে আমরা গ্রন্থের দ্বারা গবেষণার বিষয় গ্রহণ করিতেছি – ইহার নীতি স্থির করিতেছি। এ সম্পর্কে জানা আবশ্যক, গ্রন্থমূলক গবেষণার জন্য ইসলামে কোরআন মজীদ সকলের শীর্ষস্থানীয়। কারণ, ইহা 'আলীম ও হাকীম'–সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী খোদার কালাম। ইহা রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর উপর যেভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিল, সেইভাবেই সুরক্ষিত অবস্থায় এখনো বিদ্যমান। ইহার কোন আয়াত, কোন শব্দ, কোন রেখা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। ইহা সর্ব্বাবস্থায় অখণ্ডনীয় সুনিশ্চিত মান। এইজন্য কোন 'রেওয়ায়াত' (বিবৃতি বা শ্রুতি) ইহার বিরোধী হইলে, কখনো গ্রহণীয় নয়। তখন আমাদের কর্তব্য হইবে উহাকে কোরআনের অধীনে আনা। যদি তাহা না করা যায়, উহাকে দূষিত বলিয়া অপসারণ করিতে হইবে। উহা গ্রহণ করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। কোরআন স্বয়ং বলে "ফা-বে-আইয়ে হাদীসিম বাদাল্লাহে ও আয়াতিহি ইয়ুমিনূন।" অর্থাৎ "খোদার কালাম কোরআনের আয়াতসমূহ ছাড়িয়া, কোন্ কথা মান্য করিবে?" (সূরা জাসিয়া, রুকু-১)।

সুন্নতের স্থান দ্বিতীয়–ইহা দ্বারা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের এবং সাহাবা কেরামের (রাঃ) কার্য্যক্রম বুঝায়, যাহা মুসলমানগণের সর্ব্ববাদীসম্মত কার্য্যক্রম দ্বারা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। কোন কোন ব্যক্তি হাদীস এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য করেন না। ইহা একটি দেদীপ্যমান ভুল। কারণ হাদীসের দ্বারা নবী করীম এবং সাহাবা কেরামের উক্তিগুলিকে বুঝায়। এগুলি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু

আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রায় এক শত কি দেড় শত বৎসর পরে সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু সুন্নত (ব্যবহারিক অনুষ্ঠান) কোরআন করীমের সঙ্গে সঙ্গে আদি হইতে বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। কারণ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এবং সাহাবা কেরামের ঐ সকল ক্রিয়া-কর্ম্ম 'সুন্নত' অর্থে বুঝাইয়া থাকে, যাহা হাদীসের সাহায্যে আমাদের নিকট পৌঁছে নাই, বরং মুসলমান জমাতের 'তয়ামুল', তাহাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। ইহাও কোরআন শরীফের পর নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য।

হাদীসের তৃতীয় স্থান। উপরে বলা হইয়াছে, হাদীসের দ্বারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এবং সাহাবাগণের ঐ সকল উক্তি ও কার্য্যকলাপ বুঝায়, যাহা শ্রুতিরূপে বর্ণিত হইয়া আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। এই সকল শ্রুতি (রেওয়ায়াত) আঁ হযরতের জামানা মোবারকের কিছুকাল পর লোকদের স্মৃতি ও অন্তরে গাঁথা কথা সকল হইতে সংগৃহীত হইয়া লিখিত হয়। মোহাদ্দেসগণ যতই কঠোর পরিশ্রমপূর্ব্বক এই প্রয়োজনীয় ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়া থাকুন এবং প্রক্ষিপ্ত ('মওযূ') হাদীসগুলিকে বিশুদ্ধ (সহীহ্) হাদীসসমূহ হইতে পৃথক করিয়া থাকুন, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চিন্তা করিতে পারেন যে, হাদীসে অবশ্যই সন্দেহ, বা অনুমানের দিক বিদ্যমান। কারণ, এই সকল উক্তি একশত কিম্বা দেড় শত বৎসর পর লোকের স্মৃতি হইতে সংগ্রহ করা হয় এবং তাহাদের শব্দগত ও অর্থগত হেফাজতেরও কোন সুনিশ্চিত, অভ্রান্ত এন্তেজাম করা হয় নাই। ইহাদের সম্বন্ধে মানব বুদ্ধি কখনো স্বীকার করিতে পারে না যে, ইহারা নিশ্চিত অকাট্য। ইহা শুধু আমাদেরই ধারণা নহে, প্রাচীন আলেমগণও এই নীতিই অবলম্বন করেন। 'অসূলের' সমস্ত কেতাবগুলিতে লিখিত আছে যে, যদি কোন হাদীস কোরআন শরীফের বিরুদ্ধ হয়, তবে হাদীস ত্যাগ করিতে হইবে, এবং কোরআন শরীফ অবলম্বন করিতে হইবে। হাদীসের পারিভাষিক গ্রন্থসমূহেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, হাদীস হইতে শুধু আনুমানিক জ্ঞান (যন্নি এলেম) পাওয়া যায়। বস্তুতঃ হাদীসের তৃতীয় স্থান। কারণ হাদীসে আনুমানিক জ্ঞান, সুন্নত ও কোরআনের সমকক্ষতা হাদীস করিতে পারে না। ধারাবাহিকতা দ্বারা কোরআন ও সুন্নতের সত্যতা নির্ণীত হয়। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন কোন সামঞ্জস্যের ফলে হাদীসও নিশ্চিত জ্ঞান ও প্রত্যয়ের পর্য্যায়ে পৌঁছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন হাদীসে কোন ভবিষ্যদ্বাণী থাকে, এবং তাহা যথাকালে প্রতিপন্ন হয়, তদবস্থায় মোহাদ্দেসগণ তাঁহাদের মতানুসারে উহাকে 'দুর্ব্বল' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিলেও, উহা সত্য ও সুনিশ্চিত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কারণ উহার সত্যতা সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলার সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে এবং ঘটনা দ্বারা উহার সত্যতা সমর্থিত হইয়াছে। অথবা, যদি কোন দুর্ব্বল হাদীস কোরআন শরীফের অনুকূল হয়, তবে উহা কোরআনের বিরোধী তথাকথিত সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীসসমূহ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

তারপর, হাদীসসমূহেরও শ্রেণী ভাগ আছে। 'মোস্তালেহাতুল্ হাদীস' বা হাদীসের পরিভাষার গ্রন্থগুলিতে উহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল পর্য্যায় ও

শ্রেণীভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখাও অত্যাবশ্যক। দৃষ্টান্ত-স্থলে, কোন দুর্ব্বল হাদীসকে মোহাদ্দেসগণ "যয়ীফ" (দুর্ব্বল) লিখিয়াছেন। যদি উহা এমন একটি হাদীসের মোকাবেলায় আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা তাঁহাদের মতে "সহীহ্" (বিশুদ্ধ), তখন "সহীহ্" হাদীসটি গৃহীত হইবে এবং যয়ীফ হাদীস পরিত্যক্ত হইবে। এই শ্রেণীভাগ অনুসারে হাদীসের কেতাবগুলিও বিভিন্ন পর্য্যায়ভুক্ত। দৃষ্টান্ত-স্থলে বুখারী সমস্ত হাদীস গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ (আফযল ও সহীহ্) বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার পর সহীহ্ মোসলেমের স্থান। তারপর "সেহাহ্ সেত্তা" বা হাদীসের বিশুদ্ধ ষড় গ্রন্থের অন্যান্য কেতাবগুলির স্থান। সুতরাং গবেষণাকালে হাদীসের বিভিন্ন পর্য্যায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাও অত্যন্ত জরুরী। বিশ্বস্ত "সীরত" এবং "তারিখ" (জীবন চরিত ও ইতিহাস) গ্রন্থগুলি নিম্নস্থানীয় হওয়া সত্ত্বেও হাদীসেরই অন্তর্গত।

অন্যান্য ঐশী পুস্তকগুলির এবং পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্তসমূহের চতুর্থ স্থান। কোরআন শরীফের বিরোধী না হইলে, ইহাদের মধ্যেও কোন কোন সময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের বৃত্তান্ত হইতে বহু আলো পাওয়া যায়। কারণ মূলতঃ আল্লাহ্তাআলার প্রেরিত ব্যক্তিগণ একই রঙে রঙীন হইয়া থাকেন এবং একই মাপকাঠি দ্বারা তাহাদের সত্যতা পরীক্ষণীয়। সুতরাং একজন নবীর অবস্থা বুঝিতে হইলে অন্যান্য নবীগণের অবস্থাগুলি পাঠ করাও কর্তব্য।

"উলামা-এ-সালফ", অর্থাৎ ইসলামের পূর্ব্ববর্ত্তী উলামার, বিশেষতঃ প্রাথমিক যুগের ওলামার উক্তি ও লিখার পঞ্চম স্থান। কারণ তাঁহারাও অত্যন্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতার সহিত কোরআন ও হাদীসের উপর চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা নানা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা মানব স্বভাব সুলভ ভুল-ভ্রান্তিও করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্ম সেবার মর্য্যাদা হ্রাস হয় না।

মুসলমানের মধ্যে কোন গ্রন্থীয় গবেষণার্থে সাধারণতঃ এই পাঁচটি উপায়ই অবলম্বনীয়। কিন্তু এই পাঁচটি উপায় অনুযায়ী কোন দাবীকারকের দাবী পরীক্ষা করা যেমন আমাদের কর্ত্তব্য এবং কোন মতেই ইহাদের বাহিরে যাওয়া উচিত নয়, তেমনি ইহাদের প্রত্যেকটির নিজ নিজ স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের পক্ষে আরো অধিক জরুরী। অর্থাৎ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোরআন শরীফ। ইহার প্রতিকূলে যত বস্তু আছে সকলই পরিত্যাজ্য। ইহা সেই চরম পর্য্যায়ের কষ্টি যাহার সাহায্যে সকল খাঁটি অখাঁটি, দোষী নির্দ্দোষী পরীক্ষা করা যায়। এই কষ্টির নিকট প্রকৃত কোন তত্ত্বই গোপন থাকিতে পারে না। কারণ ইহা খুবই সম্ভবপর যে, প্রাচীন সুযোগ্য 'সলফ সালেহীনের' উক্তিসমূহের আলোর সম্মুখেও কোন বস্তুর অভ্যন্তরীণ-তত্ত্ব লুপ্ত থাকিতে পারে; কিম্বা তাঁহারা কোন ভ্রান্ত বস্তুকে শুদ্ধ মনে করিতেও পারেন বা শুদ্ধ বিষয়কে ভ্রান্ত বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারেন; এবং ইহাও সম্ভবপর যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ঐশী গ্রন্থগুলি এবং নবীগণের বৃত্তান্ত আমাদের নিকট বিশুদ্ধ উপায়ে পৌছায় নাই এবং উহাদের উপর নির্ভরের ফলে আমাদের পদস্খলন ঘটিতে পারে এবং আমরা ভ্রান্ত

সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। তারপর ইহাও সম্ভবপর যে, হাদীসের রেওয়ায়াতে ভুলও থাকিতে পারে এবং কোন কারণে শব্দ বা অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটা, কিম্বা কোন প্রক্ষিপ্ত ও ভ্রান্ত রেওয়ায়াত প্রবিষ্ট হওয়া বা কোন দুর্ব্বল রেওয়ায়াতকে মোহাদ্দেসগণ 'সহীহ্' (প্রকৃত ও শুদ্ধ) মনে করা এবং কোন 'সহীহ্' রেওয়ায়াতকে দুর্ব্বল মনে করা বিচিত্র নয় বলিয়া তৎপ্রতি নির্ভরের ফলে আমরাও বিভ্রান্ত হইতে পারি। এ সবই সম্ভবপর। কিন্তু কোরআন ভুল করিবে এবং কোরআনের যথার্থ অনুসরণের ফলে কেহ বিপথগামী হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। এই জ্যোতির সম্মুখে কোন আঁধার তিষ্ঠিতে পারে না। ইহা আলো। ইহার স্পর্শে আঁধার বহু ক্রোশ দূরে পলায়ন করে। ইহা হেদায়াত। বিপথগামিতা ইহার কাছেও যাইতে পারে না। সত্যই "লা ইয়াতিহেল বাতেলু মিন বায়নে ইয়াদায়হে ওয়া লা মিন খালফেহি তানজিলুম মিন্ হাকিমিন্ হামীদ।" ('সুরাতুল হামীম-সেজ্দা,' রুকু-৫)। অর্থাৎ "কোরআনের সম্মুখের দিক হইতেও অসত্য উপস্থিত হইতে পারে না, ইহার পশ্চাদ্দিক হইতেও পারে না, ইহা যথাস্থানে যথা বস্তু রক্ষক জ্ঞানী ও অত্যন্ত প্রশংসিত মহান অস্তিত্বের নিকট হইতে অবতীর্ণ।"

যৌক্তিক গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণার দ্বিতীয় উপায় বিশুদ্ধ যুক্তি। কিন্তু কোন বিষয়ের যৌক্তিকতা দ্বারা বিচারে এবং উহার ভাল-মন্দ দিক যৌক্তিক উপায়ে পর্য্যালোচনায় গ্রন্থীয় দিক হইতে বিচার করা হয় না। স্বয়ং দাবীকারকের ব্যক্তিত্ব তাঁহার অবস্থা এবং সমসাময়িক অবস্থার প্রতি যুক্তির দিক হইতে দৃষ্টিপাত করা হয়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে কী বলা হইয়াছে, লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যৌক্তিক বিচার গ্রন্থীয় বিচার অপেক্ষা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। ইহাতে গবেষণাকারীর উপর মহাদায়িত্ব অর্পিত হয়। কারণ প্রথমতঃ ইহাতে মতবিরোধের আশঙ্কা অধিক। কারণ কোন কোন সময় একই বিষয় একজনের বুদ্ধি 'ভাল' বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং অন্য একজনের বিচার-শক্তি উহাকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে। আরো ব্যাপার এই যে, উভয় ব্যক্তিই স্ব স্ব অভিমতের যথার্থতার উপর জোর দেন। যদিও আমরা বলিতে পারি যে, একজন যথার্থভাবে চিন্তা না করায় বা কোন কোন অনিষ্টকর বস্তুকে মন ও মস্তিষ্কের উপর কর্তৃত্ব করিতে দেওয়ায় এবং এই কারণে তাহার প্রজ্ঞায় দোষ ঘটিবার ফলে একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে তবু একথা সত্য যে, ঐ সকল ব্যাপারে শুধু যুক্তির দিক হইতে দৃকপাত করা হয়, যে সকল বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক মতানৈক্য ঘটিয়া থাকে।

দ্বিতীয়, সাধারণ অবস্থায় যুক্তি একাকী কোনই নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য তূলা-দণ্ড নয়। যুক্তির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, যুক্তি-শক্তিকেও খোদাতাআলা এক প্রদীপস্বরূপে সমর্পণ করিয়াছেন। যুক্তি বহু উপায়ে সন্দেহ ও সংশয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করে এবং কত প্রকার

ভিত্তিহীন ধারণা ও অকারণ সন্দেহ দূরীভূত করে। যুক্তি অতি লাভজনক ও অত্যাবশ্যক। ইহা অতি মহান সম্পদ। তথাপি ইহার একটি ত্রুটির দিক আছে। একাই ইহা বস্তুর প্রকৃত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের পর্যায়ে পৌছাইতে পারে না। যুক্তি এই পর্যায়ে তখনই পৌছিতে পারে। যখন ইহার সহিত অন্য কোন সঙ্গী সম্মিলিত হইয়া ইহা হইতে প্রাপ্ত আনুমানিক সিদ্ধান্তে সমর্থনপূর্ব্বক উহাকে অভিজ্ঞতার বিষয়সমূহের অঙ্গীভূত করে। যুক্তির এই সহগামী সহায়ক বন্ধু প্রত্যেক বিষয়ে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। কিন্তু যুক্তির সহায়স্বরূপে ইহারা তিনের অধিক নয়। এই সহচর ত্রয়ের বিস্তৃত বিবরণ এই। জগতের যে সকল বস্তু ইন্দ্রিয় নিচয়ের দ্বারা অনুভূত হয়, উহাদের সম্বন্ধে যৌক্তিক সহচররূপে যাহা ইহার সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত ও পূর্ণ প্রত্যয়ের স্থান দেয়, সে হইল সঠিক পর্যাবেক্ষণ। ইহার অপর নাম অভিজ্ঞতা। বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থানে ঘটিয়াছে বা ঘটে, এইরূপ ঘটনাবলী সম্বন্ধে যুক্তি কোন আদেশ করিবার হইলে তখন ইহার সহচর হয় ইতিহাস। ইহাও অভিজ্ঞতার ন্যায় যুক্তির অস্বচ্ছ আলোকে এরূপ পরিষ্কৃত করে যে, তদ্‌সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ নির্বুদ্ধিতা ও উন্মাদ মানসের পরিচায়ক হয়। যদি যুক্তির অনুজ্ঞা অতিন্দ্রিয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত হয় – যাহা কোন ইন্দ্রিয় জানিতে পারে না, – তখন উহার তৃতীয় সহচর 'এলহাম বা অহী' (হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম প্রণীত 'বারাহীনে আহমদীয়া' হইতে সঙ্কলিত)।

বস্তুতঃ অনুসন্ধানের এই দুই উপায়। অর্থাৎ এক উপায় যৌক্তিক, দ্বিতীয় উপায় গ্রন্থীয়। কিন্তু ইহাদের উভয়ের সম্বন্ধেই স্মরণ রাখা একান্ত আবশ্যক যে, এই সকল অবলম্বনের ফলে মানুষ তবেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, যদি সে অভিনিবেশাবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সংস্কারশূন্য হইয়া শুদ্ধ-চিত্ততা অবলম্বন করে, যদি দাবীকারককে সমর্থন বা অসমর্থন করিবার যাবতীয় ভাব মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কৃত করে, যদি বিচার-শক্তির হানিকর কোন ভাব, আবেগ ও আসক্তিকে নিকটেও আসিতে না দেয় এবং আন্তরিক উৎসাহ উদ্যম সহকারে আল্লাহ্‌র ভয়, 'আল্লাহ্‌র তাকওয়ার' প্রতি যথা লক্ষ্য সহ দাবীকারকের দাবীর প্রতি উহার বিভিন্ন দিক হইতে দৃষ্টিপাত করে। ইহা না হইলে কোনটাই কিছু নয়, গ্রন্থমূলক ও যৌক্তিক বিচার উভয়ই নিস্ফল।

আধ্যাত্মিক পন্থা ঃ

উল্লিখিত উভয় উপায়ই জড়ীয়। কিন্তু আরো এক উপায় আছে। উহা আধ্যাত্মিক ('রূহানী')। ইহা হইল দোয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্ববাসী এই নেয়ামতকে চিনিতে পারে নাই এবং ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কী উপলব্ধি করে নাই। নতুবা লোকেরা দেখিতে চাহিলে, দেখিতে পাইত যে, এই পথে চলিয়া মানুষ সহজে খোদার দরবারে উপনীত হয়। সুতরাং প্রত্যেক বিপদকালে ইহারই প্রতি মনোনিবেশ অত্যাবশ্যক। যে ইহা খটখটাইবে, তাহার জন্য ইহা খোলা হইবে এবং যে চাহিবে, সে পাইবে। খোদার গৃহের

ভিখারী শূন্য হাতে ফিরে না। বিশেষতঃ ঐ অবস্থায় যখন বিথগামিতার গহ্বর হইতে বহিস্কৃত করিয়া হেদায়াত ও নূরের উচ্চ মঞ্চে কায়েম করা আল্লাহ্তাআলার অভিপ্সিত হয়। তিনি অবশ্যই বান্দার ফরিয়াদ শুনেন এবং প্রেম ও দয়ার সহিত তাহার সাহায্যার্থে হস্ত প্রসারণ করেন।

সুতরাং হযরত মির্যা সাহেবের সম্বন্ধে অনুসন্ধানিচ্ছুক ব্যক্তি মাত্রেরই উপরোক্ত গ্রন্থীয় ও যৌক্তিক উপায়ের অবলম্বন ব্যতীত আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আল্লাহতাআলার হুযূরে স্থাপন এবং সকাতরে তাঁহার নিকট দোয়া করা কর্ত্তব্য, "হে আল্লাহ, হে রহীম করীম, দাতা দয়াবান খোদা! আমার দেখার শক্তি ক্ষীণ। তুমি আমাকে দৃষ্টি-শক্তি দাও, যেন এই ব্যাপারে যাহা সত্য, তাহা আমি দর্শন করিতে পারি। হে 'আলেমুল-গয়েব', দাবীকারকের দাবী সত্য হইলে, তাঁহার প্রতি ঈমান আনার তৌফীক আমাকে দাও এবং আমাকে ঐ সকল অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী কর, যাহা তোমার প্রেরিত ব্যক্তিগণের জামাতের উপর অবতীর্ণ হইয়া থাকে। তাঁহার দাবী সত্য হইয়া থাকিলে, অস্বীকার করিবার ধৃষ্টতা হইতে আমাকে নিরাপদ রাখ। হে আমার মৌলা, আমার সহায়! যদি তিনি বিপথগামিতার দিকে আহ্বান করিয়া থাকেন, তুমি আমাকে তোমার অপার অনুগ্রহের দ্বারা তাঁহার অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর। হে আমার মালিক, আমার প্রভো! আমি তোমার আদেশ মত এই ব্যাপারের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি দুর্ব্বল। আমার পদস্খলন অসম্ভব নহে। সুতরাং, তুমি তোমার অনুগ্রহের দ্বারা আমার হস্ত ধারণ কর এবং আমার নিকট সত্য উদ্ঘাটিত কর। আমীন।" দোয়া সম্বন্ধে এই নীতিটিও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দোয়ার ব্যাপারে বান্দার ধৈর্য্যধারণ এবং নিরাশ না হওয়া অত্যাবশ্যক। এই একীন ও আশা পোষণ করিতে হইবে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহতাআলা সাহায্য করিবেন। অপিচ, মনে কোন কোন ধারণার জট বাঁধিয়া পরে আবার দোয়ার জন্য হাত উঠানো বা প্রথাস্বরূপ মুখে কোন কোন বাক্য উচ্চারণ অনুচিত। শিশু যেমন তাহার কষ্টের সময় সমস্ত দুনিয়া হইতে চক্ষু ফিরাইয়া মায়ের বুকে মাথা রাখে, তেমনি সত্যিকার দরদ ও আবেগ সহ বান্দা আপন রব্বের দরবারে প্রণত হইবে এবং তাঁহার দুয়ারে নিপতিত রহিবে, যে পর্য্যন্ত না খোদার আলো তাহার পথ আলোকাকীর্ণ করে। এখন আমি মূল বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

'নযুলে-মসীহ্ ও যহুরে-মাহ্দী'
কোরআন ও হাদীসে মসীহ্ ও মাহ্দী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন ঃ বাস্তবিকই রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মসীহ্ ও মাহ্দী আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন কি? জানা আবশ্যক, ইহা অস্বীকারের বহির্ভূত, নেহাৎ খোলা বিষয়াবলীর অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে, এ বিষয়ে উম্মতে

মোহাম্মদীয়ার "এজ্‌মা" (সর্ব্বসম্মত মত) বিদ্যমান। ধারাবাহিকরূপে প্রথম হইতে সমগ্র উম্মতে এই বিশ্বাস চলিয়া আসিয়াছে যে, আখের জামানায় মুসলমানদের মধ্যে মসীহ্ ও মাহ্দী জাহের হইবেন। তাঁহার মাধ্যমে ইস্‌লাম পতনাবস্থা হইতে উঠিয়া বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য লাভ করিবে, এবং এই প্রাধান্য কেয়ামত পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী কোরআন শরীফেও আছে। সহীহ্ হাদীসসমূহেও প্রকৃষ্টরূপে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মসীহ্‌র নযূল সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কোরআন শরীফে সূরাহ্ নূরের 'এস্তেফ্‌লাফ' আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে। খোদাতাআলা বলিয়াছেন ঃ–

"ওয়াদাল্লাহুল্ লাযিন আমানু মিন্‌কুম ও আমেলুস্ সালেহাতে লা-ইয়াস্ তাখ্‌লেফান্নাহুম্ ফিল্ আর্‌দে কামাস্‌তাখ্ লাফাল্লাযীনা মিন্ কাব্‌লেহিম" (সূরাহ্ নূর, রুকু ৭)। অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা এই যে, তিনি সাধু ও সৎ কর্মশীল মু'মিন মুসলমানগণের মধ্যে তেমনি খলীফাগণের শৃঙ্খল স্থাপন করিবেন, যেমন তিনি তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে (হযরত মূসার উম্মতে) করিয়াছিলেন।"

"মূসার উম্মত" বিষয়ক অর্থ সূরাহ্ মোয্‌যাম্মেলে বর্ণিত আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে, *"ইন্না আরসাল্‌না ইলায়কুম রসূলান্ শাহেদান আলায়কুম্ কামা আর্‌সাল্‌না ইলা ফের-আওনা রসূলা।"* (সূরাহ মোয্‌যাম্মেল, রুকু ১)। অর্থাৎ, "মূসাকে ফেরআওনের নিকট পাঠাইবার ন্যায় তোমাদের নিকট এই রসূল পাঠাইয়াছি।" ভাষান্তরে, আল্লাহ্‌তাআলা এই আয়াতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে হযরত মূসার অনুরূপ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, সূরাহ্ নূরের 'এস্তেখ্‌লাফ' আয়াতে *"মিন্ কাব্‌লেকুম"* (তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে) দ্বারা হযরত মূসার উম্মতকে বুঝায়। এখন, আমরা মূসায়ী উম্মতের খলীফাগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, সেই উম্মতে হযরত মূসার পর বহু সংখ্যক খলীফা হন। তাঁহারা তৌরাতের খেদমতের জন্য আবির্ভূত হন। পরিশেষে, হযরত মূসার তের চৌদ্দ শত বৎসর পর হযরত মসীহ্ আগমন করেন। যিনি হযরত মূসার খলীফাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি মূসায়ী উম্মতের 'খাতামুল্-খোলাফা' ছিলেন। সুতরাং খলীফা উত্থাপন ব্যবস্থায় মূসায়ী উম্মতের খলীফাগণের সহিত মোহাম্মদীয় উম্মতের সাদৃশ্য বর্ণিত হওয়ায় এবং অনুরূপ উপায়ে এই উম্মতে খলীফা উত্থাপনের ব্যবস্থার ওয়াদা করায় এই উম্মতেও নাসেরীয় মসীহ্‌র অনুরূপ শেষ খলীফা–এই উম্মতের 'খাতামুল-খোলাফা' জাহের হওয়া অত্যাবশ্যকীয় ছিল। সুতরাং, ইহাই নির্ণীত হয় যে, 'এস্তেখ্‌লাফ্' আয়াতে যথা মোসলমানগণের মধ্যে সাধারণ খলীফাগণের অঙ্গীকার রহিয়াছে, তথা একজন বিশেষ, সুমহান খলীফারও ওয়াদা রহিয়াছে যিনি মসীহ্ নাসেরীর অনুরূপ (মসীল) এবং মোহাম্মদী মসীহ্ বলিয়া অভিহিত হইবেন। তিনি হযরত মূসার পর মসীহ্ আবির্ভূত হওয়ার অনুরূপ সময়েই প্রকাশিত হইবেন।

সেইরূপ, হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ- *"ওয়াল্লাযি নাফ্সি বেইয়াদেহি লাইয়ুশেকান্না আইয়ানযালা ফিকুম্ ইব্নু মারইয়ামা হাকামান্ আদ্লান্ ফা-ইয়াক্সেরুস্ সালিবা ওয়া ইয়াকতুলুল্ খিনযিরা ও ইয়াযায়ুল জিয্ইয়াতা"* ('বুখারী,' কেতাব বাদউল্-খল্‌ক, বাবু নযূল ঈসা ইবনু-মুরয়াঈম)। অর্থাৎ, যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ, তাঁহার দিব্য, আমি তাঁহার কসমসহ বলিতেছি যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও মীমাংসকরূপে নাযেল হইবেন, অর্থাৎ, তিনি তোমাদের মতবিরোধের যথার্থ মীমাংসাকারী হইবেন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন, শূকর কতল করিবেন এবং জিজিয়া রহিত করিবেন; অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ পূর্ব্বক জিজিয়ার প্রশ্নই তিরোহিত করিবেন।" সেইরূপ, বহু হাদীসে মসীহ্ অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ বিদ্যমান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন মাহ্দী জাহের হওয়ার সম্বন্ধে। এ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে ঃ *"হুয়াললাযি বাআসা ফিল্উম্মিয়ীনা রসূলাম্ মিনহুম ইয়াৎলু আলায়হিম আয়াতেহি ওয়া ইয়ুযাক্কিহিম্ ও ইয়ুআল্লেমুহুমুল, কেতাবা ওল-হেকমতা ওয়া ইন কানু মিন্ কাবলু লাফি যালালিম্ মুবিন; ও আখারীন মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বেহিম।"* (সূরাহ্ জুমুআ, রুকু ১) অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌তাআলাই তাঁহার রসূলকে আরবগণের মধ্যে আবির্ভূত করিয়াছেন। তিনি তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করিতেছেন, তাহাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, এবং তাহাদিগকে কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দিতেছেন, তাহারা নানা প্রকার বিপদগামিতায় নিপতিত হওয়ার পর। এই প্রকারে আল্লাহ্‌র এই রসূল পরবর্তী যুগে অপর এক জামাতেরও তরবীয়ত করিবেন, যাহারা এখনো পয়দা হয় নাই।"

এখানে আল্লাহ্‌তাআলা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের অপর এক আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। কারণ, প্রকাশ্য কথা, পরবতর্ত্তী যুগে যে উম্মত উৎপন্ন হইবে, তাহাদের শিক্ষা-কার্য্য তিনি এভাবেই সম্পাদন করিতে পারেন যে তাঁহার কোন পূর্ণ প্রতিবিম্ব, ('কামেল বরুয') আবির্ভূত হন, যাঁহার আগমন তাঁহারই আগমনস্বরূপ হইবে। যিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই কদমে কদমে তাঁহার উম্মতের সংস্কার সাধন করিবেন। তিনিই মাহ্দী। হাদীসসমূহে উক্ত হইয়াছে যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হইলে সাহাবাগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে রসুলুল্লাহ্! এই পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ কে?" ইহাতে তিনি তাঁহার একজন সাহাবী সাল্‌মান ফারসীর পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, *"যদি ঈমান সপ্তর্ষী মণ্ডলেও উত্থিত হয়, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তহিত হয়, শুধু এই পারশ্যবাসীদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উহা তথা হইতে ধরায় আনিবেন এবং পৃথিবীতে উহা পুনঃ সংস্থাপন করিবেন।"* ('বুখারী,' তফসীর সূরাহ্ জুমুয়া)। বস্তুতঃ, কোরআন শরীফের এই আয়াতে অর্থাৎ সূরাহ্ জুমুআয় একজন কামেল মোহাম্মদী বরুযের, আঁ হযরতের একজন পূর্ণ প্রতিবিম্ব শিষ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে এবং তিনিই মাহ্দী। সেইরূপ, বহু হাদীসে মাহ্দী সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্থলে, আবূ দাউদে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে ঃ *"লাও লা ইয়াব্‌কা মিনাদ্ দুন্ইয়া ইল্লা ইয়াওমান লাতাওয়ালাল্লাহু জালেকাল ইয়াওমা*

হাত্তা ইয়াব্‌য়াসা ফিহে রাজ্‌লাম্‌ মিন্নি আও মিন্‌ আহ্‌লে বায়তি উয়ুআতি ইসমুহু ইসমি ও ইসমু আবিহে ইস্‌মা আবি ইয়াম্‌ লা। ওল-আর্‌দা কেস্‌তান্‌ ও আদলান্‌ কামা মুলিয়াৎ য়ুল্‌মান্‌ ও জাওরা।" ('আবুদাউদ, ' ২য় খণ্ড, কেতাবুল-মাহ্‌দী)। অর্থাৎ "যদি পৃথিবীর বয়সের মধ্যে একদিনও অবশিষ্ট থাকে, আল্লাহ্‌তাআলা সেই দিন দীর্ঘ করিবেন, যে পর্য্যন্ত না তিনি উহাতে উৎপন্ন করিবেন এক ব্যক্তিকে আমার মধ্য হইতে বা আমার পরিজন হইতে, যাঁহার নাম আমার নামানুসারে হইবে এবং যাহার পিতার নাম আমার পিতার নামানুযায়ী হইবে। তিনি পৃথিবীকে ন্যায়-বিচারের দ্বারা পূর্ণ করিবেন, ঠিক সেই মত যেভাবে উহা ইতঃপূর্ব্বে অনাচার-অত্যাচারে পূর্ণ হইয়াছিল।" এই হাদীসেও ইহারই প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী আঁ হযরতে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের 'কামেল বরুয, পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া হইবেন। বলিতে কি, আধ্যাত্মিক হিসাবে তাহার আগামন হুযূরের (সঃ) আগমন হইবে।

বস্তুতঃ ইহা সর্ববাদীসম্মত ধর্মীয় মত। মোসলমান বালক-বালিকাও জানে যে, ইসলামে মসীহ্‌ ও মাহ্‌দীর জাহের হওয়ার সুসংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। আজকাল সমস্ত ইসলামী দেশসমূহে অত্যন্ত জোরশোরে মসীহ্‌-মাহদীর আগমন প্রতীক্ষা করা হইতেছে এবং সকলেই তাঁহার আগমনের সহিত উন্নতির আশা পোষণ করিতেছেন। কোরআন কারীম ও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মসীহ্‌ মাহ্‌দীর আগমন সংক্রান্ত কোন কোন লক্ষণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ সকল লক্ষণাবলী আল্লাহ্‌তাআলার চিরাচরিত কানুন (সুন্নাতুল্লাহ্‌) অনুযায়ী হযরত মির্যা সাহেবের আবির্ভাবে পূর্ণ হইয়াছে কিনা দেখা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তৎপূর্বে, দুইটি বিশেষ ভ্রান্তিমূলক ধারণার অপনোদন অত্যাবশ্যক, যাহা মসীহ্‌ ও মাহ্‌দী সম্বন্ধে মোসলমানদের মধ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। এগুলি দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত হযরত মির্যা সাহেবের দাবী প্রত্যেক মোসলমানের নিকট প্রথম দেখাতেই মনোযোগ পাওয়ার অযোগ্য হইয়া পড়ে। সেই ভ্রান্তিগুলো হইল– প্রথম, হযরত ঈসা মসীহ্‌ নাসেরীর জীবন ও মৃত্যু সংক্রান্ত প্রশ্ন। দ্বিতীয়, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহদী কি একই ব্যক্তি? না, ইঁহারা দুইজন পৃথক ব্যক্তি? অধুনা, মোসলমানগণের মধ্যে সাধারণতঃ এই ভ্রান্ত ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে যে, হযরত মসীহ্‌ নাসেরী আকাশে সশরীরে জীবিত আছেন এবং তিনিই আখেরী জামানায় নাযেল হইবেন। দ্বিতীয়, মসীহ্‌ এবং মাহদী দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি। এই সকল ভ্রান্ত ধারণার ফলে সাধারণ মোসলমান হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর প্রতি মনোযোগ দেয় না। অতএব, আমরা প্রথমতঃ এই দুইটি প্রশ্ন গ্রহণ করিতেছি। "ওমা তওফীকি ইল্লা বিল্লাহ্‌"।

হযরত মসীহ্‌ নাসেরী আকাশে উত্থিত হন নাই ঃ

প্রথম প্রশ্ন, হযরত মসীহ্‌ কি ভৌতিক দেহ সহ আকাশে জীবিত আছেন? এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোরআন এবং সহীহ্‌ হাদীসসমূহ হইতে কখনো নির্ণীত হয় না যে, হযরত মসীহ্‌ নাসেরীকে জীবিতবস্থায় ভৌতিক দেহসহ আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছে, বা তিনি এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। কোরআন শরীফে উক্ত

হইয়াছে ঃ- *"ফিহা তাহইয়ুনা ওফিহা তামুতুন (সূরাহ্ আ'রাফ, রুকু-২)*। অর্থাৎ, হে মানব সন্তানগণ, তোমরা পৃথিবীতেই জীবন ধারণ করিবে এবং পৃথিবীতেই তোমাদের মৃত্যু হইবে।" পৃথিবীতে মানুষের উপর দুইটি সময় অতিক্রম করে। প্রথমতঃ, জীবন কাল। দ্বিতীয়তঃ, মৃত্যু কাল। খোদাতাআলা এই উভয় কালই পৃথিবীর সহিত নির্দিষ্ট করিয়াছেন। অর্থাৎ, তিনি এই বিধান করিয়াছেন যে, এই উভয় কাল মানুষ পৃথিবীতেই যাপন করিবে। এখন প্রশ্ন, হযরত মসীহ্ নাসেরী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কীরূপে আকাশে কালাতিপাত করিতেছেন? সুতরাং ইহাই নির্ণীত হয় যে, হযরত মসীহ্ নাসেরীকে কখনো আকাশে উত্তোলন করা হয় নাই। তিনি অন্যান্য মানুষের ন্যায় পৃথিবীতেই জীবন যাপন করিয়াছেন এবং এই পৃথিবীতেই মৃত্যু লাভ করিয়াছেন।

তারপর, কোরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলিয়াছেন, *"কুল্ সুবাহানা রব্বি হাল্ কুন্তু ইল্লা বাশারার রসূলা।" (সূরাহ্ বনী ইস্রাঈল, রুকু ১০)*। অর্থাৎ, "হে রসূল, কাফেরগণ তোমার নিকট মো'জেযার দাবী করে। তুমি তাহাদিগকে প্রত্যুত্তরে বল, 'আমার রব্ব্ তাঁহার কানুনের বিরুদ্ধচারণ হইতে পবিত্র। আমিও একজন মানুষ রসূল মাত্র।" ইহা দ্বারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি মানুষ হওয়ায় ভৌতিক দেহে আকাশে যাইতে পারেন না। সুতরাং, মসীহ্ নাসেরী মনুষ্য হইয়াও কীরূপে আকাশে গিয়াছেন? তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে যাওয়ায় তিনি মনুষ্য অপেক্ষা উন্নততর কোন অস্তিত্ব হওয়া কি বুঝায় না? সুতরাং এই আয়াত থাকিতে, কোন্ মোসলমান একথা বলিবার সাহস করিতে পারে যে, হযরত মসীহ্ জীবিত অবস্থায় আকাশে উত্থিত হন? প্রকাশ্য কথা, শ্রেষ্ঠতম রসূল মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের জীবিতাবস্থায় ভৌতিক দেহে আকাশ গমনের সাথে শুধু তাঁহার মানুষ হওয়াই প্রতিবন্ধক ছিল বলিয়া আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইত্যাবস্থায়, তাঁহার চেয়ে সুনিশ্চিত নিম্ন স্তরের নবী হযরত মসীহ্ কীরূপে আকাশে যাইতে পারেন? দুঃখের বিষয় সম্ভবতঃ এখানে একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। কোরআন কারীমে আল্লাহ্তাআলা পরিষ্কার ভাষায় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সশরীরে জীবিতবাস্থায় আকাশে যাওয়া তিনি মানুষ ছিলেন বিধায়, নিষিদ্ধ ছিল বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং, মে'রাজের সময় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম কীরূপে আকাশে গিয়াছিলেন? ইহার উত্তরস্বরূপ অতি উত্তমরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মে'রাজের ব্যাপারে তিনি ভৌতিক দেহের সহিত আকাশে গিয়াছিলেন, এই কথাটাই সত্য নয়। প্রকৃত কথা, মে'রাজ এক অতি সূক্ষ্ম শ্রেণীর 'কাশফ' (আধ্যাত্মিক জাগ্রত স্বপ্ন) ছিল। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে ইহার দর্শন লাভ করেন। পরে, যথাকালে যাহা কিছু দেখানো হইয়াছিল, ঘটনা প্রবাহ দ্বারা সমর্থিত হয় এবং সমর্থিত হইয়া আসতিছে। "সল্ফে

সালেহীন" বিজ্ঞ সাধু প্রাচীন ব্যক্তিগণের এক প্রকাণ্ড জমাত ইহাই নির্দেশ করিয়াছেন যে, মে'রাজ ভৌতিক দেহ সহ হয় নাই, বরং উহা স্বপ্ন ছিল অতি সূক্ষ্ম 'কাশ্‌ফ', (দিব্যস্বপ্ন), এবং তাঁহাকে আকাশগুলির ভ্রমণ করান হয়। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি আল্লাহ আন্‌হা বলেন যে, 'নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ মে'রাজের রাত্রিতে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সেইরূপ, অন্যান্য বহু প্রধান প্রধান আকাবের ওলামাও লিখিয়াছেন যে, মে'রাজ ভৌতিক দেহের সহিত হয় নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মে'রাজ এক প্রকার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক জাগ্রত স্বপ্নমূলক, কাশ্‌ফীল দৃশ্য ছিল। ইহাতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে আকাশে লইয়া গিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির দৃশ্যাবলী দেখানো হয়। অপিচ, হাদীসে *"সুম্মা ইস্তায়কাযা"* অর্থাৎ, মে'রাজের দৃশ্য অবলোকনের পর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের "চক্ষু উন্মীলিত হইয়া পড়িল," এই কথাগুলো পাওয়া যায় (বুখারী, কেতাবুৎ তৌহীদ)। ইহা হইতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মে'রাজ ভৌতিক দেহে হয় নাই।

দুঃখের বিষয় মোসলমানগণ মসীহ্‌কে আকাশে উত্তোলন এবং তথায় বসানো রাখিয়া শুধু নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা অমর্যাদাই করিতেছেন না, বরং খৃষ্টীয়ানদের একটি সম্পূর্ণ অলীক ধারণার সহায়তা করিতেছেন। কেহ সত্যই বলিয়াছেন– "মান্ আয্ বেগানাগণ হার্‌গেয্ না নালাম্। কেহ্ বামান্ হারচে কারদ আঁ আশনা কার্‌দ" (আমি অন্যদের কথায় কাঁদি না। আমার সহিত যাহা করা হইয়াছে, মিত্রগণই করিয়াছেন)। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল স্পষ্ট আয়াত থাকা সত্ত্বেও আজকাল মোসলমানেরা ইত্যাকার ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। কোরআন শরীফে কোথাও লিখিত নাই যে, হযরত ঈসাকে ভৌতিক দেহ সহ জীবন্ত অবস্থায় আকাশের দিকে উত্তোলন করা হইয়াছে। যদি কেহ ইহা আমাদিগকে দেখাইতে পারে, তবে আমরা আল্লাহর ফযলে সর্বপ্রথমে মানিবার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু সমগ্র কোরআন শরীফে একটি আয়াতও পাওয়া যাইবে না যে, উহা দ্বারা হযরত ঈসার আকাশে ভৌতিক দেহ সহ জীবিতাবস্থায় যাওয়া সপ্রমাণ হয়। কোরআন শরীফে মসীহ্ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "রাফাআহুল্লাহু ইলায়হে" অর্থাৎ, "আল্লাহতাআলা মসীহকে তাঁহার নিকট উঠাইয়া লইলেন।" তদ্দারা কখনো একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠানো হইয়াছে। কারণ, 'রাফাআহু' দ্বারা 'আধ্যাত্মিক উত্তোলন' বুঝায়, 'দৈহিক উত্তোলন' বুঝায় না। যেমন, 'বাল্‌আম বাউর' সম্বন্ধে খোদাতাআলা বলেন, *"ওলও শে'না লা-রাফা' নাহু বিহা ওলাকিন আখলাদা ইলাল আরযে" (সূরা আ'রাফ, রুকু-২২)* অর্থাৎ "যদি আমরা চাহিতাম, আমাদের নিদর্শনসমূহের দ্বারা তাহাকে উত্তোলন করিতাম; কিন্তু সে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।" এখানে সকলেই 'উত্তোলন' দ্বারা 'আধ্যাত্মিক উত্তোলন' বুঝিয়া থাকেন। কেহই ইহার অর্থ দৈহিক উত্তোলন মনে করেন না। অথচ, এখানে বিপরীতার্থক "পৃথিবী" শব্দও বিদ্যমান থাকিয়া বিরুদ্ধ ইঙ্গিতও বহন

করিতেছে। ইত্যাবস্থায়, অকারণে হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে একই শব্দ 'দৈহিক উত্তোলন' অর্থে গৃহীত হয় কেন? মসীহ্‌র মধ্যে কি জিনিস ছিল যে, অন্যান্যের জন্য "উত্তোলন" ('রাফা') শব্দ ব্যবহৃত হইলে তদ্বারা 'আধ্যাত্মিক উত্তোলন' বুঝায়, কিন্তু মসীহ্‌র জন্য এই শব্দ উল্লিখিত হওয়া মাত্র ইহার অর্থ তৎক্ষণাৎ "দৈহিক উত্তোলন" হইয়া পড়ে? ইহা ছাড়া হযরত মসীহ্ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে অপর এক আয়াতে 'রাফা' (উত্তোলন) 'মৃত্যুর পর' হইয়াছিল। (সূরাহ্ আলে এমরান, রুকু ৬)। স্পষ্ট কথা, মৃত্যুর পর 'উত্তোলন' আধ্যাত্মিকই হইতে পারে, দৈহিক নহে।

তারপর, চিন্তা করা আবশ্যক, আল্লাহ্‌তাআলা এখানে একথা বলেন নাই যে, মসীহ্‌কে আকশের দিকে উঠানো হইয়াছিল, বরং শুধু ইহাই বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহাকে নিজের দিকে উত্তোলন করিয়াছেন। প্রকাশ্য কথা, আল্লাহ্‌তাআলা সর্বত্রই আছেন। শুধু আকাশে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। তাঁহার দিকে উঠাইবার অর্থ আকাশের দিকে উঠানো কীরূপে হইতে পারে? "তাঁহার দিকে উঠানো" অর্থ আধ্যাত্মিক উত্তোলন ব্যতীত কিছুই নহে। আল্লাহ্‌তাআলা সর্বস্থানে বিরাজমান বলিয়া কোন মতেই তাঁহার দিকে উত্তোলন দৈহিক অর্থে সম্ভবপর নহে। মসীহ্‌র 'আল্লাহর দিকে উত্তোলন' দৈহিকভাবে স্বীকার করা হইলে, ইহা একটি অর্থশূন্য বাক্যে পরিণত হয়। তদবস্থায়, ইহার অর্থ হইবে, হযরত মসীহ্ যেখানে ছিলেন, সেখানেই তাহাকে থাকিতে দেওয়া হয়। কারণ, খোদা সর্বত্রই আছেন। সুতরাং, ইহাই প্রতীত হয় যে, এখানে 'দৈহিক উত্তোলন' অর্থ নয়, ইহার অর্থ 'আধ্যাত্মিক উত্তোলন'-ই বটে।

তারপর, এক হাদীসে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন- *"ইযা তাওয়াযাআল্ আবদু রাফাআহুল্লাহ্ ইলাস্ সামায়েস সাবেয়াতে" (কন্‌জুল-ওম্মাল্, জেল্‌দ ২, পৃঃ ২৫)*। "আল্লাহ্‌তাআলার উদ্দেশ্যে কেহ বিনয় প্রকাশ বা নতি স্বীকার করিলে, আল্লাহতাআলা তাহাকে সপ্তম আকাশের দিকে উত্তোলন (রাফা) করেন।" এখনেও কি ভৌতিক দেহের সহিত আকাশের দিকে উঠানো বুঝায়? ইহা হইলে খোদাতাআলার এই ওয়াদা মিথ্যায় পরিণত হয়। কারণ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম, সমস্ত সাহাবাগণ এবং পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ নেক ব্যক্তিগণ খোদাতাআলার উদ্দেশ্যে বিনয় প্রকাশ বা নতি স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই আকাশের দিকে ভৌতিক দেহে জেন্দা উত্তোলিত হন নাই। সুতরাং, ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, এখানে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনয়ীরা বা নতি স্বীকারকারীরা ভৌতিক দেহে জীবিত আকাশে যাওয়া অর্থ নয়। ইহার অর্থ, এইরূপ ব্যক্তিগণের মর্যাদা আল্লাহ্‌তাআলা বৃদ্ধি করিবেন, তাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবেন। আমাদের বিরুদ্ধবাদী ওলামাও এই অর্থই স্বীকার করেন। অথচ, এখানে 'আস্‌মান' শব্দও সঙ্গেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে কেন, হযরত মসীহ্‌র বেলায় "রাফা-ইলাল্লাহ্" (আল্লাহ্‌র দিকে উত্তোলন) অর্থ ভৌতিক দেহে জীবিত অবস্থায় তিনি আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন, করা হয়?

মসীহ্ নাসেরীর মৃত্যু ঃ

আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে, তাহারই বিশেষ কৃপায়, কোরআন এবং হাদীস হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, মসীহ্ আলায়হেস্ সালাম কখনো জীবিত অবস্থায় ও ভৌতিক দেহে আকাশের দিকে উত্তোলিত হন নাই। তিনি আল্লাহ্‌র মীমাংসানুযায়ী পৃথিবীতেই জীবন যাপন করেন, এবং পৃথিবীতেই তিনি বসবাস করিতেন। এখন আমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ইহাও প্রমাণ করিব যে, হযরত মসীহ্‌কে যে আকাশের দিকে উত্তোলন করা হয় নাই, শুধু ইহাই নহে, বরং তাঁহার মৃত্যুও হইয়াছে, যদিও মসীহ্‌র মৃত্যু সপ্রমাণ করা আমাদের আদৌ কোনই কর্তব্য নয়। কারণ সকলেই জানেন, পৃথিবী নশ্বর স্থান– যাহার জন্ম হয়, তাহার মৃত্যুও হয়। কোরআন শরীফেও বলা হইয়াছে ঃ– *"কুল্লু নাফ্‌সিন যায়েকাতুল্ মাউৎ" (সূরাহ্ আনকবূত,' রুকু ৬)* "প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল।" কিন্তু সর্বসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যে, হযরত মসীহ নাসেরী এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন। এই নিমিত্ত এই ভ্রান্তির অপনোদনও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কোরআন শরীফে খোদাতাআলা বলেন ঃ– *"ওয়া মা মোহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন, কাদখালাৎ মিন্ কাব্‌লেহির রুসুল; আফাইম্ মাতা আও কুতেলান্-কালাব্‌তুম্ আলা আ'কাবেকুম্" (সূরাহ্ আলে-এমরান,' রুক ১৫)* অর্থাৎ, "মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র একজন রসূল ব্যতীত অন্য কিছু নহেন। তাঁহার পূর্বে রসূলগণ হইয়াছেন, সকলেই গত হইয়াছেন। তবে, যদি তিনিও মৃত্যু লাভ করেন বা নিহত হন, তোমরা কি ইসলাম ছাড়িয়া উল্টা পায়ে প্রস্থান করিবে?" এই আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা ঈসা মসীহ্‌র মৃত্যুর চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়াছেন। পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর পূর্বে যত রসূল হইয়াছেন, সকলেরই মৃত্যু হইয়াছে।

কিন্তু বলা হয় যে, এই আয়াতে যে 'খালা' শব্দ আছে, ইহার অর্থ শুধু "মৃত্যু" নয়, "স্থান ত্যাগ", "প্রস্থান করা"ও ইহার অর্থ হয়। আকাশে প্রস্থান করা ব্যক্তিও স্থান ত্যাগ করে। তজ্জন্য এখানে ইহার অর্থ "গত হওয়া" করা ঠিক নয়। আমরা বলি, ভাল কথা। অভিধান মতে 'খালা' অর্থ 'গত' অর্থে 'মৃত্যু' এবং 'স্থান ত্যাগ' অর্থে প্রস্থান দুই-ই হয়। অর্থদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য নির্ণয়ার্থে আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করা এবং সহবর্ত্তী বিষয়ের পর্যালোচনা করা আমাদের কর্তব্য। শুধু 'স্থান ত্যাগ' – না, এখানে 'মৃত্যুর ফলে এ বিশ্ব হইতে প্রস্থান,' ইহার অর্থ? অভিধান আমাদিগকে উভয় অর্থই শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ, "প্রস্থান" এবং "মৃত্যু"। বিরুদ্ধবাদীগণের প্রদত্ত অর্থ প্রমাণের ভার আমাদের নহে। কিন্তু 'খালা' অর্থ "মৃত্যু," ইহা প্রমাণ করা আমাদের কর্তব্য। প্রসিদ্ধ অভিধান 'তাজুল্-উরুসে' লিখিত আছে ঃ– *"খালা ফুলানুন, ইযা মাতা"* অর্থাৎ 'খালা ফুলানুন্' অর্থ 'অমুক মরিয়াছে'। আলোচ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিলে পরিষ্কার দেখিতে পাই যে, আয়াতের পূর্বাপর অবস্থান পরিষ্কারভাবে আমাদের সাহায্য করে। খোদাতাআলা

বলেন ঃ- "কাদ্ খালাৎ মিন্ কাবলেহির রুসুল, আফাইম্ মাতা আও কুতেলা" অর্থাৎ, "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম) পূর্ববর্তী সকল রসূলেরাই পরলোক গত হইয়াছেন। তবে কি তিনি মৃত্যু লাভ করিলে, বা নিহত হইলে তোমরা ইসলাম পরিত্যাগ করিবে?" এই আয়াতে "আফাইম্ মাতা আও কুতেলা" ("তবে, যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, বা তিনি নিহত হন" পরিষ্কার ঘোষণা করিতেছে যে, পূর্ববর্তী নবীগণ হয়ত স্বাভাবিক মৃত্যুর ফলে পরলোক গত হইয়াছেন, নয়ত নিহত হইয়া এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এ পৃথিবী ত্যাগ শুধু এই দুই উপায়েই হইয়াছে। যদি পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে কোন একজন নবীকেও আকাশের দিকে উঠানো হইয়াছিল, বা উল্লিখিত উপায়দ্বয় ছাড়া অন্য কোন উপায়েও কোন নবী এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্তাআলা ঐ অবস্থাটিও এখানে উল্লেখ করিতেন, কিম্বা মসীহ্র বাদ থাকা অন্ততঃ উল্লেখ করা হইত । কিন্তু তাহা একটাও করা হয় নাই। খোদাতাআলা ঐ অবস্থাটিও এখানে উল্লেখ করিতেন, কিম্বা মসীহ্র বাদ থাকা অন্ততঃ উল্লেখ করা হইত। কিন্তু তাহা একটাও করা হয় নাই। খোদাতাআলা শুধু 'স্বাভাবিক মৃত্যু' এবং 'নিহত হওয়া' সম্বলিত অবস্থাদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে, এই আয়াতে 'খালা' অর্থ 'স্বাভাবিক মৃত্যু' করিতে হইবে, অথবা 'নিহত হইয়া এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ' ইহার অর্থ। কিন্তু অন্যত্র আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ সম্বন্ধে 'নিহত' হওয়ার কথা খণ্ডন করিয়াছেন ('সূরাহ্ নেসা', রুকু ২২)। সুতরাং ইহাই নির্ণীত হয় যে, মসীহ্ স্বাভাবিক মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। মোফাসসেরগণও এস্থলে 'খালা' অর্থ "মৃত্যু" করিয়াছেন।। এই আয়াতের তফসীরে লিখিত আছে ঃ- *"ওয়া ইয়াখ্লু কামা খালাও বিল-মাউতে আভিল্ কাৎলে"।* (তফসীর কনুভী আলাল্ বয়যাভী', ৩য় খণ্ড এবং 'তফসীর খাজেন,' ১ম খণ্ড) অর্থাৎ, "আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম তেমনিভাবে এই নশ্বর পৃথিবী পরিত্যাগ করিবেন, যেমন অন্যান্য নবীগণ 'স্বাভাবিক মৃত্যু' দ্বারা বা 'নিহত হইয়া' এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন।"

এই আয়াতের অর্থ আরো স্পষ্ট হইয়া পড়ে, যদি আমরা ইহাকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার আলোতে দর্শন করি। সহীহ্ বুখারীতে লিখিত আছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওফাত (মৃত্যু) হইলে হযরত উমর এবং আরো কোন কোন সাহাবা (রাযি আল্লাহু আনহুম) মনে করিলেন যে, এখনো আরও বহু কার্য্য করিবার বাকী আছে, রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম জীবিত আছেন। এমনকি, হযরত উমরের (রাঃ) ধারণা এতই বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তিনি কোষ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, "রসূলুল্লাহ্র মৃত্যু হইয়াছে কেহ বলিলে, আল্লাহ্র কসম, আমি তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিব।" তখন হযরত আবূ বকর হযরত উমরকে (রাঃ) সম্বোধনপূর্বক বলিলেন- "আলা রিসলেকা আইয়ুহাল্ হালেফু" -" হে কসমকারী, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।" তারপর, তিনি সকল সাহাবাকে সম্বোধন করতঃ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, এবং

প্রথমে এই আয়াতই পাঠ করিলেন ঃ- "ওয়া মা মোহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন্ কাদ খালাৎ মিন্ কাব্‌লেহির রুসুল"– মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লাম আল্লাহ্‌র একজন রসূল মাত্র। তাঁহার পূর্ববর্তী সকল রসূলগণই পরলোক গত হইয়াছেন। তবে, তিনি মৃত্যু লাভ করিলে বা নিহত হইলে কি তোমরা আবার সেই অজ্ঞানতায় ফিরিয়া যাইবে?" বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আয়াত শুনিবা মাত্র হযরত উমর (রাঃ) শিহরিয়া উঠিলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। কারণ, তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার প্রিয় গুরুও আল্লাহ্‌র একজন রসূলই ছিলেন বলিয়া অন্যান্য রসূলগণ যেমন সকলেই গত হইয়াছেন, তাঁহাদের মত এই পথে তাঁহারও যাত্রা করিবার ছিল! এখন দেখিবার বিষয়, কোন পূর্ববর্তী নবী তখনো জীবিত থাকিলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) এই যে যুক্তি দিয়াছিলেন যে, পূর্ববর্তী রসূলগণ সকলেই ওফাত পাওয়ায়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম -এর মৃত্যু অনিবার্য ছিল, ইহাতে সাহাবাগণ (রাঃ) অবশ্যই আপত্তি করিতেন। বিশেষতঃ হযরত উমর (রাঃ) এবং তাঁহার মতই যাঁহারা বিশ্বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিতেন যে, এই যুক্তি ঠিক নয়। কিন্তু সকল সাহাবাই (রাঃ) হযরত আবূ বকরের (রাঃ) সহিত একমত হইয়া এই যুক্তিরই সমর্থন করিলেন। অন্য কথায়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লামের পর যে বিষয়ে সর্বপ্রথমে সাহাবা কোরাম (রাঃ) "এজমায়" (অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্তে) উপনীত হন, তাহা ইহাই ছিল যে, হযরত মসীহ্ (আঃ) সমেত সকল পূর্ববর্তী নবীই মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। খুবই চিন্তা করিতে হইবে, পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্যে একজন নবীও জীবিত আছেন বলিয়া ধারণা করিলে, হযরত আবূ বকরের (রাঃ) উল্লিখিত যুক্তির ফলে সাহাবাগণ (রাঃ) সর্বসম্মতিক্রমে যে ধর্মীয় সিদ্ধান্তে (এজমায়) উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা ভ্রান্ত ছিল বলিয়া প্রতিপাদিত হইত। সুতরাং, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, খোদার নবীগণের অন্যতম নবী হযরত মসীহ্ ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তারপর, অন্যত্র আল্লাতাহ্‌আলা বলেন ঃ– *"ইয়া ঈসা ইন্নি মোতাওয়াফ্ফি -ফিকা ও রাফেউকা ইলাইয়া ওয়া মোতাহ্‌হেরু মিনাল্লাযিনা কাফারু ইলা ইয়াওমিল্ কিয়ামাতে" (সূরাহ্ আলে এমরান, রুকু ৬)* -"হে ঈসা আমিই তোমাকে মৃত্যু দিব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠাইব, এবং তোমাকে কাফেরদের বিরুদ্ধবাচক প্রশ্নগুলি হইতে পবিত্র করিব এবং তোমার আবৃত্তীদিগকে তোমার বিরুদ্ধবাদীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল রাখিব।" দেখুন, এই আয়াতে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, মসীহ্‌র মৃত্যু, তাঁহার 'রাফা' বা উত্তোলনের পূর্বে হইবে। কারণ, 'মোতাওফ্-ফিকা' বলা হইয়াছে 'রাফেউকা' বলিবার পূর্বে। অর্থাৎ পূর্বে মৃত্যু হইবে, পরে হইবে 'রাফা'– (উত্তোলন)। প্রকাশ্য কথা, মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক উত্তোলন হয়, দৈহিক নহে। আর যদি বলা হয় যে, এখানে 'তক্‌দীম-তাখীর' আছে, অর্থাৎ শব্দ অগ্র পশ্চাৎ করিয়া অর্থ করিতে হইবে– তবে একে তো আল্লাহ্‌র কালামে অকারণ 'তক্‌দীম তাখীর'-এর ফতোয়া জারি করা ইহুদীদের ন্যায়

"তহ্‌রীফ" বা আল্লাহ্‌র কালামে হস্তক্ষেপ করা অপেক্ষা কম নয়। 'তকদীম -তাখির' বা শব্দ অগ্র পশ্চাৎ করিয়া অর্থ গ্রহণের জন্য কোন প্রকৃষ্ট যক্তি থাকা প্রয়োজন। তারপর, এই আয়াতের আদি ও অন্ত যেরূপ, তাহাতে কোন প্রকার 'তক্‌দীম তাখীর' খাপ খায় না। অর্থাৎ, 'মুতাওয়াফ্‌-ফিকা' (-আমি তোমাকে মৃত্যু দিব) ইহার স্থান হইতে উঠাইয়া আয়াতের অন্য কোন স্থানে রাখিলে কোন সদর্থ প্রকাশ পায় না। সুতরাং অগত্যা কোরআন শরীফের মৌলিক শব্দ-বিন্যাস স্বীকারক্রমে 'মৃত্যুকে' উত্তোলনের' পূর্বে মান্য করিতে হইবে। **ইহাই যথার্থ ও প্রকৃত অর্থ।**

তারপর, অন্যত্র খোদাতাআলা বলেন ঃ- *"ইয্‌ কালাল্লাহু ইয়া ঈসাব্‌নু মারয়্যামা আ আন্‌তা কুল্‌তা লিন-নাসে তাখেযুনি ও উম্মিয়া ইলাহায়নে মিন্‌ দুনিল্লাহে, কালা সুব্‌হানাকা মা ইয়াকুনুলিআন্‌ আকুলা মা লায়সা লি বেহাক; ইন্‌কুন্‌তু কুলতুহু ফাকাদ্‌ আলেমতাহু, তা'লামু মা ফি নাফ্‌সি ওলা-আ'লামু মা ফিনাফ্‌সেকা, ইন্নাকা আন্‌তা আল্লামুল গুয়ুব। মা কুলতু লাহুম্‌ ইল্লা মা আমারতানি বেহি আনি'বুদুল্লাহা রব্বি ও রব্বাকুম; ও কুনতু আলায়হিম্‌ শাহীদাম্‌ মা দুমতু ফিহিম, ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ ফায়তানি কুন্‌তা আনতার রাকীবা আলায়হিম্‌, ও আন্‌তা আলা কুল্লে শায়ইন্‌ শাহীদ।" (সূরাহ্‌ মায়েদাহ্‌,' রুকু ১৫)* অর্থাৎ, "যখন আল্লাহ্‌ বলিলেন, হে ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম, তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে, 'আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া আমাকে এবং আমার মাকে দুইজন খোদা বলিয়া মান্য কর? তখন ঈসা উত্তর করিল, ' হে আল্লাহ্‌, তুমি পবিত্র। যাহা বলিবার আমার কোনই অধিকার নাই, আমি তাহা বলিতে পারি না। যদি আমি এই প্রকার কোন কথা বলিতাম, তুমি তাহা অবশ্যই জানিতে। কেননা, তুমি জান আমার অন্তরে কি আছে এবং আমি জানি না তোমার অন্তরে কি? তুমি অবশ্যই সকল গোপন বিষয়াবলী অবগত আছ। আমি তাহাদিগকে তাহা ছাড়া কিছুই বলি নাই, যাহা আমাকে তুমি বলিবার আদেশ করিয়াছিলে এবং তাহা ইহাই ছিল যে, 'তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত করিবে, তিনি আমার এবং তোমাদের সকলের প্রভু।' আর **আমি তাহাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছি, যে পর্যন্ত আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম; কিন্তু, হে খোদা যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিয়াছ, তখন হইতে তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।** আর তুমি সকল বস্তুই প্রত্যক্ষ করিয়া থাক।"

এই আয়াতে পরিষ্কার কথায় হযরত মসীহ্‌র (আঃ) ওফাতের-তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ দিতেছে। দুঃখের বিষয়, মোসলমানগণ তবু তাঁহাকে আকাশে জীবিত রাখিবার ধারণা পোষণ করেন। এই আয়াতে মসীহ্‌র (আঃ) মৃত্যুর যে সবিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, তদপেক্ষা স্পষ্ট কথা ধারণাতীত। আফ্‌সোস, ইহাতেও আমাদের মৌলবী সাহেবান সন্দেহ জন্মাইবার প্রচেষ্টা করেন। দৃষ্টান্তস্থলে, তাঁহারা বলেন, মসীহ্‌র (আঃ) সহিত খোদার এই বাক্যালাপ কিয়ামতে হইবে- কিয়ামতের পূর্বে মসীহ (আঃ) অবশ্যই মৃত্যু লাভ করিবেন। এ জন্য এই আয়াত এ কথার 'দলীল' হইতে পারে না যে, মসীহ্‌ বাস্তবিক ইতঃপূর্বেই মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। এই সন্দেহের সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই কথোপকথন কিয়ামতের দিনই হইবার হইলেও এই আয়াত পরিষ্কার ভাষায়

মসীহ্র মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই ঘোষণা করিতেছে। কারণ, মসীহ্র উক্তি এই ঃ– "কুন্তু আলায়হিম্ শাহীদাম্ মাদুমতু ফিহিম্, ফালাম্মা তাওয়াফ্-ফায়তানী কুন্তা আনতার রাকীবা আলায়হিম্"– "আমি লোকদের অবস্থা দর্শন করিতেছিলাম, যে পর্যন্ত আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু, খোদা, তুমি আমাকে মৃত্যু দেওয়ার পর তুমি তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।" এই উক্তিতে হযরত মসীহ্ (আঃ) কেবল মাত্র দুইটি সময়ের কথা উল্লেখ করেন। তিনি পর পর এই সময়দ্বয় পার হইয়াছেন। প্রথম সময়ে তিনি তাঁহার আবৃর্ত্তীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। "মাদুমতু ফিহিম্"-'যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম' দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় সময় তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কালটিকে নির্দেশ করে। "ফালাম্মা তাওয়াফ্-ফায়তানী" - 'অতঃপর, যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে' বাক্যাংশে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। এখন যদি প্রথম সময় অর্থাৎ আবৃর্ত্তীদের মধ্যে থাকিবার কালের পর মসীহ্র মৃত্যু না হইয়া তাঁহার আকাশে উত্তোলিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তবে বর্ত্তমান উক্তির পরিবর্তে মসীহ্র (আঃ) বলা উচিত ছিলঃ–"মা দুম্তু ফিহিম ফালাম্মা রাফায়্তানী ইলাস্ সামায়ে হাইয়্যান্" অর্থাৎ " আমি আমার অনুবর্ত্তীদিগকে তৎপর্য্যন্ত দেখিয়াছি, যে পর্যন্ত আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু, হে খোদা! যখন তুমি আমাকে জীবিতাবস্থায় আকাশে উত্তোলিত করিলে, তখন একমাত্র তুমিই তাহাদের পর্যবেক্ষক ছিলে।" কিন্তু মসীহ্র জবাব তাহা নয়। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, উত্তীর্ণ হওয়ার পর মসীহ্র উপর মৃত্যুর পরবর্ত্তী কালই মাত্র উপস্থিত হয়। উহা অন্য কোন সময়ই আর ছিল না। ভাবিয়া দেখুন, যে উত্তর মসীহ্ করিয়াছেন, উহাতে পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, মসীহ্র (আঃ) প্রথম সময়ের, অর্থাৎ আবৃর্ত্তীগণের মধ্যে জীবন যাপন কালের অব্যবহিত পরেই যাহা আগমন করে– অন্য কথায়, যাহা ঐ সময়ের অবসান ঘটাইয়াছিল এবং নব অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল– উহা তাঁহার মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যদি প্রথম সময়ের অবসান হইয়াছিল তাঁহার আকাশ গমনে, তবে 'মা দুম্তু ফিহিম ফালাম্মা তাওয়াফ্-ফায়তানী" –"যত কাল তাহাদের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু হে খোদা! যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, তখন হইতে তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে" উত্তর দিব্যি গলৎ, অসত্য হইয়া পড়ে।

তারপর, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক, খোদাতাআলার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে হযরত মসীহ্ অজ্ঞতা প্রকাশপূর্বক বলিয়াছেন যে, তাঁহার আবৃর্ত্তীরা তাঁহার এবং তাঁহার মায়ের খোদা স্বরূপে পূজা আরম্ভ করিয়াছিল কিনা তিনি জ্ঞাত নহেন। তিনি বলেন ঃ 'মা কুল্তু লাহুম ইল্লামা আমারতানী বেহি আনিয়্ বুদুল্লাহা রব্বী ওয়ারব্বাকুম ওয়া কুন্তু আলায়হিম শাহীদান মা দুম্তু ফিহিম; ফালাম্মা তাওয়াফ্-ফায়তানী কুন্তা আন্তার রকীবা আলায়হিম্।" "হে আল্লাহ্, আমি তো আমার আবৃর্ত্তীদিগকে তাহাই শিক্ষা দিয়াছি, তুমি আমাকে যাহার আদেশ করিয়াছিলে এবং তাহা ইহাই ছিল যে, 'তোমরা এবাদত করিবে আল্লাহর, তিনি আমার এবং তোমাদের সকলেরই রব্ব্'। যত দিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম, আমি তাহাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি, কিন্তু হে খোদা, আমাকে তুমি মৃত্যু দিলে পর তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে।" হযরত মসীহ্র (আঃ) এই উত্তর হইতে পরিষ্কাররূপে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, তিনি তাঁহার আবৃর্ত্তীদের বিভ্রান্ত হওয়ার

বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশের দ্বারা তাঁহার নির্দোষিতা জ্ঞাপন করিতেছেন। ইহার অর্থ, খৃষ্টানেরা হযরত মসীহ্‌র (আঃ) মৃত্যুর পর গোমরাহ্‌ হইয়াছে। সুতরাং, এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, খৃষ্টীয়ানরা গোমরাহ্‌ হইয়াছে কিনা। যদি তাহারা পথভ্রষ্ট না হইয়া থাকে, তবে হযরত মসীহ্‌ (আঃ) জীবিত থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, হযরত মসীহ্‌ও মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। কারণ, কোরআন শরীফ স্পষ্ট বলিতেছে যে, খৃষ্টীয়ানদের বিপথগামী হওয়ার পূর্বে হযরত ঈসার (আঃ) মৃত্যু হয়। এখন, দেখুন, এই আয়াত কেমন পরিষ্কার কথায় হযরত ঈসার (আঃ) মৃত্যুর সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রশ্নোত্তর কেয়ামতের পূর্বেই হউক, আর কেয়ামতের পরেই হউক, উহার সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। হযরত মসীহ্‌র মৃত্যু যে- কোন অবস্থায়, খৃষ্টীয়ান জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। খৃষ্টীয়ানরা হযরত মসীহ্‌র (আঃ) মৌলিক শিক্ষা হইতে পৃথক হইয়াছে এবং তাঁহাকে খোদা মানিতে আরম্ভ করিয়াছে রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র জামানারও পূর্বে, একথাও কোরআন শরীফ হইতে সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। খোদাতা'লা বলেনঃ- *"লাকাদ্‌ কাফারাল্লাযিনা কা'লু ইন্নাল্লাহা সালেসু সালাসাতিন্‌" (সূরাহ্‌ মায়েদা, রুকু ১০)* "নিশ্চয়ই তাহারা কাফের হইয়াছে, যাহারা বলিয়াছে যে, খোদা তিনের এক।" সুতরাং জানা যায় যে, হযরত মসীহ্‌ (আঃ) অন্ততঃ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামের মোবারক জামানার পূর্বে ওফাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাই প্রকৃত অর্থ।

এই আয়াত হইতে ইহাও প্রকাশ পায় যে, মসীহ্‌র অনুরূপ, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ, যিনি আখেরী জামানায় আসা সুনির্দিষ্ট ছিল, তিনি হযরত ঈসা নহেন। কারণ, যদি স্বীকার করা হয় যে, হযরত মসীহ্‌ নাসেরীই কেয়ামতের পূর্বে নাযেল হইবেন, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি কেয়ামতের পূর্বেই তাঁহার উম্মতের ফাসাদ সম্বন্ধে অবগত হইবেন এবং তিনি জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার উম্মত তাঁহাকে খোদারূপে বরণ করিয়াছে। তদবস্থায়, তিনি কেয়ামতের দিন অজ্ঞতা কীরূপে প্রকাশ করিতে পারেন? কারণ, ইহা তাঁহার পক্ষে, নাউ'যুবিল্লাহ্‌, মিথ্যা বলা হইবে, যদি তিনি জানা সত্ত্বেও খোদাতাআলার সম্মুখে অজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সুতরাং ইহাই নির্ণীত হয় যে, তিনি কেয়ামতের পূর্বে পুনরায় কখনো আসিবেন না। অসম্ভব হইলেও, যদি এখন ধরা হয় যে, হযরত মসীহ্‌ (আঃ) আকাশে গিয়াছেন, তবু এই আয়াত তাঁহার পুনরাগমন সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করে এবং কখনই তাঁহাকে আসিবার জন্য পথ দেয় না। কারণ, ইহা দেদীপ্যমান সত্য যে, হযরত মসীহ্‌ (আঃ) কেয়ামতের দিন খোদাতাআলার সম্মুখে তাঁহার উম্মত গোমরাহ্‌ হওয়ার বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলিয়া প্রকাশ করিবেন। সুতরাং, ইহাই প্রতীতি হয় যে, কেয়ামতের পূর্বে তিনি তাঁহার উম্মতকে কোন ফাসাদ বা বিপথগামিতায় নিপতিত হইয়াছে বলিয়া কখনো দেখার সুযোগ পাইবেন না। কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, তিনি পুনরাগমন করিলে কেয়ামতের পূর্বেই তাঁহার উম্মত

পথভ্রষ্ট হওয়ার কথা তিনি অবগত হইবেন। বিশেষতঃ, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র সর্বাপেক্ষা বড় কার্য্যই হইল ক্রুশ ধ্বংস করা। ইত্যাবস্থায়, এই বিষয় সম্বন্ধে কীরূপে অজ্ঞতার প্রকাশ সম্ভবপর? সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয়। যদিও অসম্ভব তবু হযরত মসীহ্ আকাশে গিয়া থাকিলে উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় যে মসীহ্ আসার কথা আছে, তিনি নিশ্চয়ই একজন ভিন্ন ব্যক্তি, এবং মসীহ্ নাসেরী আকাশেই মৃত্যু লাভ করিবেন। কারণ, কোন মানুষ আকাশে থাকিলেও কোন অবস্থায়ই, মৃত্যু হইতে সে রক্ষা পাইতে পারে না। কোরআন করীমের শিক্ষানুসারে প্রত্যেক মানুষেরই মৃত্যু হওয়া ঐশী বিধান।

রহিল, আয়াতটিতে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দের ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা। আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ ইহার অর্থ, "সম্পূর্ণ উঠানো" করেন। এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানা আবশ্যক, আরবী ভাষানুসারে খোদাতাআলা কর্ত্তা এবং কোন মানুষ কর্ম হইলে 'তাওয়াফ্‌ফি' ক্রিয়ার অর্থ "রুহ কবজ" (মৃত্যু) ব্যতীত আর কিছুই হয় না। ইহা আমাদের দাবী। ইহা আমরা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত। হযরত মির্যা সাহেব বেশ বড় পুরষ্কার ঘোষণাসহ বিরুদ্ধবাদী মৌলবী সাহেবগণকে বারম্বার চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, যেন তাঁহারা কোথাও হইতে দেখান যে, খোদা কর্ত্তা এবং মানুষ কর্ম হওয়া সত্ত্বেও 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দের অর্থ "রূহ্ কবজ" ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে। কিন্তু এরূপ কোন একটি দৃষ্টান্তও কেহ উপস্থিত করেন নাই। আজ, পুনরায় আমরা এই চ্যালেঞ্জটি ঘোষণা করিতেছি। দেখা যাক, কোন উত্তর পাওয়া যায় কিনা। আরবী ভাষার সর্ববৃহৎ অভিধান 'তাজুল্-উরূসে" লিখিত আছে ঃ– "তাওয়াফ্‌ফাহুল্লাহু আয্‌যা ওয়া জাল্লা ইযা কাবাযা নাফসাহু" অর্থাৎ, "যখন বলা হয়, আল্লাহ্ তাহাকে তাওয়াফফি করিয়াছেন, তখন ইহার অর্থ হইয়া থাকে, আল্লাহ্ তাহার রুহ কবজ করিয়াছেন।" তরপর ইহাও লিখিত আছে, তুওয়াফফিয়া ফুলানুন ইযা মাতা।" অর্থাৎ, "কাহারো মৃত্যু হইলে বলা হয়, 'তাওয়াফ্‌ফা ফুলানুন'।" সুতরাং, এ কথা সুনিশ্চিত যে, "তাওয়াফ্‌ফি" -এর অর্থ (যখন খোদা ইহার কর্ত্তা হন এবং মানুষ হয় ইহার কর্ম) শুধু 'রুহু কবজ'। নিদ্রায়ও একসীমা পর্যন্ত 'আত্মগ্রহণ' ('রুহ্ কবজ') করা হয় বলিয়া অবশ্য "তাওয়াফ্‌ফি" শব্দ কোন কোন সময় "ঘুম পাড়ান" "বিনিদ্রিত করা"ও হয়। কিন্তু নিদ্রায় আত্মা আংশিক বা সাময়িকভাবে গ্রহণ (কবজ) করা হয় বলিয়া "তাওয়াফ্‌ফি" শব্দের মৌলিক ও স্থায়ী অর্থ 'মৃত্যুদান'। এই জন্য আরবী ভাষায় রীতি এই যে, 'নিদ্রা দেওয়া' অর্থে কখনো 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে, ইহার সহিত কোন সামঞ্জস্যসূচক শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। তদ্বারা জানা যায় যে, এখানে পূর্ণ 'রুহ্ কবজ' (আত্মা গ্রহণ) অর্থ নহে;–বরং, ঘুমের বেলা আত্মা গ্রহণ ('কব্‌জে রুহ্') ইহার অর্থ। ইহার দৃষ্টান্ত কোরআন শরীফেও আছে। যথা, আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ– 'হুয়াল্‌লাযী ইয়াতাওয়াফ্‌ফা আনফুসাকুম্ বিল্-লায়েল' (সূরাহ্ আনআম', রুকু ৭)। অর্থাৎ, "আল্লাহ্‌ই রাত্রিতে তোমাদের রূহ্‌গুলো গ্রহণ (কবজ) করেন।" এখানে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দ 'নিদ্রাকালীন

আত্মা গ্রহণ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, 'রাত্রি' শব্দ ইহাই নির্দেশ করে। কিন্তু 'মৃত্যুকালীন আত্মা গ্রহণ' অর্থ প্রকাশার্থে 'তাওয়াফ্ফি'র সহিত পাস্পরিক সম্বন্ধ জ্ঞাপক অন্য কোন কথা ব্যবহৃত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে, আল্লাহ্‌তাআলা বলেনঃ- "ইম্মা নুরিয়্যান্নাকা বা'য়াল্লাযী নায়েদুহুম্ আওনাতাওফ্-ফায়্যান্নাকা।" (সূরাহ্, মো'মেন; রুকু-৮) "হে নবী, কাফেরদিগকে আমরা আযাবের যে সকল ভীতিপ্রদ সংবাদ দিতেছি, তন্মধ্যে কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা হয়ত তোমাকে প্রদর্শন করিব, কিম্বা তোমাকে মৃত্যু দিব এবং তোমার পর সেগুলো পূর্ণ করিব।" তারপর বলা হইয়াছেঃ- "রব্বানা আফ্‌রেগ্ আলায়না সাব্‌রাওঁ ওতাওয়াফ্‌ফানা মুস্‌লেমীন" (সূরাহ্ আ'রাফ, রুকু, ১৪) অর্থাৎ "হে আমাদের রব্ব,- আমাদিগকে পূর্ণতম ধৈর্য্য দাও এবং তোমার আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার অবস্থায় আমাদিগকে মৃত্যু দাও।" এই উভয় আয়াতে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দ 'ওফাত দেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সামঞ্জস্যসূচক অন্য কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। **ইমাম ইব্‌নে হায্‌ম** 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা নিদ্রা বা মৃত্যু বুঝায়। এই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, হযরত ঈসার (আঃ) ব্যাপারে 'নিদ্রা' অর্থ হইতে পারে না বলিয়া ইহার অর্থ "মৃত্যু" নেওয়াই অপরিহার্য্য (আল্‌মুহাল্লা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩)।

এতদ্ব্যতীত, আলোচ্য আয়াতটির প্রতি একটু মনোযোগ দান করিলে বুঝা যায় যে, এখানে 'তাওয়াফ্‌ফি' শব্দ 'মৃত্যু দান' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ, হযরত ঈসা বলেন ঃ- "কুনতু আলায়হিম্ শাহীদাম্ মাদুমতু ফিহিম্ ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানী কুনতা আনতার রাকীবা আলায়হিম্" অর্থাৎ, "আমি যত দিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম, তাহাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু হে খোদা, যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে"। এখানে 'মা দুমতু ফিহিম্' ("যত দিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম") বাক্যাংশ পরিষ্কারভাবে ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, এখানে ঐ প্রকার 'আত্মা গ্রহণ' বুঝায়, যাহার ফলে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার আবূর্তীদের মধ্য হইতে প্রস্থান করেন এবং তাহাদের মধ্যে আর অবস্থান করেন নাই। কারণ, 'মা দুম্‌তু ফিহিম্' -('যত দিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম') এবং 'ফালাম্মা তাওয়াফ্‌ফায়তানি' ('যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে') পরস্পর বিরুদ্ধাবস্থা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এখানে 'তাওয়াফ্‌ফি' অর্থ 'মৃত্যু দান' ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মৃত্যু লাভ করায় হযরত মসীহ (আঃ) চিরতরে তাঁহার আবূর্ত্তীগণ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সুতরাং, 'তাওয়াফ্‌ফি' লইয়া দ্বন্দ চূড়ান্ত হঠকারিতা মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই শব্দটি অপর কাহারো সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে ইহার অর্থ মৃত্যুই করা হয়। কিন্তু যেই মাত্র হযরত মসীহ্‌র (আঃ) বেলায় ইহার ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়, অমনি ইহার অর্থ 'আকাশে উঠানো' করা হয়। এই পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহাই প্রকাশ পায় যে, হযরত ঈসার (আঃ) বেলায় শুধু অন্ধ আনুবর্তিতা করা হয়।

তারপর, দেখুন, এই কথাই, অর্থাৎ "কুনতু শাহীদাম্ মা দুমতু ফিহিম্ ফালাম্মা তাওয়াফ্ ফায়তানী কুনতা আনতার রাকীবা আলায়হিম্" ('আমি তাহাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দাতা ছিলাম, যে পর্যন্ত আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম; পরে যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে) যাহা হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছিলেন বা কেয়ামতের দিন বলিবেন, ইহাই আমাদের নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়সাল্লামা বলিবেন। সহীহ্ বুখারী কেতাবুত্ তফ্সীরে লিখিত আছে যে, একদিন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "কিয়ামতের দিন আমি 'কাওসারের' উপর দাঁড়াইলে হঠাৎ কতকগুলো লোক আমার দৃষ্টিগোচর হইবে। তাহাদিগকে ফেরেশতাগণ ধাক্কাইয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া আমি বলিব, 'উসায়হাবী, উসায়হাবী' 'ইহারাত আমার সাহাবা,' 'ইহারাত আমার সাহাবা'। ইহাতে আমাকে প্রত্যুত্তরে বলা হইবে, 'ইন্নাকা লা তাদরী মা আহ্দাসু বা'দাকা, ইন্নাহুম, লামইয়ায়ালু মুরতাদ্দীনা আলা আকাবেহিম্'– 'আপনি জানেন না। আপনার পর ইহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে! ইহারাত ধর্মভ্রষ্ট ও মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল।' আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেন, "আকুলু কামা কালা আব্দুস সালেহু ঈসা-বনু মারয়্যামা কুন্তু আলায়হিম্ শাহীদাম্ মাদুম্তু ফিহিম্ ফালাম্মা তাওয়াফ-ফায়তানী কুন্তা আনতার্ রাকীবা আলায়হিম্"- "তখন আমি তাহাই বলিব, যাহা আল্লাহ্‌র নেক বান্দা ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছি, যে পর্যন্ত আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু খোদা, যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে, তারপর তুমিই তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলে"। এই হাদীস হইতে দুইটি বিষয় প্রমাণিত হয়। প্রথম, যেভাবে এবং যে অর্থে তাঁহার উম্মত বিকৃত হওয়া সম্বন্ধে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁহার অজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন, ঈসা আলায়হেস্সালামও তাহাই করিবেন। দ্বিতীয়, 'তাওয়াফ্ফি'-এর অর্থ 'আকাশে উত্তোলন' বা 'বিনিদ্রিত করা' নহে–ইহার অর্থ 'মৃত্যু দান'। কারণ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম নিজের বেলায়ও 'তাওয়াফ্ফি' শব্দই ব্যবহার পূর্বক ইহার অর্থের মীমাংসা করিয়াছেন। এই মীমাংসার কারণেই ইমাম বুখারী রহ্মাতুল্লাহে আলায়হে এই হাদীসকে তাঁহার সহীহ্‌তে 'তফ্সীর অধ্যায়ে' স্থান দান করিয়াছেন। এখন, যেহেতু কোরআন শরীফ হইতে সুস্পষ্টরূপে জানা গেল যে, হযরত মসীহ্ (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, আমরা দেখিতেছি হাদীসে কি আছে? আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলেহী ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ– *"ইন্না ঈসা ইব্‌না-মারয়্যামা আ'শা ইশ্‌রীনা ও মিয়াতা সানাতান্" (তব্‌রানী ও কনযুলুল-ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হযরত ফাতেমা হইতে বর্ণিত হাদীস)* অর্থাৎ, "ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন।" দেখুন, কীরূপ পরিষ্কার ভাষায় এই হাদীস হযরত ঈসার (আঃ) মৃত্যুর সংবাদ দিতেছে। তারপর, আরো এক ক্ষেত্রে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ– *"লাওকানা মূসা ও ঈসা হাই-ইয়্যায়নে লামা ওসেয়া'হুমা ইল্লাৎ তেবায়ী"*

(ইব্নে- কসীর, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃঃ) অর্থাৎ 'মূসা ও ঈসা এখন জীবিত থাকিলে, আমার আবুর্তিতা ভিন্ন তাঁহাদের উপায়ন্তর ছিল না।" 'সোব্হান-আল্লাহ্'! মসীহ্র মৃত্যু সম্পর্কে ইহাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে? আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, মসীহ্ এ সময়ে জীবিত থাকিলে আঁ হযরতের পায়রবী করা ছাড়া তাঁহার কোনই উপায় ছিল না। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে তাঁহার বয়সও বলা হইয়াছে। হযরত ঈসার ওফাত হওয়ার ইহাও একটি পরিষ্কার দলীল যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে মে'রাজের রাত্রিতে পরলোকগত নবীগণের মধ্যে, যাঁহাদের ওফাত হইয়াছে দর্শন করেন।

কোরআন ও হাদীস হইতে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হইল, তদ্বারা দিবালোকের ন্যায় ইহা উজ্জ্বল হইয়া পড়ে যে, হযরত মসীহ্ অন্যান্য মানুষের ন্যায় মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও, যদি এখন এমন কোন হাদীস বা কোরআনের কোন আয়াত থাকে, যাহা হইতে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা মনে করেন যে, হযরত মসীহ্ এখনো জীবিত আছেন বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তবে কোরআন শরীফের বর্ণিত নিয়মানুসারে স্পষ্টার্থ আয়াতের (আয়াতুল-মোহকামাত) এবং সহীহ্ হাদীসের বিরোধী কোন আয়াত বা হাদীসের অর্থ করা সঙ্গত হইবে না। প্রত্যেক 'মোহ্কামাত' বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক আয়াতের অধীনেই অর্থ করা ফরয। নতুবা, আমরা আল্লাহ্র পানাহ্ চাই, স্বীকার করিতে হইবে যে, খোদার কালামে গরমিল আছে। গভীরভাবে চিন্তা করুন। যখন কোরআন শরীফের আয়াত সকল, এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের হাদীসগুলি জাজ্জ্বল্যমানভাবে পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করিতেছে যে, হযরত মসীহ্ (আঃ) মৃত্যু লাভ করিয়াছেন, তদবস্থায় এই বিষয় সংক্রান্ত যত আয়াত ও হাদীস আছে, তৎসমুদয় ইহাদেরই অধীনে আনয়ন করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইন্শাআল্লাহ, আমাদের এরূপ কোনই প্রয়োজন উপস্থিত হইবে না। কারণ, কোরআন শরীফে এমন কোন আয়াত নাই যে, উহাতে মসীহ্ এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। থাকিলে, তাহা উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু সমগ্র কোরআন শরীফ অনুসন্ধান করিলে, এরূপ একটি আয়াতও পাইবেন না যে, উহাতে মসীহ্ জীবিত থাকিবার উল্লেখ আছে। সেইরূপ, মসীহ্ জীবিত আছেন বলিয়া কোন সহীহ্ হাদীসও নাই। অবশ্য, ইহার বিপরীত এমন কোন কোন হাদীস পাওয়া যায় যদ্বারা মসীহ্র মৃত্যু সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণ নিম্ন বর্ণিত দুইটি আয়াত হইতে মসীহ্ আলায়হেস্সালামের জীবন প্রমাণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। আয়াত দুইটি এই ঃ- *"ওয়া ইম্মিন্ আহ্লিল্ কেতাবে ইল্লা লাইয়ুমেনান্না বেহী কাব্লা মাউতিহি" (সূরাহ্ নেসা, রুকু ২২)* এবং *"ইন্নাহু লা-এল্ মুল্-লিস্-সাআ'তে" (সূরাহ্ যুখরুফ, রুকু ৬)।* এই আয়াতগুলোর পূর্বাপর অনুসঙ্গের প্রতি লক্ষ্যপূর্বক কেহ চিন্তা করিলে জানিতে

পারিবেন যে, ইহাদের সহিত মসীহ্ (আঃ) জীবিত থাকার দূরবর্তীও কোন সম্পর্ক নাই। কারণ, প্রথম আয়াতে শুধু ইহা বলা হইয়াছে যে, সকল আহ্লে কেতাবই তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে ইহাই বিশ্বাস করিবে যে, মসীহ্কে (আঃ) 'কতল' করা হইয়াছে। সন্নিহিত পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাদের এই ধারণারই উল্লেখ বিদ্যমান। যেমন, ইহুদীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাহারা বলিত, "ইন্না কাতাল্নাল্ মসীহ্' "আমরা মসীহ্কে কতল করিয়াছি।" অবশ্য মৃত্যুর পর প্রকৃত বিষয় তাহাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। ইহার আরো একটি প্রমাণ এই যে, 'কাব্লা মাউতিহি' (তাহার মৃত্যুর পূর্বে) স্থলে কোরআন করীমের অন্য কেরাতে (পাঠে) 'কাবলা মাউতিহিম্' (তাহাদের মৃত্যুর পূর্বে) কেরাত বা পাঠও বর্ণিত হইয়াছে। ('ইবনে জরীর,' ৬ষ্ঠ জেল্দ দ্রষ্টব্য। ইহা এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এখানে 'মৃত্যু' দ্বারা মসীহ্র (আঃ) মৃত্যু বুঝায় না, বরং আহলে কেতাবেরই মৃত্যু বুঝায়। দ্বিতীয় আয়াতেরও মসীহ্র জীবনবাদের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। কারণ, ইহা হযরত মসীহ্র (আঃ) 'বরুযী' (প্রতিবিম্বাকারে) পুনরাগমনের প্রতিই নির্দেশ করে, যাহা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্বজনস্বীকৃত আলামত বটে; কিম্বা ইহাতে হযরত মসীহ্ নাসেরী (আঃ) পিতা ব্যতিরেকে পয়দা হওয়ায় তাঁহাকে কেয়ামতের প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যাংশ 'ফালা তাম্তারুন্না বেহা" (ইহাতে কোন সন্দেহ করিও না') দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায়। সুতরাং, এই আয়াতদ্বয়ের একটি হইতেও হযরত মসীহ্ নাসেরী (আঃ) জীবত থাকা প্রমাণিত হয় না।

মসীহ্র জীবিত থাকার কখনো 'এজ্মা' হয় নাই ঃ

এখন প্রশ্ন, কোরআন শরীফ এবং হাদীসসমূহে পরিষ্কার ভাষায় হযরত মসীহ্র (আঃ) মৃত্যুর সাক্ষ্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি জীবিত থাকার কথা সমগ্র উম্মতের "এজ্মা", বা সর্বজনস্বীকৃত ধর্মমতে কীরূপে গৃহীত হইয়াছে? ইহার প্রত্যুত্তরে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অলীক ধারণা সম্বন্ধে কখনো সমগ্র উম্মতের "এজ্মা" হইয়াছিল, এই প্রকার দাবী সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু পুরুষগণের তথা সল্ফে সলেহীনের মধ্যে কেহ কেহ স্পষ্টতঃ মসীহ্র মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন। সাহাবা কেরাম রাযি আল্লাহু আন্হুমেরও ইহাই বিশ্বাস ছিল। রসূল করীমের চাচাত ভাই হযরত ইব্নে আব্বাসেরও (রাঃ) ইহাই মত ছিল। তাহার কোরআন শরীফের বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য আঁ হযরত সল্লল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম দোয়া করিয়াছিলেন। "মোতাওয়াফ্ফিকা"-এর অর্থ "মুমিতুকা" -"আমি তোমাকে মৃত্যু দিব" কহিয়া তিনি তাঁহার এই স্পষ্ট মত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, মসীহ্ (আঃ) মরিয়া গিয়াছেন ('বুখারী, কেতাবত-তফসীর)। তারপর ইমাম বুখারী (রহঃ) মোহাদ্দেসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ইমাম হওয়া অবিসম্বাদিত। তিনি ইহা তাঁহার সহীহ্তে সন্নিবিষ্ট করিয়া ইহার সত্যতা

অনুমোদন করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের অভিমতের প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করিয়াছেন।

সাহাবাগণের পর তাবেয়ীনের জামাত। তাঁহারাও মসীহ্র মৃত্যু হওয়াই বিশ্বাস করিতেন। 'মাজ্মাউল-বিহারে' লিখিত আছে ঃ-

"ওয়াল-আকসারু ইন্না ঈসা আলায়হেস্-সালামু লাম্ ইয়ামুৎ ওয়া কালা মালেকুন্ মাতা"– "অধিকাংশ ব্যক্তিগণের ধারণা হযরত ঈসার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু ইমাম মালেক বলেন যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে' ('মজ্মাউল-বিহার', ১ম খণ্ড, ২৮৬ পৃঃ)। এই উদ্ধৃতি সম্বন্ধে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। 'মজ্মাউল্-বিহার' প্রণেতা এ কথা বলেন না যে, হযরত ঈসা মরেন নাই ইহা সমগ্র উম্মতের মত বরং, তিনি ইহাতে অধিকাংশ ব্যক্তির মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার সময় পর্যন্তও এই মত এত সাধারণ হইয়া পড়ে নাই যে, ইহাকে সমগ্র উম্মতের ধর্মমত বলা যাইত। তারপর ইমাম ইব্নে হয্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ– 'ওয়াতামাস্সাকা বনু হাযমিন্ বেযাহেরিল্ আয়াতে ওয়া কালা বেমাউতিহি" ('কামালাইন' 'হাশিয়া জালালাইন', মুজতবাই প্রেসে মুদ্রিত, ১০৭ পৃঃ) "ইবনে হাযম আয়াতের জাহিরী অর্থের উপর নির্ভর করিয়া হযরত ঈসার (আঃ) মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন।" ইব্নে হায্ম তদীয় বিখ্যাত কেতাব "আল্ মোহাল্লায়" পরিষ্কার লিখিয়াছেন যে, হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়াছে। ('আল্ মোহাল্লা' ১ম খন্ড, ২৩১ পৃঃ)। তিনি কোনো সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর ইমাম ছিলেন। সেইরূপ, মোতাযালা সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত ঈসার (আঃ) মৃত্যু হইয়াছে। (তফ্সীর 'মজমাউল বয়ান' ১ম খণ্ড, সূরাহ্ মায়েদা-শেষ রুকু, "ফালাম্মা তাওয়াফ-ফায়তানী" "যখন আমাকে মৃত্যু দিলে"- আয়াত-এর অধীনে দেখুন। এই সকল কতিপয় নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ লিখিত হইল। নচেৎ, আরো বহু ব্যক্তি হইয়াছেন, তাঁহারা হযরত ঈসার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তদুপরি, অধিকাংশ প্রাচীন উলামারই এ সম্পর্কে কোন অভিমত বর্ণিত হয় নাই যে, তাহারা কী মত পোষণ করিতেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের প্রতি নেক্ ধারণা পোষণ করি। অবশ্য, তাঁহারাও কোরআনের শিক্ষানুযায়ী হযরত ঈসার (আঃ) মৃত্যুই স্বীকার করিতেন।

তারপর ইহাও লিখা অত্যাবশক যে, সাহাবাগণ সর্বপ্রথমে সকলে সম্মিলিতভাবে যে অভিমত- 'এজ্মা' গ্রহণ করেন তাহা ইহাই ছিল যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের পূর্বেকার সকল রসূলগণেরই মৃত্যু হইয়াছে। সাহাবাগণের জামানার পর মোহাম্মদী উম্মত দূর দূরান্ত দেশসমূহে এতধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে যে, সাহাবাগণের পরবর্তী কোন যুগে 'এজ্মার' দাবী করা কঠিন। এই জন্যই ইমাম আহমদ হাম্বল বলেন যে, "কোন মসলা সম্বন্ধে কেহ 'এজ্মা'র দাবী করিলে সে মিথ্যাবাদী" (মোসাল্লামুস্-সবুত' প্রভৃতি অসুলের কেতাবসমূহ দৃষ্টব্য) সুতরাং, এই ভ্রান্ত ধারণা

সম্বন্ধে উম্মতে মোহাম্মদীর কখনো 'এজ্‌মা' বা সর্বসম্মত মত গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তদ্বিপরীত, প্রকৃতপক্ষে কখনো কোন বিষয়ে উম্মতের 'এজ্‌মা' (সর্বজনস্বীকৃত) ধর্মমত গঠিত হইয়া থাকিলে উহা মসীহ্ তথা পূর্ববর্তী সমস্ত রসুলগণেরই মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্য, একথা সত্য, বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে হযরত মসীহ্ (আঃ) জীবিত আছেন বলিয়া ধারণা সাধারণভাবে মুসলমানগণের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহা আমাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য কোন প্রমাণ নহে। কারণ, অনেক সময়েই ভ্রান্ত ধারণাসমূহ বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। দেখুন, আজকাল মুসলমানগণের মধ্যে "৭২ ফেরকা" উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক যথেষ্ট মতানৈক্য আছে। এখন দেখা কর্তব্য, তাঁহাদের সকলেইতো সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সকলেই সত্য হইলে, অনৈক্য আবার কিসের? তাঁহাদের মতভেদ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, কোনো কোনো ভ্রান্ত ধারণা উম্মতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই সকল ধারণার উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে? কোরআন্ শরীফ এবং হাদীস উভয়ের মধ্যেই শুদ্ধ-প্রামাণ্য (সহীহ্) ধর্মমত ব্যক্ত থাকা সুনিশ্চিত। উভয়েই বিদ্যমান থাকিতেও ভ্রান্ত ধারণাসমূহের আমদানী কোথা হইতে হইয়াছে? আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিবেন, উহাই আমাদেরও উত্তর মনে করিতে হইবে। কিন্তু এখন প্রকৃত উত্তরও শ্রবণ করুন।

ইসলামে মসীহ্ জীবিত থাকার ধারণা কীরূপে স্থান পাইয়াছে ?

ইসলামের উন্নতির যুগে দলে দলে খৃষ্টীয়ানেরা ইসলাম গ্রহণ করে। মানুষ তাহার সঞ্চিত ধারণাসমূহ আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক। কথায় আছে, "রাম রাম" বলা এক দিনেই দূরীভূত হয় না, এবং "আল্লাহ্" নাম এক দিনেই সাধন হয় না। ইহা হইতেই সহজে অনুমেয় যে, এই সকল লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যখন ইসলামে প্রবেশ করিল, তখন যদিও তাহারা ইস্‌লামের সত্যতা অনুভব করিয়াই মুসলমান হইয়াছিল, তথাপি মানুষের ধারণাবলী হঠাৎ সম্পূর্ণ পরিবর্তন লাভ করে না বলিয়া এই সকল ব্যক্তি ধর্ম সংক্রান্ত বিস্তৃত বিষয়াবলীতে বহু খৃষ্টীয়ান ধারণা ইসলামে আমদানী করে। এক দিনে তাহাদের অন্তর হইতে সেগুলি দূর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাহাদের অন্তর হইতে শেরেকের সীমায় উপনীত হযরত মসীহ্‌র (আঃ) জন্য অতিরিক্ত প্রেম নীচে নামিয়া আসিলেও তখনো সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই। এই জন্য কোরআন শরীফ এবং হাদীসসমূহে যেখানেই মসীহ্‌র কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা স্বভাবতঃ টীকা সংযোগ করিয়াছে। ক্রমে ক্রমে মুসলমানগণ এই সকল ধারণার শিকার হইয়া পড়ে। এই কারণেই আমাদের সাবেক তফসীরকারকগণ কোরআন শরীফের ব্যাখ্যায় অহেতুক ইস্রাইলী কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা আরম্ভ করেন।

মৃতের পুনরাগমন নাই ঃ

দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরআন শরীফে উক্ত হ্ইয়াছে, মসীহ্ মুর্দ্দা জিন্দা করিতেন। ইহার পরিস্কার অর্থ আধ্যাত্মিক হিসাবে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মসীহ্ জীবনীশক্তির উৎপাদন করিতেন। নবীগণ ইহাই করিবার জন্য আগমন করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের সম্বন্ধে কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানুস্ তাজিবুলিল্লাহে ওয়ালির-রসূলে ইযা দাআকুম্ লেমা ইয়ুহ্য়িকুম" (সূরাহ্ আনফাল' রুকু ৩)।

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্র আহ্বানে সাড়া দাও এবং রসূলের ডাকেও হাজির হও, কেননা তিনি তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করেন।" দেখুন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের সম্বন্ধে কীরূপে পরিষ্কারভাবে "জীবিত করিবার" কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে সকলেই অবিসম্বাদিতক্রমে "আধ্যাত্মিক অর্থে জীবন-দান" অর্থ করেন। কিন্তু যেই মসীহ্র জন্য এই কথারই উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন বাস্তবিক মৃত ব্যক্তিদিগকেই পুনরায় জীবনদান অর্থ করা হয়। ইহা খৃষ্টীয়ান ধারণাবলীর বশবর্তী লোকদের প্রভাবেরই ফল। অথচ, কোরআন শরীফের সুস্পষ্ট শিক্ষা অনুসারে প্রকৃত মুর্দ্দা এ পৃথিবীতে পুনর্জন্ম লাভ করিতে পারে না– আবার এখানে জীবন ফিরিয়া পাইতে পারে না। যেমন, বলা হইয়াছে ঃ–

"ওয়ামিঊঁ ওয়ারায়েহিম্ বারযাখুন ইলা ইয়াওমে ইয়ুবআ'সুন" ('সূরাহ্ মু'মেনুন' রুকু ৬)।

"যাহারা মরিয়া যায়, তাহাদের এবং এ পৃথিবীর মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত বাধা দন্ডায়মান হয়।" সেইরূপ, মসীহ্র জন্য কোথাও "খাল্ক" (সৃষ্টি করা) শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, আমাদের তফ্সীরকারকগণ উহার মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ, এই প্রকার শব্দগুলি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'নযূলে মসীহ্' বা মসীহ্র অবতরণের ব্যাপারেও ইহাই ঘটিয়াছে। খৃষ্টীয়ান ধর্মে পূর্ব হইতেই হযরত ঈসার (আঃ) পুনরাগমনের সংবাদ চলিয়া আসিতেছিল এবং স্বয়ং মসীহ্রই আগমন হইবে বলিয়া খৃষ্টীয়ানেরা ধারণা করিতেছিল। ইহারা ইস্লামে দাখিল হইলে পর ইসলামেও একজন মসীহ্র (আঃ) আগমন-বার্তা পাইয়া তৎক্ষণাৎ মনে করিল যে, হউক আর না হউক, ইহা সেই সংবাদই যাহা খৃষ্টীয় ধর্মেও প্রচলিত আছে। ভাগ্যক্রমে, এখানে "নযূল'–"অবতরণ" শব্দটিও পাওয়া গেল। তবে আর কি? শেষ যুগে স্বয়ং ইস্রাইলী মসীহ্ই নাযেল হইবেন–তিনিই অবতরণ করিবেন– ভুলক্রমে ইহাই বিশ্বাস করা হইল। পরে গতানুগতিকভাবে যাহাদের আবির্ভাব হইল, পূর্বপুরুষদের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা উচ্চারণ করিবার মত সাহস তাঁহাদের কোথায়? কোরআন শরীফ খুলিয়া দেখুন, আদি হইতে সর্বসাধারণের একই ধ্বনি চলিয়া আসিয়াছে ঃ-

"বাল নাত্তাবেউ' মা আলফায়না আলায়হে আবা-আনা" ('সূরাহ্ বাকারাহ্ রুকু ১১) "আমরা ত আমাদের বাপ-দাদার পথেই চলিব।"

প্রতিশ্রুত মসীহ্ এই উম্মতের মধ্যেই পয়দা হওয়ার কথা ছিল ঃ

ব-ফযলে খোদা, এ পর্যন্ত আমরা কোরআন শরীফ এবং হাদীসের দিক হইতে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি যে, হযরত মসীহ্কে জিন্দা আকাশে উঠানো হয় নাই, এবং তিনি মৃত্যু লাভ করিয়াছেন এবং মসীহ্ জীবিত থাকার ধারণা পরে মুসলমানগণের মধ্যে ঢুকিয়াছে। নতুবা, সাহাবা কেরাম (রাঃ) তো সুনিশ্চিতরূপে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে যত রসূল হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। এখন, আমরা কোরআন শরীফ এবং হাদীস হইতে এ কথার প্রমাণ দিতেছি যে, ইসলামে যে মসীহ্ আগমনের ওয়াদা প্রদত্ত হইয়াছে, তিনি এই উম্মত হইতেই হইবেন। কোরআন শরীফে আল্লাহ্তাআলা বলেন ঃ–

"ওআ'দাল্লাহুল্-লাযিনা আমানু মিনকুম ও আমেলুস সালেহাতে লাইয়াস্-তাখ্লে-ফান্নাহুম ফিল্ আরদে কামাস্তাখ্-লাফাল্লিযিনা মিন কাবলেহিম ওয়া লা-ইয়ুমাক্কেনান্না লাহুম, দ্বীনাহুমুল্-লাযিরতাযা লাহুম" ('সূরাহ্ নুর,' রুকু ৭)।

-"আল্লাহ্তাআলা তাহাদের সহিত ওয়াদা করিতেছেন, যাহারা তোমাদের মধ্যে ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা করিবেন, যেমন তিনি তাহাদিগকে খলীফা করিয়াছিলেন যাহারা তাহাদের পূর্বে ছিল এবং তিনি তাহাদের ঐ ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন যাহা খোদা তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন।" এই আয়াতে আল্লাহ্তাআলা মুসলামানগণের সহিত ওয়াদা করিতেছেন যে, তিনি তাহাদের মধ্যে সেইভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের খলীফা করিবেন, যেমন তিনি বনী ইস্রাঈলের মধ্যে হযরত মূসার (আঃ) খলীফাগণকে খলীফা করিয়াছিলেন এবং এই খলীফাগণের দ্বারা ধর্মকে শক্তিশালী করিবেন। প্রকাশ্য কথা, হযরত মূসার (আঃ) পর আল্লাহ্তাআলা বনী ইস্রাঈলের মধ্যে বহু খলীফা পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা তৌরাতের খেদমত করিতেন। মূসায়ী শৃঙ্খলের এই খলীফাগণ হযরত মসীহ্ নাসেরীর মধ্যে চরমত্ব ও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। মুসলমানগণকেও এইরূপ খলীফাগণের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে এবং ঠিক যেমন মূসায়ী সেল্সেলার শেষ খলীফা হইয়াছিলেন ইস্রাইলী মসীহ্, সেইরূপ ইহাই সুনির্দিষ্ট ছিল যে শেষ যুগে মুসলমানগণের মধ্যেও একজন মুহাম্মদী মসীহ্ প্রেরিত হইবেন। তিনি ইসলামী খলীফাগণের রথ-চক্র পূর্ণ করিবেন এবং উহাকে পূর্ণত্ব প্রদান করিবেন। অন্য কথায়, এই প্রকারে এই উভয় শৃঙ্খলের–এই উভয় সেল্সেলার সৌসাদৃশ্য আল্লাহ্তাআলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা

'কামা' (-যেমন) শব্দ হইতে প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ জ্ঞানী ব্যক্তিরা অবহিত আছেন যে, সাদৃশ্যের জন্য ভিন্ন বস্তুর প্রয়োজন হয়। সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মোহাম্মদী সেল্‌সেলার মসীহ্ অর্থাৎ আখেরী খলীফা মূসায়ী সেলসিলার মসীহ্ হইতে একজন ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন এবং যদিও তিনি তাঁহার অনুরূপ (মসীল) হইবেন–কিন্তু তিনি সে ব্যক্তিই হইবেন না, বরং তাঁহা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হইবেন। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ্‌তাআলা এই আয়াতে 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্যে হইতে) বলিয়া সমগ্র কলহের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন এবং পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, মুসলমানগণের মধ্যে যে সকল খলীফা হইবেন, তাঁহারা মুসলমানগণের মধ্য হইতেই হইবেন– কেহই বাহির হইতে আসবেন না। সুতরাং, কতই না দুঃখের বিষয় যে, জেদের বশবর্তী হইয়া মুহাম্মদী সেলসেলার শেষ ও শ্রেষ্ঠ খলীফার আগমন বনী ইস্রাঈলের মধ্য হইতে হবে বলিয়া ধারণা পোষণ করা হয় এবং এই প্রকারে খোদা যে ওয়াদা 'মিনকুম' (তোমাদের মধ্য হইতে) বলিয়া করিয়াছেন, উহাকে উপেক্ষাপূর্বক প্রত্যাখ্যান করা হয়।

তারপর, শুধু ইহাই নয়, হাদীসেও পরিষ্কাররূপে বলা হইয়াছে যে, ওয়াদাকৃত (মাওউদ) মসীহ্ মোহাম্মদী উম্মত হইতেই হইবেন। তিনি এই উম্মতেরই এক ব্যক্তি–তিনি বাহির হইতে হইবেন না। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেন:

"কায়ফা আন্‌তুম ইযা নাজালাবনু মারয়্যামা ফিকুম ও ইমামুকুম্ মিনকুম" (বুখারী ও মোস্‌লেম, বহাওয়ালা 'মিশকাত,' বাব-উ-নযূলে ঈসা-বনে মারয়্যামা)।

"তোমাদের অবস্থা তখন কতই না উত্তম হইবে, হে মুসলমানগণ, যখন তোমাদের মধ্যে ইব্‌নে মরিয়ম নাযেল হইবেন এবং তিনি তোমাদের ইমাম হইবেন তোমাদেরই মধ্য হইতে।" এই হাদীস দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, মসীহ্ মাওউদ (ওয়াদাকৃত ও প্রতিশ্রুত মসীহ্) মুসলমানদেরই একজন ব্যক্তি বিশেষ মাত্র। 'মিনকুম' অর্থাৎ (তোমাদের মধ্য হইতে) দ্বারা ইহাই বুঝায়। অবশ্য যিনি আসিবেন, তিনি "ইবনে মরিয়ম" বলিয়া এখানে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু "মিনকুম"– "তোমাদেরই মধ্য হইতে" সজোরে ঘোষণা করিতেছে যে, এই "ইবনে মরিয়ম" পূর্বে যে 'ইবনে মরিয়ম' হইয়াছিলেন, তিনি নহেন। হে মুস্‌লমানগণ, ইনি তোমাদেরই মধ্য হইতে একজন হইবেন। 'ইবনে মরিয়ম' বলার তাৎপর্য্য পরে বলা হইবে। কিন্তু আপাততঃ, পাঠকগণ, শুধু এইটুকু মাত্র লক্ষ্য করিবেন যে, 'মিনকুম' ("তোমাদেরই মধ্য হইতে") কি মসীহ্ নাসেরীর পুনরাগমন সংক্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করিতেছে না? বড়ই পরিতাপের কথা! হযরত খাতামান্নবীঈন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার এই সংবাদ দিয়াছেন যে, মসীহ্ মাওউদ এই উম্মত হইতেই হইবেন, কিন্তু মুসলমানগণ মসীহ্ নাসিরীর প্রেমে শেরকের পর্যায়ে পৌছিয়া তাঁহাদের সংশোধনার্থে অকারণে বনী ইস্রাঈলের পদানত হইতেছেন। খোদা এই জাতির প্রতি দয়া করুন। ইহারা শ্রেষ্ঠ উম্মত হইয়াও ইহাদের কেমন অধঃপতন ঘটিয়াছে!

বস্তুত, প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্বন্ধে "ইমামুকুম্ মিনকুম" ("তিনি তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের ইমাম হইবেন" বলিবার দ্বারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম যাবতীয় ঝগড়ার ফয়সালা করিয়াছেন এবং সংশয় -সন্দেহের কোনই স্থান রাখেন নাই। তাঁহার বাৎসল্যের প্রতি আরও লক্ষ্য করুন। অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় অঙ্গীকৃত মসীহ্ এই উম্মতের এক ব্যক্তি হইবেন বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং তিনি আরোও বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"রাআয়তু ঈসা ও মুসা ফা-আম্মা মুসা ফা-আদামু জাসিমুন সিবতুশ-শা'রে কা-আন্নাহু মিনার-রেজালে যুত্তে" (বুখারী, কেতাব বাদাউল খালেক্)। অর্থাৎ, "আমি কাশ্‌ফে ঈসা এবং মূসা আলায়হিমাস-সালামকে দেখিয়াছি। ঈসা রক্ত বর্ণের ছিলেন। তাঁহার চুল ছিল কোঁকড়ানো। বক্ষ ছিল চৌড়া। মূসা গোধূম বর্ণের ছিলেন। দেহ ছিল ভারী। 'যুৎ' গোষ্ঠীর ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহাকে দেখাইতেছিল।"

এই হাদীসে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম হযরত ঈসা ইব্‌নে মরিয়মের অবয়ব বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণ ছিল লাল। তাঁহার চুল ছিল কোঁকাড়ানো। এখানে 'ঈসা' দ্বারা 'পূর্ববর্তী ঈসা' (আঃ) বুঝায়। ইহার প্রমাণ এই হাদীসেই বিদ্যমান। তাহাকে একজন পূর্ববর্তী নবী হযরত মূসার (আঃ) সহিত দেখার কথা বলা হইয়াছে। পাঠকগণ হযরত মসীহ্‌র এই হুলিয়া বিশেষভাবে মনে রাখিবেন। অপর এক হাদীসে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ—

"বায়না আনা নায়েমুন আতুফু বিল কা'বাতে ফা-ইযা রাজুলুন্ আদামু সিবতুশ্ শা'রে ইয়ান্ তেফু আও ইয়ুহরাকু রাসুহু মাআন, ফাকুলতু মান্‌হাযা কালু উবনু মরিয়্যামা .... ইলা আখের" (বুখারী, কেতাবুল ফেতান্, বাবু যেকরুদ-দাজজাল') অর্থাৎ "আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি কা'বা 'তাওয়াফ' করিতেছি। তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ ছিল গোধূম বর্ণ। তাঁহার চুল ছিল সোজা ও লম্বা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইনি কে? বলা হইল যে তিনি 'ইবনে-মরিয়ম'।" এই হাদীসে "ইবনে মরিয়ম" দ্বারা শেষ জামানায় যে মসীহ্ আবির্ভূত হওয়ার কথা আছে, তাঁহাকে বুঝায়। ইহার প্রমাণ, অতঃপর এই হাদীসেই দাজ্জালের উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, তখন তিনি দজ্জালকেও দেখিতে পাইয়াছিলেন। সুতরাং, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, দজ্জালের মোকাবিলায় যে মসীহ্‌র আবির্ভাব হইবে, ইনি সেই মসীহ্। ইহাতে বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে। বনী ইস্রাঈলের নিকট প্রেরিত মসীহ্ নাসেরীর বর্ণ ছিল লোহিত, চুল ছিল কোঁকড়ানো। কিন্তু দাজ্জালের বিরুদ্ধে যে মসীহ্ আবির্ভূত হওয়ার কথা, তাঁহার হুলিয়া হইল -তাঁহার গায়ের বর্ণ গোধূম, কেশ সোজা ও লম্বা। কোথায় লোহিত বর্ণ, আর কোথায় গোধূম বর্ণ! কোথায় কোঁকড়ানো চুল এবং কোথায় সোজা ও

দীর্ঘ কেশ। ইহা অপেক্ষা পরিষ্কার কথা আর কী হইতে পারে? উভয় মসীহ্‌রই ছবি পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত। এই ছবিদ্বয়ও আবার খাতামুন্ নাবীঈন সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের হাতে আঁকা। পাঠক নিজেই বিচার করুন, এই চিত্রদ্বয়ের দ্বারা কি একই ব্যক্তির চেহারা দেখা যায়? যাহাকে খোদা চক্ষু দিয়াছেন, সে ত কখনো উভয়ই এক-একথা কহিবে না। হযরত মির্যা সাহেব কেমন সুন্দর বলিয়াছেন ঃ- "মাওউদাম্ বহুলিয়ায়ে মাসুর আমাদাম্ হায়েফ্ আস্ত্ গার্ বদিদা না বিনান্দ, মান্‌যারাম, রাঙ্গাম্ চুঁ গান্দুম আস্ত ও বমাও ফার্কে বাইয়েন্ আস্ত, জাঁ সাঁ কেহ্ আমাদ আস্ত দার্ আখবারে সারওয়ারম ইম্রাক্‌দামান্ না জায়ে শকুক আস্ত,ও এলতেবাস্ সাইয়েদ জুদা কুনাদ যে মসীহে্ আহ্‌মারাম্"।

অর্থাৎ, "আমিই মসীহ্ মাওউদ। আমি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওসাল্লামের বর্ণিত হুলিয়া অনুসারে আসিয়াছি। সেই চক্ষুর প্রতি আক্ষেপ! যাহা আমাকে দেখিতে পায় না। আমার বর্ণ গোধূম। চুল ঐ ব্যক্তির চুল হইতে ভিন্ন, যাঁহার সম্বন্ধে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের হাদীসে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং, আমার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নাই। আমাদের মনিব, আমাদের নেতা স্বয়ং আমাকে লোহিত-বর্ণ মসীহ্ হইতে পৃথক করিয়াছেন।"

নযূল অর্থ ঃ

উপরে বর্ণিত প্রমাণসমূহ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় ইহা দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে যে, যে মসীহ্‌র আসার কথা আছে, তিনি পূর্ববর্তী মসীহ্ নাসেরী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। কোরআন সাক্ষ্য দিতেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্-(মসীহ্ মাওউদ) এই উম্মতেরই একজন ব্যক্তি। তারপর, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম উভয় মসীহ্‌র পৃথক পৃথক প্রতিকৃতি আমাদের সম্মুখে ধরিবার ফলে অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন বাকী রাখেন নাই। এখন সন্দেহের স্থান কোথায়? তবে একটি সংশয় অবশ্যই থাকে। যদি মসীহ্ মাওউদ এই উম্মত হইতেই হইবার ছিলেন, তবে তাহার জন্য "নযূল এবং ইবনে মরিয়ম" শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে কেন? নযূল শব্দ হইতে প্রকাশ পায় যে, মসীহ্ মাওউদ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন এবং "ইবনে মরিয়ম" শব্দ সম্মিলিত হইয়া ইহাই নির্দেশ করে যে, হযরত মসীহ্ নাসেরী স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা কর্তব্য, প্রথম কথা কোনো 'সহীহ্', 'মারফু, মোত্তাসেল'- ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত সত্য হাদীসে 'নযূলের' সহিত 'সামা' (আকাশ) শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই যে, তদ্দারা আকাশ হইতে অবতরণ অর্থ করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, 'নযূল' শব্দের অর্থের প্রতিও চিন্তা করা হয় নাই। আরবীতে "নযূল" অর্থ "প্রকাশিত হওয়া" এবং "আগমন" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে, কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌তাআলা বলেনঃ-

"কাদ আনযালাল্লাহু ইলায়কুম যেক্‌রার রসূলাই ইয়াৎলু আলায়কুম আয়াতিল্লাহে"
(সূরাহ্ তালাক, রুকু ২)।

"আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের প্রতি একজন স্মরণ-দাতা রসূল অবতীর্ণ করিয়াছেন, তিনি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌তাআলার আয়াতসমূহ পাঠ করিতেছেন।" এই আয়াতে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম সম্বন্ধে "নযূল" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অথচ, সকলেই জানেন যে, তিনি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হন নাই, বরং তিনি এ পৃথিবীতেই জন্ম গ্রহণ করেন। তারপর, কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে ঃ–

"ওয়া আন্‌যালাল্ হাদীদা ফিহে বাসুন শাদীদ ওয়া মানাফেউ লিন্ নাসে।" ('সূরাহ্ হাদীদ, রুকু ৩)

"আমি লৌহ অবতীর্ণ করিয়াছি। ইহাতে যুদ্ধের উপকরণ নিহিত আছে। এতদ্ব্যতীত, ইহাতে মানুষের জন্য বহুবিধ উপকারিতাও বিদ্যমান।" লৌহ কি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হয়? বস্তুতঃ, এই সকল আয়াত হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, "নযূল" শব্দ ঐ সকল বস্তুর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, যাহা খোদার তরফ হইতে মানুষ রহমতরূপে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং "নযূল" শব্দ হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যে, মসীহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন– একটি মারাত্মক ভুল। তারপর, পাঠক-পাঠিকা কি কখনো শোনেন নাই যে, আরবীতে মোসাফেরকে 'নাযীল' এবং অবস্থান-স্থলকে 'মন্‌জিল' বলা হয়। এছাড়া কোন কোন হাদীসে মসীহ্ সম্বন্ধে 'বাআসা' (প্রেরণ) এবং 'খরুজ' (বহির্গমন) শব্দগুলিও ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং, ইত্যাবস্থায় "বাআসা" "খরুজ" এবং "নযূল" এই শব্দত্রয়ের মধ্যে সাধারণ যে অর্থ, তাহাই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"ইবনে-মরিয়ম" তত্ত্ব ঃ

রহিল "ইবনে-মরিয়ম" নাম। এ সম্বন্ধে জানা আবশ্যক যে, ভবিষ্যতে আবির্ভূত হইবেন এরূপ কোন 'মানব' বা প্রত্যাদিষ্ট ধর্মসংস্কারকের কোন নাম কোন নবীর দ্বারা জ্ঞাত করা হইলে তাহা, সাধারণতঃ, কোন আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি নির্দেশ করে। এ জন্য এইরূপ নাম সর্বদা বাহ্যিকতার উপর প্রয়োগ করা ঠিক নয়। সাধারণতঃ, প্রতিশ্রুত ব্যক্তির এবং তাঁহার নামের মধ্যে কোন গভীর ও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ প্রকাশ করাই থাকে এই সকল নাম উল্লেখের উদ্দেশ্য। দৃষ্টান্তস্থলে, বনী ইস্রাঈলকে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল যে, মসীহ্ প্রকাশিত হইবার পূর্বে হযরত ইল্‌ইয়াস নাযেল হইবেন (বাইবেল, পুরাতন নিয়ম, শেষ পুস্তক, 'মালাখী', অধ্যায় ৪, পদ ৪)। হযরত ইলইয়াস (আঃ) মসীহ্ নাসেরীর প্রায় সাড়ে আট শত বৎসর পূর্বে আগমন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে ইহুদীদের ধারণা ছিল যে, তাঁহাকে আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছে (বাইবেল, পুরাতন বিধান, রাজাবলী-২, অধ্যায় ২, পদ ১১)। তজ্জন্য ইহুদীরা 'ইলইয়াস নাযেল হওয়ার' এই অর্থ করিয়াছিল যে, সেই অতীত যুগের ইল্‌ইয়াস নবীই পুনরাগমন করিবেন এবং তাঁহার অবতরণের পর মসীহ্ আসিবেন। এই কারণে হযরত ঈসা (আঃ) মসীহ্ হইবার দাবী করিলে ইহুদীরা পরিষ্কার অস্বীকার করিয়া বলিল, মসীহ্‌র পূর্বে ইল্‌ইয়াস নাযেল

হইবেন। কিন্তু এখনো ইল্‌ইয়াস আসেন নাই। সুতরাং, হযরত ঈসার (আঃ) দাবী সত্য নয়। হযরত ঈসা (আঃ) ইহার উত্তরে বলিলেন, "ইল্‌ইয়াস আসার যে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছিল, তদ্বারা স্বয়ং ইল্‌ইয়াসেরই আগমন অভীষ্ট ছিল না, বরং ইহাতে এমন একজন নবী আগমনের সংবাদ ছিল, যিনি ইল্‌ইয়াসের গুণাবলী লইয়া আগমন করিবার ছিলেন। তিনি আসিয়াছিলেন। তিনি ইয়াহ্‌ইয়া। যাহার চক্ষু আছে, সে দেখিতে পারে" (নতুন নিয়ম, মথি, ১১ অধ্যায়, ১৪ পদ)। কিন্তু বাহ্যিকতার ভক্ত, জাহেরা-পরস্ত ইহুদীরা এই জেদ ধরিয়াই রহিল যে, ইল্‌ইয়াসেরই আসিতে হইবে। তাহারা এইরূপে 'নাজাত' হইতে বঞ্চিত রহিল ('মথি' ১৭ অধ্যায়)।

এই উদাহরণ হইতে এই সত্যটি অতি সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে কোনো প্রতিশ্রুত সংস্কারকের যে নাম থাকে তাহা সব সময়ই বাহ্যিকভাবে পাওয়া অবশ্যম্ভাবী নয়। সাধারণত: ঐ প্রকার নাম কোনো আধ্যাত্মিক সৌসাদৃশ্য নির্দেশার্থেই ব্যবহৃত হয়। দৃষ্টান্তস্থলে, কোথায় ইল্‌ইয়াস নবীর আকাশ হইতে অবতরণের কথা; আর কোথায় ইয়াহ্‌ইয়ার পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ! কিন্তু হযরত মসীহ্ (আঃ) ইয়াহ্‌ইয়াকেই ইল্‌ইয়াস বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। কারণ, তিনি ইল্‌ইয়াসের গুণাবলী সহ আগমন করেন। এই দৃষ্টান্ত ইহাও ব্যাখ্যা করিতেছে যে, খোদার কালামে আকাশ হইতে কোনো প্রাচীন যুগের নবী অবতীর্ণ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী থাকিলে উহার অর্থ সেই অতীত নবী আকাশ হইতে ডানা নাড়িতে নাড়িতে ভূমিতে অবতরণ করিবার নহে; বরং, তদ্বারা তাঁহার অনুরূপ কোন ব্যক্তির আগমন বুঝায়। সুতরাং, ইহাই প্রতীতি হয় যে, মসীহ্‌র সম্বন্ধে এই যে বলা হইয়াছে- তিনি নাযেল হইবেন, ইহার দ্বারা স্বয়ং মসীহ্ আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন বুঝায় না; বরং মসীহ্‌র অনুরূপ কোন ব্যক্তির (মসীলে-মসীহ্‌র) আগমন বুঝায়। যেমন, ইল্‌ইয়াস নবীর আকাশ হইতে অবতরণের দ্বারা একজন মসীলে-ইল্‌ইয়াস (ইলইয়াসের অনুরূপ) অর্থাৎ হযরত ইয়াহ্‌ইয়ার জন্মগ্রহণ অভিপ্রেত ছিল।

বস্তুতঃ "ঈসা-ইব্‌নে মরিয়ম"–এই জাহেরী নামের দরুন উল্লাস করা এবং শুধু এই নামের কারণে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌কে অস্বীকার করা ভীষণ ধ্বংসাত্মক পথাবলম্বন বটে। ইহা পরিহার করা একান্ত কর্তব্য। কারণ, নাম সর্বদা বাহ্যিকভাবে পাওয়া যাওয়া জরুরী নয়, বরং, তাহাতে জ্ঞানপূর্ণ সত্যই অন্তর্নিহিত থাকে। আলোচ্য বিষয়ের আরো সবিশদ ব্যাখ্যা করে, এরূপ একটি উদাহরণ কোরআন শরীফ হইতে প্রদত্ত হইতেছে। 'সূরাহ্ সাফে' (২৮ পারা) লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) তাঁহার পরে একজন নবী আসিবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাঁহার নাম 'আহমদ'। (সূরাহ্ সাফ্, রুকু ১) আমাদের বিরুদ্ধবাদী মুসলমানগণ সকলেই মনে করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম -এর আবির্ভাবের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকেই জানেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের প্রকৃত নাম 'মোহাম্মদ' ছিল, 'আহমদ' ছিল না। ইহা অবশ্যই সত্য যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের দাবীর পর বলিলেন যে, আহমদও তাঁহার

নাম। কিন্তু দাবীর পর এই নাম নিজের প্রতি আরোপের ফলে বিপক্ষীয়গণের জন্য কোনই যুক্তি হইতে পারে না। তাহাদের জন্য তবেই ইহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, যদি একথা নির্ণীত হয় যে, বাস্তবিক তাঁহার গুরুজনেরা তাঁহার নাম 'আহ্মদ' রাখিয়াছিলেন, কিম্বা দাবীর পূর্বে তাঁহাকে এই নামে ডাকা হইত। কিন্তু কোনো সহীহ্ হাদীসের দ্বারা কখনও এ কথা সমর্থিত হয় না। সুতরাং, এই সন্দেহ নিবারণার্থে ইহা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মধ্যে আহমদ হওয়ার গুণ পাওয়া যাইত এবং আসমানে তাঁহার নাম "আহমদ"ও ছিল, যেমন আস্মানে ইয়াহ্ইয়ার (আঃ) নাম "ইল্ইয়াস"ও ছিল। এই দুইটি উদাহরণ হইতে এ কথা অতিশয় পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, ভবিষ্যদ্বাণীতে যে নামের উল্লেখ থাকে, তাহা বাহ্যিকভাবে প্রাপ্ত হওয়া জরুরী নয়; বরং তদ্বারা, সাধারণতঃ ইহাতে কোন অভ্যন্তরীণ গুণ নির্দেশ করা হয়। ইহা হইতে যে নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হয় তাহা হইল খোদাতাআলার সহিত আসল সম্বন্ধ বস্তুর, জাহেরী নামের নহে। লোকেরা, অবশ্য পরিচয়ের জন্য প্রকাশ্য নামের প্রতি লক্ষ্য করে। কিন্তু খোদার নজরে 'আসল নামই' হইল 'গুণবাচক নাম' (সিফতী নাম), বাহ্যিক নাম নয়।

এখন প্রশ্ন, খোদাতাআলা প্রতীক্ষিত মসীহ্কে "ইবনে মরিয়ম" নামে অভিহিত করিবার কারণ কি? ইহার প্রত্যুত্তরে অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে সকল কথা লিখিলে ইহার কলেবর অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তজ্জন্য কয়েকটি সাধারণ তত্ত্বের উল্লেখই আমরা যথেষ্ট বিবেচনা করিলাম।

প্রথমতঃ যে মসীহ্ আসিবার কথা আছে, তিনি হযরত ঈসার (আঃ) বিশেষ গুণাবলী সহ আসিবার ছিলেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া হযরত ইল্ইয়াসের গুণসহ আগমন করেন। সুতরাং, হযরত ইয়াহ্ইয়া আসায় হযরত ইল্ইয়াসের আগমনের ওয়াদা যেমন পূর্ণ হইয়াছিল, তেমনি কোন 'মসীলে মসীহ্' বা মসীহ্র অনুরূপব্যক্তির আগমনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবার ছিল। সুতরাং, এই সাদৃশ্যের দরুন হযরত মসীহ্ মাওউদ অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্র নাম 'ইব্নে মরিয়ম' রাখা হইয়াছে।

দ্বিতীয় 'হেকমত' বা নিগূঢ় তত্ত্ব এই যে, মসীহ্ নাসেরী (হযরত ঈসা) মূসায়ী সেলসেলার শ্রেষ্ঠ খলীফা-'খাতামুল-খোলাফা' ছিলেন। সেইরূপ মোহাম্মদী মসীহ্ মোহাম্মদী সেল্সেলার 'খাতামুল-খোলাফা' বা শ্রেষ্ঠ খলীফা হওয়া নির্ধারিত ছিল।

তৃতীয় এবং বড় 'হেক্মত' এই যে, কোরআন শরীফ এবং হাদীসসমূহ হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, আখেরী জামানায় খৃষ্টীয়ান মত জোর বাঁধিবার এবং ক্রুশ-ধর্ম প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠার কথা ছিল। তজ্জন্য মসীহ্ মাউওদের সবচেয়ে বড় কাজ ইহাই নিরূপিত হইয়াছে যে, তিনি ক্রুশ-ধর্মের প্রাবল্য নাশ করিবেন। 'ইয়াক্সেরুস্-সলিবা' অর্থাৎ, 'ক্রুশ ভঙ্গ করা' মসীহ্ মাওউদের শ্রেষ্ঠ কার্য। ইহাতে এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, কোন নবীর উম্মতে ফাসাদ উৎপন্ন হইলে ন্যায়তঃ এই ফাসাদ দূরীভূত করা সেই নবীরই কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে, যেমন কোনো রাষ্ট্রে বিপ্লব উপস্থিত হইলে উহা দূরীভূত করিবার দায়িত্ব বাহিরের কোনো রাষ্ট্রের না হইয়া সেই রাষ্ট্রেরই এই দায়িত্ব হইয়া থাকে। সুতরাং, যেহেতু শেষ জামানার প্রতিশ্রুত ধর্ম্ম-সংস্কারকের অন্যতম প্রধান কার্যই

হইল তিনি ক্রুশ-ধর্ম্মের ফাসাদ দূরীভূত করিবেন, তন্নিমিত্ত হযরত ঈসার সহিত সৌসাদৃশ্য প্রকাশার্থে তাঁহার নাম 'ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম' এবং 'মসীহ্' রাখা হইয়াছে। শেষ জামানার জন্য ইহাও নির্দিষ্ট ছিল যে, তখন ভীষণ ফেৎনা-ফ্যাসাদের যুগ হইবে এবং উম্মতের মধ্যেই সৃষ্টি হইবে। এরূপ সময়ে সব উম্মতের প্রবর্ত্তকগণের 'বরুয' বা 'প্রতিবিম্ব' জাহের হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। তাঁহাদের 'বরূযের' আগমন সেই সকল ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণেরই আসা বিবেচিত হওয়া জরুরী ছিল, যেন তাঁহারা স্ব স্ব উম্মতের 'ইস্‌লাহ' বা সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু এক সঙ্গে বহু সংস্কারকের অভ্যুত্থান বিশ্বে ফাসাদ দুর করিবার স্থলে বৃদ্ধি করাই সুনিশ্চিত ছিল। অধিকন্তু, যেহেতু ইসলামের আবির্ভাবের ফলে যাবতীয় আধ্যাত্মিক নেয়ামত ইহারই বিশেষত্ব হইয়াছে এবং কোনো সংস্কারক - কোনো মোস্‌লেহ্- ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো উম্মতেই আবির্ভূত হওয়ার ছিলেন না – এই কারণে ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, সমস্ত নবীগণের বরুয তাঁহাদের সকলের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছায়াস্বরূপে একই ব্যক্তি ইসলামে আবির্ভূত হইবেন। এই আগমনকারীর কার্য্য ছিল, তিনি সব উম্মতের সংস্কার সাধন করিবেন। অন্য কথায়, প্রতিশ্রুত সংস্কারকের কার্য্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সংস্কার – ইহার ইসলাহ্। দুই, অন্যান্য সব উম্মতের ইস্‌লাহ্। কিন্তু অন্যান্য উম্মতের ইস্‌লাহের ব্যাপারে যেহেতু সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কার্য্য ছিল হযরত মসীহ্ নাসেরীর (আঃ) উম্মতের সংস্কার সাধন এবং তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের অপনোদন, তজ্জন্য এই দিক হইতে আগমনকারী 'ঈসা ইবনে-মরিয়ম' নামে অভিহিত হওয়ার ছিলেন। এই জন্যই রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লাম এই প্রতিশ্রুত সংস্কারকের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইয়াক্ সেরুস্ সালীব" –অর্থাৎ, মসীহ্ মাওউদ ক্রুশ ধর্ম্মীয় বিপ্লবের আবসান করিবেন। হযরত মির্যা সাহেব বলেন ঃ-

"চুঁ মরা নুরে পায়্-এ কওমে মসীহী দাদাআন্দ্, মাস্‌লেহাৎরা ইব্‌নে মরিয়াম নামে মান্ বেনেহাদা আন্দ"।

অর্থাৎ, "আমাকে খৃষ্টীয়ান জাতির ইস্‌লাহের জন্য বিশেষভাবে জ্যোতিঃ প্রদত্ত হওয়ায় এই বিশেষত্বের দিক হইতে আমার নাম 'ইব্‌নে মরিয়ম' রাখা হইয়াছে।"

ইহার মুকাবিলায় অন্যান্য উম্মত সকলের ইস্‌লাহের দিক হইতে কেবল মাত্র "ওইযার্-রসূল উক্কেতাৎ"-বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, "আখেরী জামানার সমস্ত রসুলগণ (বরুযীভাবে– আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছায়া স্বরূপে একই ব্যক্তির মধ্যে) একত্রিত হইবেন।" (সূরাহ্ মুরসালাত)

পক্ষান্তরে, উম্মাতে মোহাম্মদীয়ার ইস্‌লাহের কার্য্যও অতি গুরু-দায়িত্বপূর্ণ ছিল। তজ্জন্য এই দিক হইতে আগমনকারীর নাম "মোহাম্মদ" এবং "আহ্‌মদ"ও রাখা হইয়াছে। কারণ, উম্মতে-মোহাম্মদীয়ার ইস্‌লাহের কার্য্যার্থে এই প্রতিশ্রুত সংস্কারক আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়াসাল্লামের 'বরুয ও যিল্ল' (প্রতিবিম্ব ও প্রতিচ্ছায়া) হওয়ার ছিলেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী
একই ব্যক্তি ঃ

হযরত মসীহ্ নাসেরীর মৃত্যু এবং তৎসংক্রান্ত প্রশ্নাবলী সংক্ষেপে আলোচনার পর এখন আমরা যে প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা হইল প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহ্দী কি একই ব্যক্তি? না, ইঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তি? আজকাল সাধারণতঃ মোসলমানগণ মনে করেন যে, মসীহ্ এবং মাহ্দী দুইজন পৃথক ব্যক্তি। কিন্তু চিন্তা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ইহা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম -এর পবিত্র বাণীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত। কিন্তু এই গবেষণার প্রারম্ভে সংক্ষেপে ইহা বলা আবশ্যক, মাহ্দী সম্বন্ধে মোসলমানগণ কী কী মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, জানা আবশ্যক, মাহ্দী সম্বন্ধে বর্ণনাগুলি এত পরস্পর বিরোধী ও অনৈক্যে ভরতি যে, পড়িলে অবাক হইতে হয়। অনৈক্য শুধু এক বিষয়ে নহে। প্রায় প্রত্যেক বিষয়ে মতবিরোধ বিদ্যমান। দৃষ্টান্তস্থলে, মাহ্দীর বংশ সম্বন্ধে এত অনৈক্য রহিয়াছে যে, খোদার শরণ নেওয়া কর্তব্য। এক দল বলেন, মাহ্দী হযরত ফাতেমার (রাঃ) বংশধর হইবেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ও আবার তিনভাগে বিভক্ত। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধর হইবেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ইমাম হোসনের (রাঃ) বংশধর হইবেন। অপর এক সম্প্রদায় বলেন, তিনি ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসেন (রাঃ) উভয়েরই বংশধর হইলে, পিতা হইবেন ইমাম হোসেনের বংশধর; কিম্বা পিতা ইমাম হাসানের (রাঃ) বংশধর হইলে অর্থাৎ মাতা হইবেন ইমাম হোসেনের (রাঃ) বংশধর। তারপর, আর এক সম্প্রদায় আছেন। তাঁহারা বলেন যে, মাহ্দী হযরত ফাতেমার (রাঃ) বংশধর না হইয়া হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর হইবেন। অতঃপর কোন কোন হাদীসে পাওয়া যায়, মাহ্দী বিশেষ কোন বংশেই জন্মগ্রহণ করিবেন না; তিনি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের উম্মত হইতে হইবেন। এই ছাড়া মাহ্দী ও মাহ্দীর পিতার নাম সম্বন্ধে অনৈক্য আছে। কোন কোন হাদীসে তাহার নাম মুহাম্মদ, কোন কোন হাদীসে আহমদ, এবং কোন কোন হাদীসে ঈসা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুন্নীদের মতে পিতার নাম আব্দুল্লাহ্। কিন্তু শিয়াগণ বলেন যে, তাঁহার পিতার নাম হাসান হইবে। তদ্রূপ, মাহদী জাহের হওয়ার স্থান সম্বন্ধেও মতভেদ বিদ্যমান। তারপর, মাহদী কত কাল পৃথিবীতে কাজ করিবেন, সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। বস্তুতঃ, মাহ্দী সংক্রান্ত প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই মতানৈক্য বিদ্যমান। আরো মজার বিষয়, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই স্ব স্ব দাবীর সমর্থনে হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করেন। (নবাব আল্লামা সিদ্দীক হাসান খাঁ প্রণীত 'হুজাজুল্ কেরামাহ্' দ্রষ্টব্য) সুতরাং এমন অবস্থায় মাহ্দী সম্বন্ধে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের সবগুলিই সহীহ্ বলিয়া মান্য করা যায় না। এই কারণেই ইমাম বুখারী রহ্মতুল্লাহ্ আলায়হে এবং ইমাম মোসলেম আলায়হের রহমত তাঁহাদের দুই সহীহ্তে মাহ্দী সম্বন্ধে কোন অধ্যায়

সংযোজিত করেন নাই। কেননা, তাঁহারা এই সকল হাদীসের কোন একটিও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। সেইরূপ, উলামাগণও মাহদী সংক্রান্ত যাবতীয় হাদীসকে "যয়ীফ" বা দুর্ব্বল বলিয়াছেন, এবং পরিষ্কার লিখিয়াছেন যে, মাহদী সংক্রান্ত যত বর্ণনা, যত রেওয়ায়াত আছে, কোন একটিও জেরার বহির্ভূত নহে অর্থাৎ প্রশ্নাতীত নহে ('হুজাজুল-কেরামাহ্')।

এখন, স্বভাবতঃ প্রশ্ন হয়, এই প্রকার মতভেদের কারণ কি? আমরা যতখানি চিন্তা করিয়াছি, তাহাতে ইহাই কতকটা কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, যদিও একজন মাহ্দী সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াদা করা হইয়াছে, তবু প্রকৃতপক্ষে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম সাধারণভাবে কতিপয় মাহ্দীর সংবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় জাহের হওয়ার ছিলেন। এইজন্য এই সকল রেওয়ায়াতে অনৈক্য থাকা স্বাভাবিক। শুধু এই ভুল হইয়াছে যে, জনসাধারণ এই সকল রেওয়ায়াত একই ব্যক্তি সংক্রান্ত বলিয়া মনে করিতে থাকে। অথচ, এগুলি ছিল বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে।

অপিচ, ইহাও সত্য এবং আমাদের অভিজ্ঞতাও ইহার সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় যাবতীয় আশীষ আপনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে তৎপর হয়। সুতরাং, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম যখন ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, তাঁহার উম্মতে একজন মাহ্দী হইবেন, উত্তর কালে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই চাহিল প্রতিশ্রুত মাহদী তাহাদেরই মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবেন। সকলেই মুত্তাকী এবং খোদা-ভীরু হয় না। কেহ কেহ এরূপ হাদীস উদ্ভাবন করিল যদ্বারা প্রকাশ পাইত যে, মাহ্দী তাহাদেরই গোত্র হইতে হইবেন। এই কারণেই মাহ্দী সংক্রান্ত হাদীসসমূহে এত অনৈক্যের উদ্ভব হইয়াছে এবং উহাদের মধ্যে এত অধিক বিশৃঙ্খলা পাওয়া যায়। কিন্তু যে সকল হাদীস মাহ্দী কোন বিশেষ কুলজ হইবেন বলিয়া নির্দ্দেশ করে না এবং শুধু এইটুকু শিক্ষা দেয় যে, তিনি উম্মতে -মোহাম্মদীয়ারই একজন হইবেন, এই হাদীসগুলি অগ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহাদিগকে জাল বলিবার সঙ্গত কারণ নাই। কারণ, মাহ্দী উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ব্যক্তি বিশেষ হইবেন বলিয়া হাদীস তৈরী করিবার মত কাহারও কোন প্রকার প্রয়োজন কি থাকতে পারিত? অবশ্য, যে সকল হাদীস মাহ্দীকে বিশেষ কোন গোত্রজ হইবেন বলিয়া নির্দ্দেশ করে উহাদের সম্বন্ধে এই সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয় যে, পরবর্ত্তী কালে সেইগুলি উদ্ভাবন করা হয়।

সুতরাং এই সকল অনৈক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহাই আমাদের বক্তব্য হইয়া পড়ে, যেন মাহদীকে গোত্র বিশেষের ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ না করিয়া সমবেতভাবে আমরা এই ঈমান রাখি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এমন একজন মাহ্দী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার উম্মতের মধ্যে আখেরী জামানায় জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহাতেই আমাদের মঙ্গল। ইহাই সতর্কতা-মূলক

পথ। কারণ, যদি আমরা বিশ্বাস পোষণ করি যে, মাহদী ফাতেমী বংশজ হইবেন, কিন্তু তিনি আব্বাসীয় কুলে জন্মগ্রহণ করেন, তবে উক্ত বিশ্বাস আমাদের পথে বড়ই বাধার সৃষ্টি করিবে এবং আমরা মাহদীর প্রতি ঈমান আনা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। সেইরূপ যদি আমরা এই মত পোষণ করি যে, মাহদী বনী আব্বাস হইতে হইবেন, কিন্তু তিনি **ফাতেমী** কুলে জন্মগ্রহণ করেন বা হযরত উমরের (রাঃ) বংশধরের মধ্য হইতে তিনি জাহের হন, আমরা তাঁহার প্রতি ঈমান আনা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। সুতরাং আর কিছু না হউক, অন্ততঃ আমাদের ঈমান বাঁচাইবার জন্য মাহদীকে বিশেষ কোন গোত্রজ বলিয়া সাব্যস্ত না করিয়া আমাদের এই ঈমান রাখা কর্ত্তব্য যে, মাহদী উম্মতে মোহাম্মদীয়ায় জাহের হইবেন এবং মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের খাদেম ও অনুবর্ত্তীদেরই মধ্যে একজন হইবেন। এই প্রকার ঈমান রাখার ফলে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিব। আর যদি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম, বাস্তবিকই মাহ্দী কোন বিশেষ গোত্রজ হইবেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ অংশ বিশেষ সম্যক বস্তুরই অন্তর্গত।

আরো একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মাহ্দীর নাম এবং তাঁহার পিতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবু, অধিকতর প্রবল মত ইহাই চলিয়া আসিয়াছে যে, মাহদীর নাম মোহাম্মদ এবং তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ্ হইবে। প্রকৃতপক্ষে, এই মতের সমর্থন-সূচক যে সকল রেওয়ায়াত আছে, সেগুলি জেরার বহির্ভূত না হইলেও অন্যান্য রেওয়ায়াত অপেক্ষা রেওয়ায়াতের নিয়ম-কানুনের দিক দিয়া অধিকতর শক্তিশালী। সুতরাং যদি আমরা এই উক্তিকে প্রাধান্য দিই তবে ইহা ইনসাফের বিরোধী হইবে না। কারণ, সূরাহ, জুমুয়ার আয়াত *'ওয়া আখারীনা মিন্হুম'* ("তাহাদেরই সম্প্রদায়, যাহারা এখনো তাহাদের সতিহ সম্মিলিত হয় নাই") হইতে এই সন্ধান পাওয়া যায় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আখেরী জামানায় এক জাতিরও রূহানী তরবীয়ত করিবেন, তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিবেন। ইহার অর্থ শেষ জামানায় তাঁহার একজন পূর্ণতম পুরুষ আবির্ভূত হইবেন। তিনি তাঁহার রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া এক জামাতের শিক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। সুতরাং, আমরা বলি আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ওয়াদাকৃত মাহদীর নাম "মোহাম্মদ" এবং তাঁহার পিতার নাম "আবদুল্লাহ্" এই অর্থ প্রতিপাদনার্থেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাহদীর কোন নিজস্ব স্বাধীন সত্তা নাই, বরং তিনি সূরাহ্ জুমুআর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই কামেল 'বুরুয'-পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া। অন্য কথায়, মাহদীর নাম সম্বন্ধে মোহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ ব্যক্ত করায় তাঁহার নাম ও ঠিকানার পরিচয় করানো উদ্দেশ্য ছিল ইহা বুঝানো যে, মাহদীর আবির্ভাব রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামেরই আবির্ভাব এবং মাহদীর অস্তিত্ব তাঁহারই অজুদস্বরূপ। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের কথায় ইহারই প্রতি সংকেত বিদ্যমান। কারণ, হাদীসে একথা বলা হয় নাই যে, মাহ্দীর নাম "মোহাম্মদ বিন্

আবদুল্লাহ্" হইবে, বরং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম প্রকৃতপক্ষে বলিয়াছেন ঃ *"ইয়ুওয়াতি ইসমুহু ইস্‌মি ওয়াইসমু আবিহে ইসমা আবি" ('মিশকাত', বাবু আশ্‌রাতিস্ সা'আ)।*

-"মাহদীর নাম আমার নামানুসারে হইবে এবং মাহদীর পিতার নাম আমার পিতার নামানুসারে হইবে বলার কৌশলই তাঁহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছে।

দ্বিতীয় কথা, মাহদীর গোত্র সম্বন্ধে অধিক সহীহ্ উক্তি হইল তিনি আহ্‌লে-বয়েত বা পৌরজন হইতে হইবেন। অন্যান্য উক্তিগুলি ইহার চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর। ইহাকেও যথার্থ বলিয়া মনে করায় কোন প্রমাণ ঘটে না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি "আখারীনা মিনহুম্" "তাদেরই মধ্য হইতে অন্যেরা" সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হইলে পর সাহাবাগণ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করায় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম সালমান ফারসী রাযি আল্লাহু আন্‌হুর পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিয়াছিলেন *ঃ লাও কানাল্ ঈমানু ইন্‌দাস, সুরাইয়্যা লা-নালুহু রাজুলুম্ মিন হাউলাআয়ে"* ('মিশ্‌কাত, বাবু জামে-উল্-মুনাকেব) অর্থাৎ "ঈমান পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া সুরাইয়া নক্ষত্রে গমন করিলেও এই সব পারশ্য দেশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন উহাকে তথা হইতে ধরায় ফিরাইয়া আনিবেন।" অন্য কথায়, তিনি মাহদীকে হযরত সাল্‌মানের জাতি হইতে হইবেন বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। সালমান রাযি আল্লাহু আন্‌হু পারশ্য বংশীয় ছিলেন। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতে পাই, আহ্‌যাব যুদ্ধের সময় নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ওয়া সাল্লাম তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "সাল্‌মানু মিন্না আহ্‌লিল্ বায়তে" ('তাবারী') অর্থাৎ, সালমান আমাদেরই পরিবারভুক্ত, আমারই আহ্‌লে-বায়েত।" সুতরাং মাহদী সম্বন্ধে 'আহ্‌লে বায়েত' বলাতেও হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর বিরোধিতা হয় না, বরং উহারই সমর্থন করে। ইহা একটি সূক্ষ্ম-তত্ত্ব। ইহা ভুলা উচিত নয়। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুত মাহদী এক দিকে সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী পারশ্য বংশীয় বলিয়াও নির্ণীত হন এবং অন্য দিকে সাধারণ রেওয়ায়াতগুলি অনুসারে তিনি 'আহ্‌লে বায়েত' (তাঁহার পরিবারভুক্ত) বলিয়াও সাব্যস্ত হন।

ইহা ছাড়া আমরা দেখিতে পাই, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম মসীহ্ ও মাহদী সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইয়ুদফানু মা'য়ী ফি কাব্‌রি" ('মিশকাত' কেতাবুল ফেতান, বাব নযুলে ঈসা-ইবনে মরিয়ম) অর্থাৎ, "তিনি আমার সহিত আমার কবরে সমাহিত হইবেন।" ইহাতেও সেই আধ্যাত্মিক ঐক্যের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নতুবা আল্লাহ্ পানাহ্, কোন দিন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের কবর উপড়ানো এবং উহাতে মসীহ্ মাহদীকে দাফন করা হইবে, এইরূপ ধারণা করা নির্ব্বুদ্ধিতা ও লজ্জাহীনতার পরিচায়ক মাত্র। কোন সাচ্চা গয়রতশীল মোসলমান কোন মুহূর্তেই ইহা সহ্য করিবে না। সুতরাং ইহাই সত্য যে, এই প্রকার যাবতীয় উক্তি দ্বারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ইহাই

নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মাহ্দী তাঁহার 'কামেল বরুয', (পূর্ণ প্রতিবিম্ব) হইবেন এবং তাঁহার আগমনে যেন তিনিই (সঃ) আসিবেন।

এই ভূমিকা দানের পর আমরা ব-ফয্‌লে খোদা এখন প্রমাণ করিতেছি যে, মাহ্দী ও মসীহ্ পৃথক পৃথক দুই ব্যক্তি নহেন; বরং বিভিন্ন দিক হইতে একই ব্যক্তির এই দুইটি নাম। মাহ্দী শব্দের অর্থই প্রথমতঃ আমাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, মসীহ্ ও মাহ্দী একই ব্যক্তি। তারপর, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম মাহ্দী শব্দ ব্যক্তি-বাচক নামরূপে ব্যবহার করেন নাই। তিনি ইহা গুণ-বাচক নামরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। মাহ্দী অর্থ 'হেদায়াত প্রাপ্ত'। কোন কোন হাদীস হইতে জানা যায় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এই শব্দ কোন কোন এরূপ ব্যক্তিগণের জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, যাঁহারা 'মাহ্দী মাওউদ' বা প্রতিশ্রুত মাহ্দী নহেন। দৃষ্টান্তস্থলে, তাঁহার (সাঃ) আধ্যাত্মিক স্থলবর্ত্তী - তাঁহার (সাঃ) 'খলীফাগণ' সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ-

"আল্-খোলাফা-ইর্-রাশেদীনাল্ মাহ্দীয়িনা" - "আমার খলীফাগণ মাহ্দী।" সুতরাং, রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর সর্ব্ববাদী স্বীকৃত শ্রেষ্ঠতম খলীফা প্রতিশ্রুত মসীহ্ অবশ্যই শ্রেষ্ঠতম মাহ্দী। উম্মতের এই শ্রেষ্ঠতম মাহ্দীই ইহার প্রতিশ্রুত মাহ্দী। কারণ, নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের বাক্যানুসারে তাঁহার খলীফাগণ সকলেই মাহ্দী। প্রতিশ্রুত মাহ্দী (ইমামুল মাহ্দী মাওউদ) অবশ্য তিনিই, ইহাদের মধ্যে যাঁহার আগমনের বিশেষভাবে সংবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যদিও আরো ব্যক্তিগণ মাহ্দী হইবেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াদা করা হইয়াছে, তিনিই মসীহ্।

তারপর, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ- *"কায়ফা তাহ্লেকু উম্মাতুন্ আনা আওয়ালুহা ও ঈসা ইব্নু মারয়্যামা আখেরুহা"* (কন্যুল- আম্মাল, ৭খণ্ড, ১০৩ পৃঃ)-"সেই উম্মত কীরূপে ধ্বংস হইতে পারে, যাহার প্রথমে আছি আমি এবং শেষে রহিয়াছে ঈসা-ইবনে মরিয়ম!"

আবার বলিয়াছেন ঃ *"খায়রু হাযেহিল্-উম্মাতে আওয়ালুহা ও আখেরুহা আওয়ালুহা ফিহিম রসূলুল্লাহে ও আখেরুহা ফিহিম ঈসা ইব্নু মরয়্যামা বায়না যালেকা ফায়জুন অ'উজু লায়সু মিন্নি লাস্তু মিন্হুম"* ('কান্যুল্- উম্মাল', ৭ম খণ্ড, ২০২ পৃঃ)। অর্থাৎ "উম্মতের উৎকৃষ্টতম ব্যক্তিগণ ইহার প্রথম যুগ এবং শেষ যুগেই হইবেন। প্রথম ব্যক্তিগণের মধ্যে আল্লাহ্র রসূল (সঃ) আছেন এবং পরবর্ত্তীগণের মধ্যে থাকিবেন ঈসা ইবনে মরিয়ম। ইহাদের উভয়ের মধ্যভাগে কুটিল ব্যক্তিরা থাকিবে। আমিও তাহাদের নই, তাহারাও আমার নয়।"

সুতরাং, শেষ যুগে যে মাহ্দীর আগমনের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তিনি মসীহ্ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবার হইলে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া

সাল্লাম মসীহ্ এবং মাহ্দী উভয়েরই সম্বন্ধে বলিতেন যে, তাঁহারা উভয়েই শেষ যুগে আবির্ভূত হইয়া উম্মতের তত্ত্বাবধান করিবেন। কিন্তু এরূপ বলা হয় নাই, বরং শুধু মসীহ্র উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মসীহ্ এবং মাহ্দী উভয়ে একই। এই জন্য শুধু "মসীহ্র" কথাই বলা হইয়াছে। বলা হয়, মাহ্দী 'ইমাম' হইবেন এবং মসীহ্ তাঁহার অনুবর্ত্তিতা করিবেন। ভাবা আবশ্যক, ইহা সত্য হইয়া থাকিলে উম্মতের হেফাযতের ব্যাপারে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের পক্ষে অনুবর্ত্তীর উল্লেখ করা এবং ইমামের কোনই উল্লেখ না করা কি ঘোর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? তারপর, আরো দেখা যায়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম শুধু দুইটি সম্প্রদায়কে "হেদায়াত প্রাপ্ত" এবং "উত্তম" বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। *তন্মধ্যে এক সম্প্রদায় হইলেন তাঁহারা যাঁহারা স্বয়ং তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং অন্য সম্প্রদায়টি হইল প্রতিশ্রুত মসীহ্র অনুবর্ত্তীগণের। কিন্তু মাহ্দীর অনুবর্ত্তীদের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই, বরং পরিষ্কার বলা হইয়াছে যে, এই সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যভাগে ফায়জে-আ'ওয়াজ বা কুটিল ব্যক্তিরা থাকিবে। সুতরাং, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মাহ্দী মসীহ্ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি নহেন; বরং মসীহ্ই মাহ্দী, শুধু দুই প্রকার কার্য্যকারিতার দিক হইতে একই ব্যক্তিকে দুইটি উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

তারপর, ইহা অপেক্ষাও বড় প্রমাণ এই যে, হাদীসসমূহে যে সকল কাজ মসীহ্ মাওউদ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, প্রায় ঐসবই ইমাম মাহ্দীর জন্যও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতেও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ ও মাহ্দী একই ব্যক্তি। এতদ্ব্যতীত, মাহ্দী ও মসীহ্র একইরূপ হুলিয়া হাদীসসমূহে

বর্ণিত হইয়াছে (ইমাম আহ্মদ হাম্বল প্রণীত 'মুসনদ') সুতরাং, ইঁহারা কীরূপে দুইজন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন? তারপর, হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন যথার্থ ('বর্হক') খলীফা বিদ্যমান থাকিতে ঐ সময়ে অন্য কেহ খেলাফতের দাবী করিলে, তাহাকে নিধন করিতে হইবে। অর্থাৎ, যুদ্ধাবস্থায় তাহার মোকাবিলা দ্বারা তাহাকে বধ করিতে হইবে। নতুবা, মৃত-তুল্য ভাবিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন

এই দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই কোরআন শরীফে সূরাহ্ জুমুআয় ইশারা বিদ্যমান। সেখানে খোদা তাআলা বলেনঃ-

"আল্লাহ্তা'আলাই আবির্ভূত করিয়াছেন আরবদের মধ্যে একজন রসূল তাহাদেরই মধ্য হইতে, তিনি তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতগুলি পাঠ করিতেছেন, তাহাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, এবং তাহাদিগকে কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দিতেছেন, যদিও ইতঃপূর্ব্বে তাহারা খোলাখুলিভাবে পথভ্রষ্টতায় নিপতিত ছিল, এবং পরে অগমনকারী আরো এক জাতি আছে, তাহাদেরও এই রসূল (একজন 'বরুয' বা প্রতিবিম্বের সাহায্যে তদ্রূপ) আধ্যাত্মিক শিক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিবেন।"

করিবে। সুতরাং, এই শিক্ষা বিদ্যমান থাকিতেও একই সময়ে দুইজন খলীফার অস্তিত্ব কীরূপে স্বীকার করা যায়? ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এক সময়ে একজন মাত্র ইমামই হইয়া থাকেন। সুতরাং ইহাতেও এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ ও মাহ্দী দুইজন পৃথক ব্যক্তি হইবেন না। শব্দদ্বয় একই ব্যক্তির দুইটি নাম বটে। শেষ যুগে ঐ পুরুষ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের খলীফা হইবেন। এই পর্যন্ত আমরা যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়াছি। এখন আমরা একটি হাদীস পেশ করিতেছি ইবনে মাজা, বাব শিদ্দাতুয-যমান হইতে। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, মসীহ্ ও মাহদী একই ব্যক্তি হইবেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ "লা মাহ্দী ইল্লা ঈসা" অর্থাৎ হযরত ঈসা ব্যতীত অন্য কোন ইমাম মাহ্দী (প্রতিশ্রুত) নহেন।" দেখুন, কেমন পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম মীমাংসা করিয়াছেন যে, মসীহ্ এবং মাহ্দী দুইজন পৃথক ব্যক্তি নহেন, বরং মসীহ্ মাওউদ ব্যতীত অন্য কোন মাহদীর অঙ্গীকার প্রদত্ত হয় নাই। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের প্রতি যাহার ঈমান আছে, সে তো তাঁহার এই বাণীর নিকট মস্তক অবনত করিবে। কিন্তু যাহার মনে কুটিলতা আছে, সে শত বাহানার অবতারণা করিবে। আমাদের তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমরা শুধু তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিতেছি, যাঁহারা আধ্যাত্মিক শিক্ষাগারে এইটুকু শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের নিকট মস্তক অবনত করাতেই সাআদাত বা পরমার্থ লাভ নিহিত।

তারপর, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের আরো একটি হাদীস আছে। উহা পরিষ্কার ভাষায় মসীহ্ মাওউদকেই ইমাম মাহ্দী বলিয়া নির্ধারণ করে। তিনি ফরমাইয়াছেনঃ– *"ইয়ূশেকু মান্ আ'শা ফিকুম আঁই-ইয়ালকা ঈসা ইব্না মরয়্যামা ইমামান্ মাহ্দীয়ান্ ও হাকামান্ আদ্লান্ ফাইয়াক্সেরুস সালিবা ও ইয়াক্তুলুল্-খিনজিরা"* (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল) অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে, তাহারা ঈসা ইব্নে মরিয়মকে পাইবে। তিনি ইমাম মাহ্দী হইবেন। বিচারক ও মীমাংসাকারী হইবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন এবং শূকর বধ করিবেন।" দেখুন এই হাদীসে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম কেমন পরিষ্কার ভাষায় বলিতেছেন যে, হযরত ঈসাই ইমাম মাহদী হইবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের এরশাদ – তাঁর পুণ্যময় উক্তির উপর ঈমান আনিবার ফলে আজ আমাদিগকে কাফের ও মুরতাদ বলা হয় এবং তাঁহার আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করা হয়। আফসোস! শত আফসোস!!

উপরে বর্ণিত যুক্তি ও প্রমাণসমূহ দ্বারা উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, মসীহ্ ও মাহ্দী একই ব্যক্তি। কিন্তু এখন একটি প্রশ্নের উদয় হয়। যখন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম পরিষ্কার ভাষায় ফরমাইয়াছেন যে,

প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদী একই ব্যক্তি, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন নহেন, তদবস্থায় মোসলমানেরা কীরূপে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন যে, মসীহ্ এবং মাহদী দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি? ইহার উত্তর এই, সাধারণ মোসলমানগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, মসীহ্ নাসেরীকে আকাশে জীবিতাবস্থায় উঠান হইয়াছে এবং শেষ যুগে তিনিই আবার পৃথিবীতে নাযেল হইবেন। আর মাহদী সম্বন্ধে তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তিনি উম্মতে মোহাম্মদীয়াতেই জন্মগ্রহণ করিবেন। যে পর্য্যন্ত মোসলমানগণ এই বিশ্বাস পোষণ করিতে থাকিবেন যে, মসীহ্ নাসেরী আসমান হইতে অবতীর্ণ হইবেন, সে পর্যন্ত তাঁহারা মসীহ্ এবং মাহদীকে একই ব্যক্তি বলিয়া চিন্তা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অবশ্য, যদি তাঁহারা মসীহ্ সম্বন্ধে সহীহ্ আকিদার উপর কায়েম হন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মসীহ্ নাসেরীকে মৃত বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অতি সহজে মসীহ্ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদীকে একই ব্যক্তি বলিয়া মান্য করিতে পারেন। কিন্তু যিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন, আর যিনি আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন, ইঁহারা দুইজন একই ব্যক্তি- ইহা তাঁহারা কখনো স্বীকার করিতে পারেন না। একই ব্যক্তির দুইটি নাম দেওয়ার তত্ত্ব আমরা উপরে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। সংক্ষেপে ব্যাপার এই। আগমনকারী বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া আসিবার কথা। তন্মধ্যে ক্রুশের ধ্বংস সাধন ও উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ইস্‌লাহ্ এই দুইটিই প্রধানতম উদ্দেশ্য। সুতরাং ক্রুশ-ধ্বংসকারী হওয়ার দিক হইতে তিনি ঈসা মসীহ্ নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীর সংস্কারক হিসাবে ইমাম মাহদী নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন যে, মসীহ্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে মাহদী পৃথিবীতে মজুদ থাকিবেন, 'মাহদী ইমামত করিবেন এবং মসীহ্ তাঁহার অনুগমন করিবেন' ইত্যাদি যে সকল কথা বিবিধ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে তদ্দারা ইহাই প্রকাশ পায় যে, মসীহ্ এবং মাহদী দুইজন পৃথক ব্যক্তি হইবেন। কিন্তু এই প্রকার যুক্তিও ঠিক নয়। কারণ, শক্তিশালী প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে, প্রতিশ্রুতি মসীহ্‌র জামানায় অপর কোন মাহদী হইতে পারেন না। সুতরাং, উল্লিখিত কথাগুলি উহাদের জাহেরী অর্থে কখনো গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং, অবশ্যই উহাদের এমন কোন অর্থ করিতে হইবে, যাহা অন্যান্য সহীহ্ হাদীসসমূহের বিরোধী না হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাত করিলে কোনই জটিলতা দেখা যায় না। মাহ্‌দীয়তের মকাম হইতে প্রতিশ্রুত আগমনকারী হইলেন আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের 'মসীল ও বরুয' – তাঁহার প্রতীক ও প্রতিচ্ছায়া। এবং, মসিহীয়তের মকাম হইতে তিনি মসীহ্ ইব্‌নে মরিয়মের 'মসীল ও বরুয'। তজ্জন্য ইহাতে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না যে, প্রতিশ্রুত ব্যক্তির 'মাহ্‌দোবিয়ত' (মাহ্‌দী হওয়া) তাঁহার মসীহীয়তের (মসীহ্ হওয়ার) উপর প্রবল। সুতরাং এই কথাই রূপকভাবে বলা হইয়াছে, মাহদী ইমাম হইবেন এবং মসীহ্ তাঁহার অনুবর্ত্তিতা করিবেন। অর্থাৎ, আগমনকারী 'মাওউদ' বা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের মাহদীয়তের মকাম তাঁহার মসীহীয়ত মকামের অনুগমন করিবে এবং

তাঁহার মসীহীয়ত গুণ তাঁহার মাহ্দোবিয়ত গুণের অনুগমন করিবে। মাহদী পূর্ব হইতে মজুদ থাকিবার দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায় যে, এই প্রতিশ্রুত সংস্কারক-এই 'মাওউদ মোস্লেহ্' প্রথমতঃ তাঁহার মাহদী হওয়ার দিক হইতে জাহের হইবেন এবং মসীহ্ হওয়ার দাবী তিনি পরে করিবেন। ফলে, ঐশী-হস্তক্ষেপের দ্বারা পরিচালিত হইয়া হযরত মির্যা সাহেব প্রথমে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মহামহিমান্বিত মোজাদ্দেদ হইবেন। ইহার কতিপয় বৎসর পরে তিনি মসীহ্ হওয়ার দাবী করেন। যাহার চক্ষু আছে, দেখিতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে প্রথমতঃ এই কথা প্রমাণিত হয় যে, মাহদী সংক্রান্ত রেওয়ায়াতগুলির পারস্পরিক ঐক্যের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা ইহাই প্রকাশ করে যে, হয়ত আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন মাহ্দীর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন– যাহা দুর্ভাগ্যক্রমে একই ব্যক্তি সম্বন্ধে করা হইয়াছিল বলিয়া ভুল করা হইয়াছে, কিম্বা এ সম্পর্কিত কোন কোন হাদীস কৃত্রিম ও ভ্রান্ত। বস্তুতঃ, এই উভয় কথাই স্ব স্ব স্থানে ঠিক। তারপর, একথাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, মসীহ্ মাওউদের জামানায় স্বতন্ত্র কোন মাহ্দী হইবেন না, বরং মসীহ্ এবং মাহ্দী সংক্রান্ত ওয়াদা একই ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণ হইবে। অতঃপর, মাহদী সম্বন্ধে শুধু একটি কথা অমীমাংসিত থাকে। যদিও আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার কোনই সম্বন্ধ নাই, তথাপি প্রতিশ্রুত মসীহ্ পরিচয় প্রাপ্তির পথে যেহেতু ইহা একটি ভীষণ বিঘ্ন এবং ইহা দূরীভূত হইলে মাহদীর সম্পর্কে অপর কোন বিতর্ক বাকী থাকে না। কাজেই মাহদী সংক্রান্ত এই সংক্ষিপ্ত গবেষণাটিকে এখানে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গীণ করিবার মানসে এই সন্দেহটিরও উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। বিষয় খুনি মাহদী সম্বন্ধে। প্রশ্ন, **প্রতিশ্রুত মাহদী কি তরবারীসহ আবির্ভূত হইয়া কাফেরদিগকে নিধন করিবেন?** না, তিনি শান্তির উপায়ে জাহের হইবেন এবং লৌহ তরবারীর দ্বারা নহে, বরং যুক্তির তরবারীর সাহায্যে ইস্লামের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন? আমাদের জামানায় মোসলমান বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণের সাধারণ ধারণা, মাহ্দী কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারী-যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন। এমন কি, তিনি জিযিয়া পর্যন্ত কবুল করিবেন না। হয়ত কাফেরগণের মোসলমান হইতেই হইবে, নতুবা তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে। কিন্তু আমাদের মতে ইহা সম্পূর্ণ অলীক ধারণা। ইহা ইস্লামকে বদনাম করে মাত্র।

এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার নিমিত্ত সর্বাগ্রে কোরআন শরীফের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত করা অত্যাবশ্যক। আমাদের দেখা কর্তব্য, কোরআন শরীফ ধর্মীয় ব্যাপারে তরবারী ব্যবহারের অনুমতি দেয় কি না? অর্থাৎ, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে বলপূর্বক কাহাকেও মোসলমান করা যায় কি? যদি বলপূর্বক মোসলমান করিবার অনুমতি ইস্লাম আমাদিগকে দেয়, তবে অবশ্য আমাদের ভাবিতে হইবে যে, মাহদী কি ইসলামের জন্য তরবারী চালনা করিবেন? না, তিনি শান্তির সহিত কর্তব্য পরিচালনা করিবেন? কিন্তু, ইস্লামের শিক্ষা আমাদিগকে যদি পরিষ্কার বলিয়া যে, ধর্মের ব্যাপারে

বল প্রয়োগ এবং তরবারীর সাহায্যে লোকদিগকে ইস্‌লামে দাখিল করা জায়েয নহে, তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গেই খুনি মাহদীর সমস্যারও মূলোৎপাটন হইবে। কারণ, জবরদস্তি করা আদৌ বৈধ না হইলে বল প্রয়োগে লোকদিগকে ইসলামে দাখিল করিবেন, এইরূপ কোন ধর্ম-সংস্কারক কীরূপে আসিতে পারেন? কোরআন শরীফের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহাতে পরিষ্কার দেখিতে পাই *"লা ইক্‌রাহা ফিদ-দীনে কাদ্ তাবাইয়ানার রুশ্‌দু মিনাল্ গাইয়ে।"* অর্থাৎ "ধর্মের ব্যাপারে কোনই উৎপীড়ন নাই। কারণ সৎ-পথ বিপথগামিতা হইতে প্রকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে (সূরাহ্ বাকারাহ, ৩৪ রুকূ)। এই আয়াতে আল্লাহ্‌তাআলা পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, দীনের ব্যাপারে জবর করা জয়েয নয়। কোরআন শরীফ প্রত্যেক দাবীর সঙ্গে যুক্তিও দেয়। এই কারণে সহজেই বলা হইয়াছে যে, উৎপীড়ন বৈধ না হইবার কারণ 'হেদায়াত' ও 'জালালত'–সৎপথ ও বিপথগামিতা উভয়ের মধ্যেই প্রভেদ সুস্পষ্ট। ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করিলে প্রতেকেই 'হেদায়াতের' দর্শন লাভ করিতে পারে। দেখুন, কোরআন শরীফ কেমন সহজ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি দিয়াছে। ইহা প্রত্যেকে বুঝিতে পারে। আসল কথা, কোন শিক্ষায় দুর্বলতা থাকিলে পীড়নের প্রয়োজন হয়। কারণ ইহা আপন সৌন্দর্যের বলে লোকের মনে অধিকার স্থাপন করিতে পারে না। কিন্তু কোরআন শরীফ তো সুব্‌হানাল্লাহ, এরূপ সাফ ও পরিষ্কার যে, সামান্য চিন্তা করিলেই মানুষ সত্যের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হয়। এই জন্য ইহার বশীভূত করিবার জন্য বল প্রয়োগ কোনোক্রমেই যথার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। খুবই চিন্তা করুন, তরবারীর বলে লোকদিগকে ইস্‌লামে প্রবিষ্ট করার অর্থ, আমরা স্পষ্টতঃ স্বীকার করি যে, ইসলাম (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা; বা ইসলাম আপন সত্যতার আকর্ষণের দ্বারা আপনাপনি লোকদিগকে ইহার বশবর্তী করিতে পারে, এরূপ ধর্ম নয়। তবেই তো বল প্রয়োগের প্রয়োজন।

তারপর, ইহাও দেখিতে হইবে যে, বল প্রয়োগ করা যায় শুধু মানুষের দেহের উপর। ইহা দ্বারা মানব-আত্মা বা চিন্তা-ধারার উপর কর্তৃত্ব লাভ হয় না। কিন্তু ধর্মের সম্বন্ধ মানুষের চিন্তা-ধারার সহিত। যদিও কর্মও ইহারই অন্তর্গত, কিন্তু কর্ম আন্তরিক প্রেরণা দ্বারা হওয়া আবশ্যক। নতুবা, কোন বাহিরের প্রতিক্রিয়ার ফলে কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে এবং মনের সহিত মিল না হইলে তদ্রূপ কর্ম কখনো ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে। এইরূপ কর্মের ধর্মের সহিত কোনই সম্পর্ক নাই। খোদার সম্মুখে প্রণিপাত করা– তাঁহার নিকট সেজ্‌দা একটি সাধু ক্রিয়া। কিন্তু কোন ব্যক্তি বাজারের মধ্যে চলিতে চলিতে হোঁচট খাইয়া ভূমিতে প্রণত অবস্থায় পতিত হইলে, যদিও ইহা বাহ্যিকভাবে সেজদার মতই দেখায়, তবু ধর্মের পরিভাষায় এ ব্যক্তি খোদার নিকট 'সেজদা' করিতেছে বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কারণ, এই সেজদার সহিত মন হইতে কোন প্রেরণা বা অভ্যন্তরীণ কোনো সঙ্কল্প নাই। অবস্থাটি বাহিরের ক্রিয়া বিশেষের একটি প্রতিক্রিয়া মাত্র। সুতরাং বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদির শুধু তাহাই ধর্মের অঙ্গীভূত, যাহাতে আন্তরিক আগ্রহ ও সঙ্কল্প

থাকে। এই কারণেই সারওয়ারে-কায়েনাত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ- *"ইন্নামাল আ'মালু বিন নিয়্যত"* ('বুখারী,' প্রথম হাদীস) অর্থাৎ, "সঙ্কল্প সমন্বিত কর্মই কর্ম।" 'নিয়্যত' না থাকিলে কোন আমলই 'আমল ' নয়। সুতরাং, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জবর মুলে ইস্‌লাম বা অন্য ধর্মে প্রবিষ্ট করানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, ধর্ম অর্থে আন্তরিক সমর্থন এবং মৌখিক স্বীকৃতি- জ্ঞাপক আচরণ ও জীবন ধারণ বুঝায়। বল প্রয়োগের ফলে ইহাদের একটাও সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং, ইহাই জানা যায় যে, জবর মূলে কোনো ব্যক্তিকে কোনো ধর্মে আনয়ন সম্পূর্ণ জ্ঞানের বহির্ভূত কথা এবং একান্তই অসম্ভব। এইজন্য খোদাওন্দ করীম বলেন ঃ *"ইন্নামা আলা রাসূলেনাল্-বালাগুল্ মুবীন"* (সূরাহ্ মায়েদাহ্,' রুকূ ২)। অর্থাৎ, "লোকের নিকট আমার বাণী শুধু পৌঁছাইয়া দেওয়াই আমার রসূলের কর্তব্য" মানা, বা না মানা, ইহা প্রত্যেকের আপন দায়িত্ব। উহার সহিত রসূলের কোনোই সম্পর্ক নাই। উৎকৃষ্টতম উপায়ে স্বীয় ' রেসালত'- রসূলের রসূল হওয়ার বিষয় পৌঁছানোই মাত্র রসূলের কাজ।

আরো একটি যুক্তি দ্বারা বল প্রয়োগের ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া নির্ণীত হয়। কপটতা ইসলাম অনুসারে অতীব ঘৃণিত বস্তু। মোনাফেকের সাজা কাফেরের সাজা হইতেও কঠোর। কোরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ- *"ইন্নাল-মুনাফেকিনা ফিদ্-দারকিল্ আস্‌ফালে মিনান্ নার"* ('সূরাহ নেসা,' রুকূ ২১) অর্থাৎ, "জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে মোনাফেকেরা থাকিবে।" প্রকৃত কথা, 'বাধ্য-বাধকতা ও বলপ্রয়োগের ফলে মোনাফেকের সৃষ্টি হয়, মোমেন পয়দা হয় না। সুতরাং, ইস্‌লাম বল প্রয়োগের অনুমতি কীরূপে দিতে পারে?

এখন, একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। কোরআন শরীফ স্পষ্ট ভাষায় তরবারীর সাহায্যে মানুষকে ইসলামে প্রবিষ্ট করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম তরবারী ব্যবহার করিয়াছিলেন কেন? এই প্রশ্নটি স্বভাবতঃ এখানে মনে উদয় হয়। আর প্রকৃত উত্তর পাওয়ার জন্য কোরআন শরীফের যে আয়াতে মোসলমানদিগকে তরবারী ব্যবহারের সর্বপ্রথম অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল, উহার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। খোদাতা'আলা বলেন ঃ- *"উযেনা লিল্-লাযিনা ইয়ুকাতালুনা বে-আন্নাহুম্ যুলেমু ও ইন্নাল্লাহা আলা নাস্‌রেহিম লা-কাদির। আল্লাযিনা উখ্‌রেজু মিন্ দিয়ারেহিম বেগায়রে হাক্‌কিন ইল্লা আঁইয়াকুলু রাব্বুনাল্লাহ; ওয়া লাওলা দাফ্‌উল্লাহেন্‌নাসা বা 'যাহুম্ বেবাযিন্' লা-হুদ্দেমাত সাওয়ামেউ ও বেয়াউও ওয়া সালাওয়াতৌ ও মাসাজেদু ইয়ুয্‌কারু ফিহাস্‌মুল্লাহে কাসিরা"* ('সূরাহ হজ্জ', রুকূ ৬)- "তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ঐ সকল কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার, যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। কেননা, তাহারা অত্যাচারিত হইয়াছে। অবশ্য, আল্লাহ্ তাহাদের সাহায্য করিতে সক্ষম, যাহারা তাহাদের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে অকারণে- শুধু এই বলার দরুন যে, তাহারা বলিয়াছিল, 'আমাদের প্রভু

আল্লাহ্'। যদি আল্লাহতা'আলা মানুষকে একের হস্ত হইতে অন্যকে রোধ না করেন, তবে ইহুদীদের উপসানা-মন্দির, খৃষ্টানদের গীর্জা এবং যে কোন উপাসনালয় ও মসজিদ, যেখানে খোদাতা'আলার নাম বহু বহু স্মরণ করা হয়, সকলই পরস্পরের হস্তে বিধ্বস্ত হইবে।" এই আয়াতে সর্বপ্রথমে মোসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হয়। এখন দেখুন, আয়াতটিতে কেমন পরিষ্কার কথায় যুদ্ধ করিবার কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। ফেৎনা দূরীভূত হইয়া ধর্মের স্বাধীনতা স্থাপনই যুদ্ধের অনুমতি দানের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পরিষ্কার বলা হইয়াছে, মোসলমানেরা প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। কাফেরগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে এবং নানাভাবে তাঁহারা উৎপীড়িত হইতে থাকিলে এবং গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর ঐ সকল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য আল্লাহতা'আলা তাঁহাদিগকে অনুমতি দেন। তের বৎসর পর্যন্ত মোসলমানগণ সকল উৎপীড়ন সহ্য করেন এবং যত অত্যাচার আছে, মহাধৈর্যাবলম্বনপূর্বক তাঁহারা সহ্য করিতে থাকেন। পরিশেষে কাফেরদের নানা প্রকার ধৃষ্টতা ও অত্যাচার হইতে রক্ষা লাভের জন্য মক্কা ছাড়িয়া মদিনায় তাঁহাদের হিজরত করিতে হয়। তবু, কাফেরগণ মোসলমানদিগকে কষ্ট দেওয়া ছাড়ে নাই। তাহারা মদিনার উপর চড়াই করিয়া বসে। তখন সম্পূর্ণরূপে অনন্যোপায় হইয়া মোসলমানদেরও অস্ত্র ধারণ করিতে হয়। সুতরাং ইহা একটা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা যে, মোসলমানগণ বলপূর্বক লোকদিগকে মোসলমান করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহার করেন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁহারা যে কষ্ট-উৎপীড়ন সহ্য করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে উহার তুলনা নাই। তাঁহাদের প্রতি বল প্রয়োগ আরোপের চেয়ে বড় অত্যাচার আর কি হইতে পারে?

ইসলামের প্রাথমিক সময়ে মোসলমানগণ যাহা করিয়াছেন, তাহা অন্যায়ের প্রতিরোধ মাত্র ছিল। তাঁহারা শুধু ধর্মের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যুত্তরস্বরূপ অস্ত্র ধারণ করেন, যাহাতে মানুষ হৃদয় দিয়া যে ধর্ম পসন্দ করে, খোলাখুলিভাবে তাহা গ্রহণ করিতে পারে। অবশ্য, উত্তরকালে প্রাথমিক যুদ্ধগুলোর ফলে একটি মোসলেম রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর কোন কোন সময় মোসলামানদিগকে রাজনৈতিক কারণেও যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, কিংবা কোনো কোনো সময় ধর্ম-স্বাধীনতা না থাকায় ইস্‌লাম প্রচারের পথ খোলার জন্যও কোন দেশের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অস্ত্র ধারণ করিতে হয়। কিন্তু তাঁহারা কখনো বলপূর্বক কাহাকেও মোসলমান করেন নাই। সুতরাং, ইহা কি আশ্চর্য্যের কথা নয় যে, মাহ্‌দীর আগমনের প্রধানতম উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতেছে যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে বলপূর্বক মোসলমান করিবেন! এরূপ মাহ্‌দীর আগমন কি ইসলামের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে? না, কখনো না। যুক্তির বলে যাবতীয় ধর্মাবলীর উপর ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করা, ইসলামের সৌন্দর্য্যাবলী লোকের সম্মুখে ধরা এবং ইহা প্রতিপাদন করা যে, ইসলামই এক-মাত্র জীবিত ও প্রাণবন্ত ধর্ম, যাহার সত্যতার এতগুলো প্রমাণ রহিয়াছে যে, খোদার ভয় মনে রাখিয়া কেহ ইহার প্রতি মনোনিবেশ করিলে মানুষ ইহার সত্যতা উপলব্ধি না করিয়াই পারে না– ইহাই তো গৌরবের কথা।

উপরোল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে সূর্য্যালোক হইতেও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে যে, ইসলামী শিক্ষা মতে কখনো এমন কোন মাহদী আসিতে পারেন না, যিনি আসিবা মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন এবং লোকদিগকে বলপূর্বক মোসলমান করিবেন। চিন্তার কথা, মাহদী কি ইসলামের শিক্ষার অনুসরণ করিবেন না? তাঁহার সময়ে কি ইসলামের শরীয়ত রহিত হইয়া যাইবে? যখন ইহা কখনো নয় এবং মাহদী সেবক হিসাবে, ইসলামের খাদেম স্বরূপই আবির্ভূত হইবার কথা এবং যখন ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জুলুম নাই, তখন ইসলামের এই প্রকৃষ্ট শিক্ষা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি কীরূপে কাফেরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন? ইহা করিলে তিনি নিশ্চয়ই সংস্কারক ('মোস্‌লেহ্‌') না হইয়া ইস্‌লামের শিক্ষায় বিকৃতি সাধন করিবেন। ফাসাদ দূরীভূত না করিয়া তিনিই ফাসাদ উৎপন্ন করিবেন।

তারপর, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক যে, যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা ইহাই নির্ণীত হয় যে, মসীহ্‌ এবং মাহ্‌দী একই ব্যক্তির দুইটি উপাধি। ইত্যাবস্থায় মাহদী কীরূপে অস্ত্র ধারণ করিতে পারেন? কারণ, মসীহ্‌ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যুদ্ধ বন্ধ করিবেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ– *"ওয়া ল্লাযি নাফসি বে ইয়াদেহি লাইউশেকান্না আঁইয়্যান্‌যেলা ফিকুম্‌ ইবনু মারয়্যামা হাকামান আদলান্‌, ফাইয়াক্‌সেরুস্‌ সালীবা ওয়া ইয়াকতুল্মল খেন্‌যিরা ওয়া ইয়াযাউল্‌ হার্‌বা"* ('বুখারী' বাব নযুলু ঈসা-ইবনে মরিয়ম; 'ফৎহুল্‌-বারী' ৬ষ্ঠ খণ্ড)। অর্থাৎ, "আমি সেই সত্তার কসমপূর্বক বলিতেছি যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, ঐ সময় আসিতেছে, যখন তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারীরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ স্থগিত করিবেন।" দেখুন, এই হাদীস কেমন দ্বার্থহীন ভাষায় স্পষ্টতঃ বলিতেছে যে, বলপূর্বক মোসলমান করা তো দূরের কথা, মাহ্‌দী প্রচলিত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করিবেন। কিন্তু আমাদের মোসলমান ভ্রাতাগণ তবু কোরআন শরীফের শিক্ষার বিরুদ্ধে গাজী, যুযুৎসু মাহ্‌দীর উদ্দেশ্যে পথের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন!

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, কোনো গাজী বা রক্ত-পিপাসু মাহ্‌দী আসিবেন না; বরং, কেহ আসিলে তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ করিবেন।

কিন্তু এখানে একটি সন্দেহের উৎপত্তি হয়। ইসলাম ধর্ম জোর-যুলুমের শিক্ষা দেয় না। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধপ্রিয়, খুনি মাহদীর সংবাদ দেন নাই। তবু, মোসলমানদের মধ্যে এই ধারণার উৎপত্তি কীরূপে হইল? ইহার উত্তর এই। দুর্ভাগ্যবশতঃ জনসাধারণের অনুসৃত চিরাচরিত এই প্রথাই চলিয়া আসিতেছে যে, তাহারা ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বাহ্যিক শব্দগুলোকে আঁটিয়া ধরে, এবং উহাদের অভ্যন্তরীণ ও প্রকৃত দিক তাহাদের চক্ষু হইতে উহ্য থাকে। পাঠক-পাঠিকার অবিদিত নয় যে, বনী ইস্রাঈলের সহিত ওয়াদা করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে

মসীহ্ আসিলে তিনি এক বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী প্রতাপান্বিত ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন করিবেন। কিন্তু যখন মসীহ্ নাসেরী (আঃ) 'মসীহ্' হইবার দাবী করিলেন, তখন ইহুদীগণ দেখিতে পাইল, তিনি একজন দুর্বল বন্ধু-বান্ধবহীন নিঃসহায় ব্যক্তি! তিনি কোন রাষ্ট্রের পত্তন করেন নাই। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে রোমক রাষ্ট্রের অধীনে তাঁহার 'রেসালত' (আগমন-বার্তা) প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহুদীদের নৈরাশ্যের বিষয় একটু লক্ষ্য করুন। তাহারা এমন এক ব্যক্তির অপেক্ষা করিতেছিল, যিনি তাহাদিগকে রাষ্ট্রের অধিপতি করিবেন এবং বিরাট ঐশ্বর্য্যে ভরা ইহুদী রাষ্ট্রের পত্তন করিবেন। কিন্তু মসীহ্ আসিয়া করিলেন কি? তাঁহারই কথায় শ্রবণ করুনঃ–

"শৃগালদের গর্ত আছে, এবং আকাশের পক্ষিগণের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্য-পুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই" (যোহন, ৮ঃ২০)।

এই প্রকারেই মোসলমান একজন গাজী মাহ্‌দীর অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি আসিয়া কাফেরদিগকে 'কতল' করিবেন, এবং একটি বিরাট মোসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু যেমন বনী-ইস্রাইলের যাবতীয় আশা ভরসাই জলবৎ ভাসিয়া গিয়াছিল, ইহাদের বেলায়ও তাহাই হওয়ার ছিল। কারণ, খোদা ও রসূলের ওয়াদার বিরুদ্ধে আশা পোষণে কোন ব্যক্তিরই মনষ্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না। আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রের অবশ্যই ভিত্তি পত্তন হইয়াছে। হযরত মসীহ্ নাসেরীর জাতির ন্যায়, ইন্‌শাআল্লাহ্, যথাসময়ে ইহার উন্নতি ষোল-কলায় ফুটিয়া উঠিবে।

প্রকৃতপক্ষে, আগমনকারী সংস্কারকের আধ্যাত্মিক উত্থান, তাঁহার উন্নতি ও লোকদের বিরুদ্ধবাদিতার সম্পূর্ণ চিত্র তাহাদের সম্মুখে ধরিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন সময় সামরিক পরিভাষা রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লোকেরা অজ্ঞানতার আঁধারে এইসব বাহ্যিক অর্থ আঁকড়াইয়া ধরে, এবং তদনুযায়ী দাবীকারককে ওজন করিতে চাহে। আরো অন্ধ হইয়া পড়ে, যখন পার্থিব রাজ্যাধিপতির অভ্যুত্থানের মধ্যে তাহাদের লাভালাভ গণনা করিতে থাকে। তারা ভাবে একজন শান্তিপূর্ণ উপায়ে কর্মি সাধনকার মোস্‌লেহ্ (ধর্ম-সংস্কারক) কী করিতে পারেন? তিনি তো তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করিতে পারেন না, রাজনৈতিক দিক হইতেও তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করেন না। কিন্তু একজন যোদ্ধা-নবী অতি সহজে তাহাদের খালি বাক্সগুলি পূর্ণ করিতে পারেন এবং তাহাদিগকে রাষ্ট্রপতিও করিতে পারেন। এইজন্য এহেন সবুজ বাগান হইতে বাহিরে আসিয়া কন্টকাকীর্ণ পথে চলিবার তাহাদের প্রয়োজন কি? কিন্তু তাহারা এইটুকু ভাবে না যে, খোদাতা'আলার নিকট হইতে আগমনকারী মোসলেহের প্রকৃত সংস্কার কার্য্যই হইল 'রূহানী ইস্‌লাহ্'– আধ্যাত্মিক সংশোধন। সুতরাং যদি তিনি আসিয়াই তরবারী ধরেন, তবে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়। সুতরাং প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী সংক্রান্ত কোন কোন হাদীসে যে সকল সামরিক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বারা ইহা প্রকাশ পায় না যে, মাহ্‌দী একজন পার্থিব সৈন্যাধ্যক্ষরূপে জাহির হইবেন।

ঐ সকল হাদীস হইতে শুধু এই পর্যন্তই জানা যায় যে, মাহদীর আবির্ভাব অলৌকিক নিদর্শনাবলীতে পরিপূর্ণ হইবে এবং তিনি ইস্‌লামের সত্যতার এরূপ অকাট্য প্রমাণরাশিসহ আগমন করিবেন যে, তাহাতে বিরুদ্ধবাদীগণের মৃত্যু ঘোষিত হইবে। ইহা ছাড়া উহাদের আর কোন অর্থ নাই। যদি চাও, গ্রহণ কর।

হযরত মির্যা সাহেবের দাবী জনসাধারণের বুঝিবার পথে বিভ্রান্তিকর দুইটি প্রধান ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিতে আমরা এখন সমর্থ হইলাম। অর্থাৎ, বাফয্‌লেহী-তা'আলা আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, হযরত মসীহ্ নাসেরী (আঃ) সশরীরে জীবিতাবস্থায় আকাশে গমন করেন নাই– তিনি এ পৃথিবীতেই ছিলেন এবং এ পৃথিবীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়; এবং যে মসীহ্‌র আগমনের ওয়াদা প্রদত্ত হইয়াছে, তিনি এই সম্মানিত উম্মতের মধ্য হইতেই হইবেন। অর্থাৎ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের খাদেমগণের মধ্যেকার তিনি একজন খাদেম মাত্র হইবেন। তিনি বাহিরের কোনো ব্যক্তি নহেন। তারপর, আমরা ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছি যে, মসীহ্ মাওউদের জমানায় কোনো স্বতন্ত্র মাহদী হইবেন না। মসীহ্ এবং মাহদী একই ব্যক্তি। বিভিন্ন দুইটি পদ-মর্যাদার দিক হইতে দুইটি ভিন্ন নামে অভিহিত হইবেন মাত্র। এতদ্ব্যতীত, আমরা ইহাও প্রমাণ করিয়াছি যে, ইমাম মাহদী আসিয়া কাফেরদের বিরুদ্ধে তরবারী-যুদ্ধ করিবেন এবং অকারণ পৃথিবীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিবেন, এই ধারণাও ভ্রমাত্মক। সত্য কথা এই যে, তাঁহার তরবারী যুক্তি-প্রমাণের তরবারী। তাঁহার অস্ত্রাবলী আধ্যাত্মিক। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ করিবেন এবং যুক্তিবলে ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন। এই সমস্যাগুলি সমাধানের পর এখন আমরা মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। ইহা হইল হযরত মির্যা সাহেব প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী হইবার যে দাবী করিয়াছেন, তাহা কতটুকু সত্য আমরা এখন বিচার করিব। "সৃষ্টির নিয়ন্তা আল্লাহ্‌তা'আলার প্রদত্ত সামর্থ্য ব্যতীত কোনোই সামর্থ্য আমাদের নাই।"

মসীহ্ ও মাহ্‌দীর 'আলামত'সমূহ

প্রথমে আমরা 'আলামতের' পরীক্ষা করিতেছি। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদীস হইতে মসীহ্

মাওউদ ও মাহদী মাহুদ সম্বন্ধে যে সকল আলামতের সন্ধান পাওয়া যায়, তদনুযায়ী আমরা হযরত মির্যা সাহেবের দাবী পর্যালোচনা করিব।

একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন ঃ

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র 'আলামত' সংক্রান্ত বহু রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। কিন্তু এই ব্যাপারে কোনো কোনো ব্যক্তি একটি মহাভুল করিয়াছেন। ফলে, বিষয়টি এক তুমুল নিবিড় আঁধার ঝটিকার দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই ভুলটি হইল, যে সকল

আলামত হাদীসে-নবুবিতে কেয়ামতের সন্নিহিত কাল সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই মসীহ্ মাওউদেরই 'আলামত' বলিয়া মনে করা হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ, ' কেয়ামত' বা 'আস্ সাআ' সম্বন্ধে বর্ণিত আলামতগুলি প্রতিশ্রুত মসীহেরও আলামত হইবে, ইহা কখনো জরুরী নহে। অবশ্য প্রতিশ্রুত মসীহ্কেও 'আস্-সা'আ বা কেয়ামতের আলামত বলা হইয়াছে। কিন্তু কিয়ামতের সাকল্য আলামতগুলি মসীহ্ মাওউদের সময়ে প্রকাশিত হওয়া অপরিহার্য নয়। কোনা কোনো 'আলামত' প্রতিশ্রুত মসীহ্ জাহের হওয়ার পূর্বে, কোন কোন আলামত তাঁহার আবির্ভাবের পর প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর। তারপর, কোনো কোনো আলামত কিয়ামতের একেবারে সন্নিহিত সময়ে প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর। সুতরাং, যদিও প্রতিশ্রুত মসীহ্ অবশ্য নিজেই কেয়ামতের অন্যতম আলামত, কিন্তু কেয়ামতের সমস্ত আলামতগুলি তাঁহার সময়ে অনুসন্ধান করা মহাভুল। কারণ, যেগুলি তাঁহার আলামত নহে, কেয়ামতের আলামত, তন্মধ্যে কোন কোনটি কেয়ামতের একবারে সন্নিহিতকালে প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ব্যক্তি হাদীসগুলোতে যেখানেই 'সাআ' বা 'কেয়ামতের' উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছেন, সেখানেই ইহার অর্থ 'কিয়ামতে কুব্রা' বা মহাপ্রলয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহা একটি সাংঘাতিক ভুল। প্রকৃতপক্ষে আরবী ভাষায় 'সাআ' এবং কেয়ামত' শব্দগুলি প্রত্যেক মহাপরিবর্তন, মহা-বিপ্লব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে, খেলাফতে রাশেদার সময়কার ফেৎনাগুলিও একটি 'সাআ' ছিল। হযরত ইমাম হুসায়নের (রাঃ) শাহাদতও একটি 'সাআ' ছিল। বনীউমাইয়াদের ধ্বংস-লীলাও এক প্রকার 'সাআ' ছিল। তারপর, বাগ্দাদ এবং আব্বাসীয়দের ধ্বংস-ক্রিয়াও একটি বড় 'কিয়ামত' ও 'সাআ' ছিল। স্পেন হইতে মোসলমানগণের বহিষ্কার একটি 'সাআ' ছিল। সেইরূপ ইসলামের ইতিহাসের সমস্ত মহা মহা পরিবর্তন ও বিপ্লব 'সাআ' ছিল। আহাদীসে- নবুবিতে যে সকল 'সাআ' সংক্রান্ত আলামত বর্ণিত হইয়াছে সবগুলিই 'কেয়ামতে-কুবরা' (মহাপ্রলয়) সম্বন্ধে বর্ণিত না হইয়া অন্তর্বর্তী 'সাআ'গুলি সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ কোনো হাদীস কোনো 'সাআ' সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে, আবার কোনো হাদীস অপর কোনো 'সাআ' সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোনো আলামত 'সাআতে-কুব্রা' সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা এক দেদীপ্যমান সত্য, একটু চিন্তা করিলে এবং ইসলামের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। কেননা, কোনো কোনো আলামত অন্তর্বর্তী 'সাআ'সমূহে প্রকাশিত হইয়া এই তত্ত্বটির কার্যতঃ সমর্থন করিতেছে এবং ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছে। এমন অবস্থায়, আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য ইহাই হইবে যে, আমরা যথাবিহিত অভিনিবেশ ও বিবেচনা সহ মসীহ্ এবং মাহ্দীর সময়কার বা তাঁহার ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে যে সকল আলামত বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল আলামতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।

মসীহ্ ও মাহদীর মোটামুটি দশটি আলামত ঃ

কোরআন শরীফ এবং হাদীসসমূহ হইতে মোটামুটি যে সকল আলামত প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী সম্পর্কে নির্ণীত হয় এবং অল্প বিস্তর সকল মোসলমানই যাহা জানেন, তাহা এই ঃ-

(১) মসীহ্ মাওউদের যুগে যাতায়াতের অত্যন্ত উন্নতি হইবে। সারাটা বিশ্ব যেন একটি দেশে পরিণত হইবে। নব নব যানবাহন আবিষ্কৃত হইবে। উস্ট্রগুলি বেকার হইয়া পড়িবে। বই-পুস্তক, সংবাদ-পত্র প্রভৃতির অত্যধিক প্রচলন হইবে। জড় বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে এবং বহু নতুন, অজানিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকাশ লাভ করিবে। নদ-নদী এবং সাগর হইতে খাল কাটা হইবে। গমনাগমনের অসাধারণ সুবিধা হইবে, প্রভৃতি।

(২) সেই সময় ক্রুশীয় ধর্মের প্রাবল্য হইবে।

(৩) তখন দাজ্জাল প্রকাশিত হইবে। ইহার ফেৎনা পৃথিবীতে পূর্বাপর যাবতীয় বিপ্লব হইতে ভয়াবহ হইবে।

(৪) তখন ইয়াজূজ মাজূজ (অর্থাৎ, ইংরেজ, আমেরিকা ও রাশিয়া) তাহাদের পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া অভ্যুত্থান করিবে এবং পৃথিবীর সমস্ত ভাল ভাল অংশের উপর আধিপত্য লাভ করিবে। এক জাতি অপর জাতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে।

(৫) ধর্মের পক্ষে সেই যুগ এক ভীষণাকৃতি ফাসাদের যুগ হইবে। জড়বাদিতা ও নাস্তিকতা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে। তখন ইসলাম অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় উপনীত হইবে। উলামায়ে-ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িবে। ইসলামে বহু অনৈক্য দেখা দিবে এবং ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িবে। লোকের 'আমল' (কর্ম) খারাপ হইয়া পড়িবে। ঈমান পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। বহির্দিক হইতেও ইস্‌লাম শত্রুদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে।

(৬) মসীহ্ মাওউদের জামানায় একই রমযান মাসে নির্দিষ্ট তারিখ-দ্বয়ে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ হইবে।

(৭) তাঁহার সময়ে 'দাব্বাতুল্-আরদ্' (ভূ-কীট) প্রকাশ পাইবে।

(৮) প্রতিশ্রুত মসীহ্ দামেস্কের পূর্ব দিকস্থ একটি শ্বেত মিনারার উপর অবতরণ করিবেন।

(৯) তিনি গোধূমকান্তি হইবেন। তাঁহার চুলগুলি হইবে সোজা ও লম্বা।

(১০) মসীহ্ মাওউদ ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন। শূকর বধ করিবেন। দাজ্জাল কতল করিবেন। ইস্‌লামের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন। তাঁহার যুগে সূর্য্য পশ্চিম গগণে উদিত

হইবে। মসীহ্ মাওউদ সর্বপ্রকার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মতানৈক্যের যথাযথ মীমাংসা করিবেন। লুপ্ত ঈমানের পুনরুদ্ধার করিবেন। লোকদিগকে বহু অর্থদান করিবেন। কিন্তু পৃথিবী তাঁহার অর্থ গ্রহণ করিবে না। (কোরআন মজীদ এবং হাদীস ও তফসীরের গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য)

স্থূলভাবে, এই দশটি আলামত মসীহ্ ও মাহ্দীর সম্বন্ধে, তাঁহার জামানা সম্বন্ধে কোরআন শরীফ এবং আহাদীসে-নবুবী হইতে নির্ণীত হয়। আমরা এই দশটি আলামত পৃথক পৃথকভাবে সম্মুখে রাখিয়া হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতা পরীক্ষা করিব, যেন সত্য ও অসত্যের মধ্যে প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় এবং সত্যের সন্ধানকারী যথার্থ মত গ্রহণে সমর্থ হন। "আর সৃষ্টির নিয়ন্তা আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোনই সামর্থ্য নাই।"

প্রথম আলামত ঃ

প্রথম আলামতের সন্ধান কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়েতসমূহে পাওয়া যায়। খোদাতাআলা বলেন ঃ-

"ওয়া ইযাল্-ইশারু উত্তেলাৎ, ওয়া ইযাল্ বেহারু সুজ্জেরাৎ, ওয়া ইযাস্ সুহুফু নুশেরাৎ, ওয়া ইযান্ নফুসু যুব্বেজাৎ" (সূরাহ্ তক্ভীর, রুকূ ১)

অর্থাৎ, "কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার এবং মসীহ্ মাওউদ অবতীর্ণ হওয়ার আলামত এই যে, তখন উষ্ট্রগুলি যানবাহন হিসাবে পরিত্যক্ত হইবে, নদ-নদী ও সাগর হইতে খালসমূহ খনন করা হইবে, বই-পুস্তক এবং সংবাদপত্রাদি বহু পরিমাণে প্রকাশিত হইয়া বহু বিস্তার লাভ করিবে, এবং বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে পারস্পরিক মিলন ঘটিবে; অর্থাৎ, যাতায়াত ও যানবাহনের এত সুবিধা হইবে যে, পূর্ববর্তী যুগসমূহের ন্যায় তখন জাতিগণ পৃথক পৃথক হইয়া বাস করিবে না; বরং মেলামেশার আধিক্যবশতঃ সমগ্র বিশ্ব যেন একই দেশে পরিণত হইবে।" তারপর, ইহার সমর্থনে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের একটি হাদীসও আছে। হুযূর (সঃ) ফরমাইয়াছেন ঃ *"লাইউৎ-রাকান্নাল্ কেলাসু ফালা ইউস্আ আলাইহা"* ('সহীহ্ মোস্লেম,' ২য় জেল্দ) অর্থাৎ "উষ্ট্রগুলি পরিত্যক্ত হইবে, তাহাদের উপর উঠিয়া সফর করা হইবে না।" কোরআন শরীফের অন্যত্র বলা হইয়াছে, ***"আখ্রাজাতিল আরদু আস্কালাহা"*** অর্থাৎ, "আখেরী জামানায় পৃথিবী তাহার যাবতীয় গুপ্ত ভান্ডারসমূহ বাহিরে নিক্ষেপ করিবে এবং জড় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধিক্য হইবে, ইত্যাদি।

এখন, দেখুন এই জামানায় কীরূপ স্পষ্টভাবে এই সমস্ত আলামত আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। নব নব যানবাহন যেমন- রেল, মটর, জাহাজ, উড়োজাহাজ, ডাক-ব্যবস্থা, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলিভিশন, বেতার ও রেডিও,- খালসমূহ- বই-পুস্তক ও সংবাদপত্রের প্রসার, মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার, টাইপ, সর্টহ্যান্ড প্রভৃতি সারাটি বিশ্বকে

কীরূপে এক করিয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম-প্রচারের কাজ কত সহজ হইয়া পড়িয়াছে। রেল, মটর প্রভৃতি উষ্ট্রগুলিকে কার্য্যতঃ বেকার করিয়া ফেলিয়াছে। আরবেও রেল পৌছিয়াছে। এমন কি মক্কা এবং মদীনার মধ্যেও শীঘ্রই রেলের ব্যবস্থা হইয়া উষ্ট্রদিগকে–যতখানি দূরবর্তী ভ্রমণের সম্পর্ক– উহাদিগকে সম্পূর্ণই বেকার করিবে, যেমন অন্যান্য অধিকাংশ দেশগুলিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ, এই আলামত এই জামানায় এমন পরিষ্কারভাবে পূর্ণ হইয়াছে যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই এ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। সেজন্য যাবতীয় প্রশংসাই আল্লাহ্‌র প্রাপ্য। এই প্রকারে এযুগে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে আধিক্য ঘটিয়াছে, পূর্ববর্তী কোন যুগেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

ইহাও স্মরণ রাখা দরকার, মসীহ্ মাওউদের আবির্ভাবের জন্য এরূপ কোনো যুগ নির্বাচনই অত্যাবশ্যক ছিল। কারণ, মসীহ্ মাওউদের যুগ ধর্ম-প্রচারের যুগ। সুতরাং, তাঁহার জামানায় প্রচারের সামগ্রীগুলি সরবরাহ হওয়া একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল, যেন তিনি এবং তাঁহার জামাত সহজে তবলীগের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন।

দ্বিতীয় আলামত ঃ

মসীহ্ মাওউদের জামানার অপর আলামত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তখন ক্রুশধর্ম বড়ই জোর বাঁধিবে। অর্থাৎ খৃষ্টানগণ বড়ই শক্তিশালী হইয়া পড়িবে। কোরআন শরীফের সঙ্কেতসমূহ ছাড়া হাদীস শরীফেও মসীহ্ মাওউদের কার্য্য সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে ঃ *"ইয়াকসেরুস্ সালীবা"।* ('বুখারী শরীফ' এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ, "মসীহ্ মাওউদ ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন।" ইহা দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এমন সময়ে আসিবেন, যখন ক্রুশধর্ম অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া পড়িবে। তবেই তো তিনি ইহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া ইহাকে ভঙ্গ করিবেন। নতুবা, এমনিত খৃষ্টীয়ান ধর্ম আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সময়েও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিবার কথা বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং, ইহাই বুঝা যায় যে, প্রথমে ক্রুশীয় ধর্ম জোরালো হইয়া উঠিবে, তারপর কোন ব্যক্তি ইহার শক্তি বিনাশের দ্বারা ইহার উপর প্রাধান্য লাভ করিবেন। এখন দেখুন, বর্তমান যুগে ক্রুশীয় ধর্ম কেমন শক্তিশালী হইয়া পড়িয়াছে। চতুর্দিকে ইহারই অনুবর্ত্তীদিগকে দেখা যায়। তাহারা সারা বিশ্ব ব্যাপী তাহাদের ধর্ম প্রচারের জাল বিস্তার করিয়াছে। সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ মাওউদ আবির্ভূত হওয়ার এই সেই যুগ। এখানে শুধু ইহাই দেখানো উদ্দেশ্য যে, মসীহ্ মাওউদের যুগের একটি লক্ষণ- তখন খৃষ্টীয়ান ধর্ম প্রতিপত্তিশালী হইবে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। এই লক্ষণটি পূর্ণাকারে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহাই প্রতিপাদিত করিবার ছিল।

তৃতীয় আলামত ঃ

মসীহ্ মাওউদের অপর আলামত বলা হইয়াছিল, তাঁহার সময় দাজ্জাল বহির্গত হইবে। হাদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে সম্বোধনপূর্বক বলিয়াছিলেন ঃ– *"মা মিন্ নাবীইন ইল্লা কাদ্ আন্‌যারা উম্মাতাহুল আ'য়াওরাল কাযযাবা, আলা আন্নাহু আওয়ারু ও আন্না রাব্বাকুম লাইসা বেআউওয়ারা মক্‌তূবুন্ বায়না আয়নায়হে কাফ, ফে, রে, ওফি রাওয়াইয়াতিন্ ওআন্নাহু ইয়াজিউ মাআহু বেমাসালিল্ জান্নাতে ওয়ান্ নারে, ফাল্লাতি ইয়াকূলু আন্নাহল্ জান্নাতু হিয়ান নারু ওফি রাওয়াইয়াতিন্ আন্নাদ্ দাজ্জাল ইয়াখ্‌রুজু ওআন্না মাআহু মা'উন্ ও নারান্ ফা-আম্মাল্লাযি ইয়ারাহুন্ নাসু মা'য়ান্ ফা-নারুন্ তুহাররেকু ও আম্মাল্লাযি ইয়ারাহুন্ নাসু রানান্ ফা-মা'উন্ বারেদুন্ ও আযবুন। ও আন্নাদ্-দাজ্জালা মামসুহুল্ আইনে আলায়হা যাফ্‌রাতুন্ গালিযাতুন মাক্‌তুবুন্ বায়না আয়নায়হে কাফেরুন ইয়াকরাউহু কুল্ল মোমেনিন কাতেবুন ওগায়রু কাতেবিন্। ওফি রাওয়াইয়াতিন ইন্নাদ্ দাজ্জালা আ'ওরুল্ আইনিল ইয়ুম্‌না ফামান্ আদরাকাহু মিন্‌কুম্ ফাল্‌ইয়াক্‌রা আলায়হে ফাওয়াতেহা সুরাতিল কাহ্‌ফে ফাআন্নাহা যাওয়ারুকুম্ মিন্ ফিৎনাতিহি ওফি রাওয়াইয়াতিন্ ও ইয়ামুরুস্ সামাআ ফাতাম্‌তেরু ওইয়ামুরুল আরদা ফাতুম্‌বেতু ও ইয়ামুররু বিল খারেবাতে ফাইয়াকূলু লাহা আখরেজি কুনুযাকে ফাতাৎবাউহু কুনূযুহা। ওফি রাওয়াইয়াতিন্ ইয়াকূলুদ দাজ্জালু আরাইতুম ইন্ কাতাল্‌তু হাযা সুম্মা আহ্ ইয়ায়তুহু হাল্ তাশাক্কূনা ফিল্ আম্‌রে ফাইয়াকুলূনা লা ফা-ইয়াক্‌তালুহু সুম্মা ইয়ুহ্‌ইহে। ওফি রাওয়াইয়াতিন আন্না মাআহু জাবালু খুব্‌যিন্ ওয়া নাহরু মা'ইন। ওফি রাওয়াইয়াতিন্ ইয়াখ্ রুজুদ্ দাজ্জালু আলা হেমারিন্ আক্‌মারা মা বায়না উযানায়হে সাব্‌উনা বাআন্।"* ('মিশ্‌কাত', কেতাবুল ফেতান্')

অর্থাৎ, "এমন কোনো নবী হন নাই, যিনি এক চক্ষু বিশিষ্ট মহা মিথ্যাবাদীর সম্বন্ধে সতর্ক করেন নাই। হুঁশিয়ার হও, শোন, সে এক চক্ষু বিশিষ্ট। কিন্তু তোমাদের রব্ব্ এক চক্ষু বিশিষ্ট নহেন। এই এক চক্ষু বিশিষ্ট দাজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যভাগে 'কাফ' 'ফে' 'রে' লিখা থাকিবে। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সে তাহার সহিত বেহেশ্‌ত ও দোযখের নমুনা লইয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু যে বস্তুকে সে বেহেশ্‌ত বলিয়া অভিহিত করিবে, তাহা প্রকৃতপক্ষে নরক হইবে। অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, 'দাজ্জাল বাহির হইবে এবং তাহার সহিত জল ও অগ্নি থাকিবে। কিন্তু লোকেরা পানি স্বরূপ যাহা দেখিতে পাইবে, বস্তুতঃ তাহা দাহকারী আগুন হইবে। যাহা লোকের নিকট অগ্নি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহা হইবে ঠান্ডা সুমিষ্ট জল'। দাজ্জালের একটি চক্ষু বসানো হইবে। উহার উপর একটা বড় ফুল পড়িবে। তাহার চক্ষুদ্বয়ের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে 'কাফের' লিখা থাকিবে। প্রত্যেক মোমেন–লিখা পড়া জানে বা না জানে–তাহা পড়িতে পারিবে'। অপর

এক রেওয়ায়াত আছে, 'দাজ্জালের ডান চক্ষু অন্ধ থাকিবে'। তোমাদের কেহ উহার সাক্ষাৎ পাইলে, তাহার সম্মুখে সূরা্ কাহ্‌ফের প্রথম আয়াতগুলি পাঠ করিও। কারণ, সূরা কাহ্‌ফের প্রারম্ভিক আয়াতগুলি এই ফেৎনা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে।' অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, 'দাজ্জাল বৃষ্টি বর্ষণের জন্য আকাশকে নির্দেশ করিলে বারিপাত হইবে। সে ভূমিকে শস্যোৎপাদনের আজ্ঞা করিলে ভূমি তাহা করিবে। জনশূন্য অনাবাদি ভূমিতে সে পদার্পণ করিলে, তাহার আদেশে উহার মধ্য হইতে ধন-রত্নরাজি বাহির হইয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিবে'। অপর এক রেওয়ায়াত আছে, 'দাজ্জাল লোকদিগকে বলিবে, দেখ, আমি এই ব্যক্তিকে বধ করিতেছি, আবার জীবিত করিব। তোমরা কি ইহাতে সন্দেহ করিতেছ?' লোকেরা বলিবে, 'না'। তারপর সে তাহাকে বধ করিবে এবং তাহাকে আবার জীবিত করিবে'। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, 'তাহার সহিত রুটীর পাহাড় এবং পানির নহর থাকিবে'। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, দাজ্জাল একটা শ্বেত গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়িয়া বাহির হইবে। গর্দ্দভটার দুই কানের অন্তর্বর্তী দূরত্ব হইবে ৭০ গজ'।"

দাজ্জাল সংক্রান্ত এই তথ্য মিশ্‌কাতের বিভিন্ন রেওয়ায়াত হইতে সংক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত এবং এখানে উদ্ধৃত করা হইল। এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে, এই দাজ্জাল কে? সে জাহির হইয়াছে, কি হয় নাই? সর্বাগ্রে আমরা 'দাজ্জাল' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিতেছি। আরবী ভাষায় ইহার অর্থ কী? আরবীতে 'দাজ্জাল' শব্দের ছয়টি অর্থ আছে। যথা ঃ-

প্রথম, দাজ্জাল অর্থ 'কায়যাব' অর্থাৎ মিথ্যাবাদী।

দ্বিতীয়, দাজ্জাল অর্থ 'আবরণকারী'। আরবীতে 'দাজালাল্ বায়ীর', অর্থ, 'সে উটের দেহে 'মেহেন্দী' মালিস করিয়াছে- এমনভাবে যে, কোন স্থানেই বাদ পড়ে নাই'। সুবৃহৎ আরবী অভিধান "তাজুল-উরুসে" লিখিত আছে যে, 'দাজ্জাল' এই ধাতু হইতেই উৎপন্ন। 'লে আন্নাহু ইয়াউম্মুল্-আরদা কামা আন্নাল্ হেনাআ ইয়াউম্মুল্ জাসাদা।" অর্থাৎ "কারণ, সে পৃথিবীকে মেহেন্দী দিয়া দেহ ঢাকিবার ন্যায় আচ্ছাদিত করিবে।"

তৃতীয়, দাজ্জাল অর্থ 'পৃথিবী ব্যাপী ভ্রমণকারী'। যেমন, 'দাজালার-রাজুলু ইযা কাতাআ নাওয়াহিয়াল আরদে সায়রান"- অর্থাৎ, "দাজালার রাজুলু" বলা হয়, যখন কেহ সমগ্র পৃথিবীর পর্যটন শেষ করে।

চতুর্থ, দাজ্জাল অর্থ অতি ধনী, মহা অর্থশালী। কারণ, দাজ্জাল স্বর্ণকেও বলা হয়।

পঞ্চম, 'দাজ্জাল' কোন প্রকাণ্ড দলকেও বুঝায় যেমন বলা হয়, "আল্লাতি তাঘাত্তাল্ আরদা বেকাস্‌রাতে আহলেহা"- অর্থাৎ, যে তাহার লোক জনের আধিক্য বশতঃ পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলে।

ষষ্ঠ, 'দাজ্জাল' ঐ সজ্ঘকেও বলা হয়, যাহারা পণ্যদ্রব্য লইয়া বেড়ায়। "আল্লাতি তাহ্‌মেলুল মাতাআৎ-তাজারাতে"- অর্থাৎ, ঐ বনিকদল, যারা পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া থাকে।

উপরে বর্ণিত সমস্ত অর্থ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, বিখ্যাত আরবী অভিধান "তাজুল্ উরুসে" সন্নিবিষ্ট আছে। সুতরাং, এই সকল অর্থাবলীর দিক দিয়া একত্রে 'দাজ্জাল' অর্থ হইল, বহু লোক সমন্বিত এক সম্প্রদায়। বাণিজ্য তাহাদের পেশা। তাহারা বিশ্বব্যাপী তাহাদের বাণিজ্যিক দ্রব্যগুলি বহন করে। তাহারা অত্যন্ত ধনবান ও ঐশ্বর্যশালী। তাহারা তাহাদের চলা-ফেরা দ্বারা বিশ্ব পর্যটন করিয়া বেড়ায় এবং সব জায়গাতেই পৌঁছে। কোন স্থানই বাকী থাকে না। ধর্মের দিক দিয়া তাহারা ঘোর মিথ্যা আকিদা পোষণ করে।"

এখন এই তথ্যের সহিত হাদীসে নবুবী (সঃ) বর্ণিত তথ্য মিলাইয়া দেখুন। হাদীসোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ এতে প্রদত্ত হইয়াছে। উভয় তথ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র, দ্বিধাহীনভাবে এই মীমাংসায় উপনীত হইতে হয় যে, দাজ্জাল দ্বারা পাশ্চাত্য খৃষ্টান জাতিদিগকে বুঝায়। তাহারা বর্তমান যুগে সারা বিশ্বকেই আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদেরই মধ্যে পূর্বোক্ত যাবতীয় বিষয়াবলী স্পষ্ট পাওয়া যায়। এক চক্ষু বিশিষ্ট হওয়ার অর্থ তাহাদের ঘোর জড়বাদিতা। ইহা তাহাদের ধর্ম চক্ষুকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য পার্থিব চক্ষু অতি খোলা ও উজ্জ্বল। তাহাদের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যভাগে "কাফের" শব্দ লিখিত থাকা দ্বারা স্বতঃ অগ্রাহ্য খৃষ্টের ঈশ্বরত্বের মতবাদকে বুঝায়, যাহা শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রত্যেক মোসলমানই পাঠ করিতে পারে। পৃথিবী ও আকাশের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব, ভূগর্ভ হইতে রত্নরাজী বাহির করা এবং জীবন দান ও প্রাণ হনন করা প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তি এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যের কথা রূপকভাবে নির্দেশ করিতেছে। নতুবা, প্রকৃতার্থে এ সবই আল্লাহ্‌তা'আলার স্বহস্ত রক্ষিত কার্য্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের প্রতি এসকল কার্য্য আরোপ করা 'কুফরী'। দাজ্জালের সহিত 'বেহেশ্‌ত-দোযখ' থাকার অর্থ তাহাদের সঙ্গে মিশিলে, তাহাদের কথা মানিলে এবং তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিলে, বাহ্যিকভাবে তাহা এক প্রকার জান্নাতে প্রবেশ বটে, যদিও উহা প্রকৃতপক্ষে নরক; এবং কেহ তাহাদের দুষ্ট ধারণাগুলি হইতে দূরে থাকিলে, বাহ্যিকভাবে তাহা এক প্রকার নরক ভোগ হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই দোযখই বেহেশত। তাহাদের সহিত রুটীর পাহাড় এবং জল প্রস্রবণ থাকা স্বতঃপ্রতিভাত বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দাজ্জালের গাধা এবং উহার দুই কানের মধ্যবর্তী দুরত্ব ৭০ গজ দ্বারা বাহ্যিক গর্দ্দভ অর্থ বুঝায় না। তদ্দ্বারা রেল গাড়ীকে বুঝায়। ইহা পুরাকালে যানরূপে ব্যবহৃত গর্দ্দভের স্থলবর্তী। গর্দ্দভের কর্ণদ্বয় ড্রাইভার ও গার্ডের প্রতি নির্দেশ করে। তাহারা ট্রেনের শেষ প্রান্তদ্বয়ে থাকেন। কর্ণদ্বয়ের দূরত্বের দ্বারা রেল গাড়ীর দৈর্ঘ্যকেও বুঝায়। ইহা সাধারণতঃ ৭০ গজই থাকে। এখন দেখুন, কি প্রকারে এই সকল যাবতীয় বিষয় পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। আর এই যে বলা হইয়াছে যে,

দাজ্জাল আখেরী জামানায় বাহির হইবে, তদ্দারা ইহাই বুঝায় যে, যদিও দাজ্জাল পূর্ব হইতেই থাকিবে, যেমন কিনা কোন কোন হাদীসে এই সম্বন্ধে ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, তবু প্রথমে সে তাহার দেশেই আবদ্ধ থাকিবে। কিয়ামতের নিকটবর্তী কালে সে মহা প্রতাপের সহিত বাহির হইবে এবং সমস্ত বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িবে। ফলতঃ, ঠিক তাহাই হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিগুলি ইতঃপূর্বে তাহাদের দেশেই নিদ্রা যাইতেছিল। এখন তাহারা জাগ্রত হইয়া সারা বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দাজ্জালকে রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম একজন ব্যক্তি রূপে দেখিয়াছিলেন। উহাকে একটি সম্প্রদায় স্বরূপ কীভাবে মানা যায়? ইহা একটি ভ্রমাত্মক সন্দেহ। রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এই সকল দৃশ্য কাশ্‌ফ ও স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্থলে, বুখারীতে লিখিত আছে ঃ– "বায়নামা আনা নায়েমুন্ আতুফু বিল্‌কা'বাতে" (বুখারী ২য় খন্ড, মিশরীয় সংস্করণ, ১৭১ পৃঃ) "আমি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখিতে পাই যে, দাজ্জাল কা'বা শরীফের 'তাওয়াফ' করিতেছে।" সধারণতঃ, স্বপ্নের অর্থ করিতে হয়। স্বপ্নে অনেক সময়েই একজন ব্যক্তিরূপে দেখানো হইলেও তদ্দারা একটি দল বুঝাইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে, কোরআন শরীফের সূরা ইউসুফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মিশর রাজ সপ্ত বর্ষীয় দুর্ভিক্ষকে সাতটি হীনকায়া গাভীরূপে দর্শন করেন। ইহার 'তা'বীর' স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আঃ) করিয়াছিলেন, এক একটি গাভী "এক এক বৎসরের যাবতীয় পালিত জন্তু এবং অন্যান্য প্রাণীদিগকে বুঝায়" এবং গাভী 'হীনকায়া' দেখানো 'দুর্ভিক্ষ' নির্দেশ করে। সাতটি এরূপ গাভী দেখার অর্থ 'সাত বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ'। অন্য কথায়, একটি গাভী সমস্ত জীব-জন্তুর স্থলে দেখানো হয় (সূরা ইউসুফ)। সেইরূপ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে একটি ব্যক্তির আকৃতিতে দর্শন করেন। ইহা স্বপ্নের সাঙ্কেতিক ভাষায় সম্পূর্ণ অনুমোদিত। যাহা হউক, দাজ্জাল দ্বারা কোন একজন ব্যক্তি বিশেষকে না বুঝাইয়া সংখ্যা বহুল কোন জাতিকে বুঝায়। ইহা বর্তমান যুগে খৃষ্টীয়ান জাতিগুলির আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের এই দাবী নিম্নলিখিত যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ–

(১) অভিধান মতে দাজ্জাল অর্থ 'মহা-সঙ্ঘ' 'প্রকাণ্ড সম্প্রদায়'। সুতরাং 'দাজ্জাল' কোন একজন ব্যক্তি বিশেষ নহে।

(২) যে সকল ফেৎনা দাজ্জালের প্রতি আরোপিত হয় এবং যে সকল শক্তিমত্তা দাজ্জালের মধ্যে পাওয়া যাইবে বলিয়া কথিত হয়, তাহা কোন এক ব্যক্তিতে পাওয়া জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হয়।

(৩) দাজ্জালের বিবরণ যেরূপ ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপাত্মক কথা এবং অলঙ্কার বিদ্যমান। নতুবা দাজ্জালের মধ্যে, নাউযুবিল্লাহ, কোন কোন খোদায়ী শক্তি থাকা স্বীকার করিতে হয়।

(৪) দাজ্জাল সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ কার্যতঃ খৃষ্টীয়ান জাতিদের মধ্যে পাওয়া যায়।

(৫) দাজ্জালের ফিৎনা সব চেয়ে বড় আপদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে, খৃষ্টীয়ান জাতিগুলির জড়বাদ এবং তাহাদের দর্শন-শাস্ত্র অধুনা যে ফেৎনার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে, ইতিঃপূর্বে এইরূপ বিপ্লব দীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে কখনো উত্থিত হয় নাই, এবং ভবিষ্যতেও কখনো হইবে বলিয়া ধারণা করা যায় না। কোরআন শরীফের সর্বপ্রথম সূরা–সূরা ফাতেহা পাঠেও খৃষ্টীয়ান ফেৎনাই সর্বাপেক্ষা বড় ফেৎনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

(৬) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ইবনে-সাইয়াদ সম্বন্ধে দাজ্জাল হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইবনে-সাইয়াদ মদীনার একজন তরুণ ইহুদী ছিল। পরে সে মোসলমান হয়। এমন কি, হযরত উমর (রাঃ) আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সম্মুখে 'কসম'পূর্বক বলিয়াছিলেন যে, এই সেই দাজ্জাল। নবী করীম (সঃ) তাঁহার কথার কোন প্রতিবাদ করেন নাই ('মিশ্‌কাত, ইবনে-সাইয়াদ সংক্রান্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য)। অথচ ইবনে-সাইয়াদের মধ্যে দাজ্জাল সংক্রান্ত উল্লিখিত আলামতসমূহের অধিকাংশই অবিদ্যমান ছিল। ইহা হইতে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা কেরাম রাযিআল্লাহুআনহুম এই ভবিষ্যদ্বাণীকে রূপাত্মক বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং যাবতীয় লক্ষণাবলী বাহ্যিকভাবে এবং দৈহিকরূপে প্রাপ্ত হওয়া কখনো জরুরী মনে করেন নাই।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, দাজ্জালের ফেৎনা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সূরা কাহ্‌ফের প্রারম্ভিক আয়াতগুলি পাঠ করা উচিত। ('মিশকাত,' কেতাবুল ফেতান, বাবুদ-দাজ্জাল)। এখন, সূরা কাহ্‌ফের উক্ত আয়াতগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেখানে খৃষ্টীয়ান ধর্মের ভ্রান্ত ধারণাসমূহের অপনোদন ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বর্ণিত হয় নাই। সূরা কাহ্‌ফের প্রারম্ভিক আয়াতগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

"আল-হামদু লিল্লাহেল্‌-লাযি আন্‌যালা আলা আবদেহিল কেতাবা ওলাম্ ইয়াজ্‌আল্ লাহু এওয়াজা। কাইয়েমান্ লে তুন্‌যেরা বাসান শাদীদান মিন্ লাদুন্‌হু ও বাশ্‌শেরাল্ মোমেনীনাল্ লাযীনা ইয়ামালুনা সালেহাতে আন্না লাহুম আজ্‌রান হাসানা। মাকেসিনা ফিহে আবাদাঁও ও ইউন্‌যেরাল্ লাযিনা কালুৎ-তাখাযাল্লাহু ওলাদা। মা লাহুম বেহি মিন্ এলমেওঁ ওলা লে-আবায়েহিম্। কাবুরাৎ কালিমাতান্ তাখ্‌রুজু মিন্ আফ্‌ওয়াহেহিম। ইইঁ-ইরকুলুনা ইল্লা কাযেবা। ফা-লাআল্লাকা বাখেউন্-নাফ্‌সাকা আলা আসারেহিম ইল্-লাম্ ইয়ুমেনু বেহাযাল্-হাদীসে আসাফা। ইন্না জাআল্‌না মা আলাল্ আরদে যিনাতাল-লাহা লে-নাব্‌লওয়াহুম আইউহুম আহসানু আমালা। ও ইন্না লা-

জায়েলুনা মা আলাইহা সায়ীদান জুরুযা।" অর্থাৎ "খোদা তাঁহার রসূলের উপর এক কেতাব নাযেল করিয়াছেন ...... এই কেতাব তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহারা খোদার পুত্র স্বীকার করে; ইহা বড় ফেৎনার কথা এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা" ইত্যাদি।

এখন ইহার চেয়ে অধিক শক্তিশালী প্রমাণ আর কি হইতে পারে যে, বর্তমান খ্রীষ্টান জাতিগুলিই দাজ্জাল। তাহারা এ যুগে অসাধারণভাবে ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দাজ্জালের দজ্‌ল হইল তাহাদের জড়বাদ, দর্শন এবং তাহাদের ভ্রান্ত ধর্ম-বিশ্বাস। যাহার চক্ষু আছে, সে দেখিতে পারে। হযরত মির্যা সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীদিগকে আহ্বান পূর্বক লিখিয়াছেন, " হে মূঢ়গণ, তোমরা দাজ্জালকে একটি আশ্চর্য্য প্রাণী বিশেষ মনে করিয়া উহার অপেক্ষা করিতেছ। কিন্তু এখানে তোমাদের চোখের সামনে সেই সকল ভীষণাকৃতি ফেৎনা-ফাসাদ প্রকটিত হইতেছে, যাহা তোমাদের কাল্পনিক দাজ্জালের পিতাও জানিবে না।"

(৮) মোসলেমের এক হাদীসে লিখিত আছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের একজন সাহাবী তমীমদারী দাজ্জালকে গীর্জার মধ্যে বন্ধনকৃত অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ স্বপ্ন যোগে বা জাগ্রত অবস্থায় আধ্যাত্মিক স্বপ্ন ('কাশ্‌ফ') যোগে তিনি ইহা দর্শন করেন। তিনি ইহা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের নিকট বলেন এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ইহা লোকের নিকট বর্ণনা করেন ('মোস্‌লেম.' ২য় জেল্‌দ, বাব 'খরুজুদ-দাজ্জাল')। এখন দেখুন গীর্জা হইতে কে বাহির হইতেছে?

চতুর্থ আলামত ঃ

চতুর্থ আলামত এই যে, তখন 'ইয়াজূজ ও মাজূজ' পূর্ণ শক্তি লইয়া প্রাদুর্ভূত হইবে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ভাল ভাল এলাকার উপর অধিকার বিস্তার করিবে। জাতিগণ একের বিরুদ্ধে অপরে উত্থিত হইবে। কোরআন শরীফে এ বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে ঃ-
"হাত্তা ইযা ফুতেহাৎ ইয়াজূজ ওয়া মাজূজু ওয়া হুম্ মিন কুল্লে হাদাবি ইয়ানসেলুন (আম্বিয়া, রুকূ ৭)। "ও তারাক্‌না বাযাহুম্ ইয়াওমায়েযিঁই ইয়ামুজু ফি বাজেঁও ও নুফেখা ফিস্-সুরে ফাজামা'নাহুম্ জাম্‌আ" ('সূরাহ্ কাহ্‌ফ,' রুকূ-১১) অর্থাৎ, "যখন ইয়াজূজ ও মাজূজকে খোলা হইবে এবং তাহারা সকল উচ্চ স্থানসমূহ হইতে দৌড়াইয়া উপস্থিত হইবে এবং জাতিগণ একের বিরুদ্ধে অন্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে, তখন বংশী বাজানো হইবে। উহা সকলকে একত্রিত করিবে।" হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ- "আল্লাহতা'আলা ইয়াজূজ মাজূজকে উত্থিত করিবেন। তাহারা সকল উচ্চ স্থান হইতে দৌড়াইতে থাকিবে।"

দেখা যাচ্ছে, ইয়াজূজ ওয়া মাজূজ দ্বারা ইংরাজ ও রাশিয়াকে বুঝায়। বাইবেলেও ইহার সবিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ('যিহিস্কেল ৩৮ঃ১০-১৩; ৩৯ঃ৫-৭ ও 'প্রকাশিত বাক্য' ২৯ঃ৯)। আলামাতে মাসুরাও (কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত লক্ষণসমূহও) তাহাই নির্দেশ করে। পূর্বে এই সব জাতিরা দুর্বল অবস্থায় নিপতিত ছিল। কিন্তু খোদা পরে তাহাদিগকে উন্নতি দেন। তাহারা পৃথিবীর অধিকাংশ ভূভাগ অধিকার করিল এবং বহু শক্তিশালী হইয়া পড়িল। তাহাদের এই সকল যাবতীয় উন্নতি বর্তমান যুগে হইয়াছে। পূর্বে তদ্রূপ ছিল না। তাহাদের এবং অন্যান্য জাতিদের পারস্পরিক বিরুদ্ধাচরণ এতই স্পষ্ট যে কোনই ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। বংশী-ধ্বনি দ্বারা মসীহ্ মাওউদের আবির্ভাব বুঝায়। কারণ, খোদাতাআলার প্রেরিত ব্যক্তিগণও এক প্রকার বংশীস্বরূপ। তাঁহাদের দ্বারা খোদা তাঁহার বাণী ধ্বনিত করেন। তারপর তাঁহাদের দ্বারা লোকদিগকে একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করেন। সুতরাং এখনো, ইন্‌শাআল্লাহ্, ইহাই হইবে, বরং হইতেছে। কিন্তু প্রথম রাত্রির চাঁদ যেমন অধিকাংশ লোকেরাই দেখিতে পায় না, সেইরূপ সকল পরিবর্তনই প্রথমে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকিয়া পরে সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। অতএব, চিন্তা করুন!

পঞ্চম আলামত ঃ

পঞ্চম আলমত এই বলা হইয়াছিল যে, মসীহ্ মাওউদের জামানায় ইসলামের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটনাপন্ন হইবে। বে-দীনী জোর বাঁধিবে। মোসলমান ইহুদীদের মত হইয়া পড়িবে। তাহাদের আলেমদের অবস্থাও শোচনীয় হইবে। মোসলমানদের মধ্যে বহু অনৈক্য দেখা দিবে। ঈমান দুনিয়া হইতে উঠিয়া যাইবে প্রভৃতি, প্রভৃতি। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ–

"লা-তাত্তাবেউন্না সুনুনা মিন্ কাব্‌লাকুম শেব্‌রান বেশেব্‌রিন্ ও জেরায়ান বেযেরায়িন হাত্তা লাও দাখালু জুহ্‌রা যাব্‌বিন্ লাত্তাবেতুমুহুম্ কিলা ইয়া রাসূলাল্লাহে আল্ ইয়াহুদু ওয়ান্ নাসারা? কালা ফামান? ওফি রেওয়াইয়াতিন্ ইয়াযহাবুস্ সালেহুনা ওইয়াব্‌কা হুফালাতুন কাহুফালাতিশ্ শায়ীরে আভিৎ-তাম্‌রে লা ইউবালিহুমুল্লাহু বালাতান। ওফি রেওয়াইয়াতিন কালা রাসূলুল্লাহে সল্লাল্লাহু আলায়হে ওসাল্লামা ইউশেকুল উমামু আন্ তাদাআ আলায়কুম্ কামা তুদাআল্-আকেলাতু ইলা কাস্‌আতেহা। কালা কায়েলুন ও মিন্ কিল্লাতিন্ নাহ্‌নু ইয়াউমায়েযিন? কালা বাল্ আন্‌তুম্ ইআওমায়েযিন কাসিরুন ও লাকিন্নাকুম কা-গুসায়িস্ সাইলে ওল্ ইয়ান্‌যে - আন্নাল্লাহো মিন্ সুদুরে ওদুভ্‌ভে কুমুল্ মাহাবাতা মিন্‌কুম ওল্ ইআক্‌যেফান্না ফিকুলুবে-কুমুল্-ওআহ্‌না। কালা কাএলুন্ ইয়া রাসূলাল্লাহে ওমাল্ ওআহনু। কালা হুব্বুদ দুনয়্যা ও কারাহিয়াতুল্ মাওতে। ওফি রেওয়াইয়াতিন কালা ইয়াকুনু বাদী আইম্মাতুল্ লা ইয়াহ্‌তাদুনা বিহুদায়া ও লা ইয়াস্‌তাননুনা বেসুন্নাতি ও সাইয়াকুমু ফিহিম্ রেজালুন্ কুলুবুহুম্

কুলুবুশ্ শায়াতীনে ফি জুস্মানে ইন্সিন্। ওফি রেওয়াইয়াতিন্ ওলামাউ-হুম শাররুম্ মান্ তাহ্তা আদীমিস্ সামাএ। ওফি রেওয়াইয়াতিন ও ইয়ারফাউল্ এল্মু ও ইক্সুরুল্ জাহ্লু ও ইয়াক্সুরুয্ যেনা ও ওইয়াকসুরু শুর্বুল খামরে। ওফি রেওয়াইয়াতিন্ তাফতারেকু উম্মাতি আলা সালাসিন্ ও সাব্ইনা ফেরকাতিন্ ওফি রেওয়াতিন্ লাও কানাল্ ঈমানু ইন্দাস্ সুরিয়্যা লানালাহু রাজুলুম্ মিন্ আহ্লে ফারেস।" ('মিশকাত,' কেতাবুল্ ফেতান ও আশরোতুস্-সাআ' প্রভৃতি অধ্যায়।)

অর্থাৎ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "হে মোসলমানগণ, তোমরা নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তীদের পদাঙ্কানুসরণ করিবে, বিঘৎ বিঘৎ, হুবহু। এমন কি, পূর্ববর্তীরা গোসাপের গর্তে প্রবেশ করিয়া থাকিলে তোমরাও তাহাই করিবে। জিজ্ঞাসা করা হইল, হে রাসূলুল্লাহ্! পূর্ববর্তীগণ কি ইহুদী ও নাসারাকে বুঝায়? তিনি (সঃ) বলিলেন, 'তবে, আর কে'? অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, 'সালেহ (সাধু) ব্যক্তিগণ অন্তর্হিত হইবেন; শুধু বাহ্যাবরণগুলি থাকিবে যবের বা খেজুরের বহিরাবরণ বা খোসাগুলির ন্যায়। আল্লাহ্ এইরূপ ব্যক্তিগণের কোনই পরওয়া করিবেন না'। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, শীঘ্রই তোমাদের বিরুদ্ধে অন্যান্য জাতিরা একে অন্যকে আহ্বান করিবে, যেমন ভোজনকারী তাহার ভোজনপত্রের দিকে অন্যকে আহ্বান করে'। অর্থাৎ তোমরা অন্যান্য জাতিদের ভক্ষ্য বস্তুস্বরূপ হইয়া পড়িবে। তাহারা একে অপরকে তোমাদের ভক্ষণার্থ্যে আমন্ত্রণ জানাইবে। একজন সাহাবী (রাঃ) নিবেদন করিলেন, 'হে রসূলুল্লাহ, আমরা কি তখন সংখ্যালঘিষ্ট হওয়ায় আমাদের এই অবস্থা হইবে'! ফরমাইলেন, 'না। তখন সংখ্যায় তোমরা বহু হইবে। কিন্তু তোমরা জল প্লাবনের পর বর্ষার নালাগুলির ধারে নিপতিত ফেনার ন্যায় হইয়া পড়িবে'। অর্থাৎ, অত্যন্তই অকর্ম্মণ্য ও পতিত অবস্থা হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের শত্রুদের মন হইতে তোমাদের প্রভাব দূর করিয়া দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করিবেন'। জিজ্ঞাসা করা হইল, 'দুর্ব্বলতা দ্বারা কি বুঝায়?' ফরমাইলেন, 'সংসার -প্রেম এবং মৃত্যুর ভয়'। অর্থাৎ, কাপুরুষতাবশতঃ নেক কাজ হইতে অপসরণ। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, আমার পর এক সময় এমন আলেম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইবে যে, তাহারা আমার হেদায়াতের দ্বারা হেদায়াত লাভ করিবে না, আমার সুন্নত পালন করিবে না এবং আমার উম্মতে এরূপ ব্যক্তিরা পয়দা হইবে যে, তাহাদের অন্তর শয়তানের অন্তর হইবে, যদিও দেহ মানুষেরই থাকিবে। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, আমার উম্মতের উলামাদের অবস্থা আস্মানের নীচে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, 'এলেম উঠিয়া যাইবে, অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইবে। যেনা এবং শরাবখোরীও বর্দ্ধিত হইবে'। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, 'মসীহ্ মাওউদের জামানায় মোসলমানগণের অবস্থা এরূপ হইবে যে, সংখ্যা বহুল হইলেও দেল টেরা হইবে'। অর্থাৎ ঈমান বা আমল কোনটাই ঠিক থাকিবে না। অপর একটি রেওয়ায়াতে বর্ণিত

হইয়াছে, 'আমার উম্মত ৭৩ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে ৭২টি ভ্রান্ত হইবে এবং একটি মাত্র সম্প্রদায় সত্যের উপর কায়েম থাকিবে এবং উহা একটি জামাতবদ্ধ সম্প্রদায় হইবে'। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, 'ঈমান পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে; কিন্তু উহা সুরাইয়া নক্ষত্রে উপনীত হইলেও অর্থাৎ পৃথিবী হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলেও একজন পারশ্য বংশীয় ব্যক্তি উহা তথা হইতে পুনরুদ্ধার করিবেন'।"

উম্মতের শেষ প্রান্তে, তাহাদের মধ্যে মসীহ্ মাওউদের আবির্ভাবকালে, এই অবস্থাই ঘটিবার ছিল। এই চিত্রই বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াআলিহী ওয়া সাল্লাম আখেরী জামানার মোসলমানদের – যাহাদের মধ্যে ইমাম মাহ্দী (আঃ) জাহের হইবেন। এখন, পাঠকগণ নিজে নিজেই বিবেচনা করুন, বর্ত্তমান যুগের মোসলমানগণের অবস্থা হুবহু কি ইহাই নয়? আমরা দাবীপূর্ব্বক বলিতেছি যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের পর কোন সময়েই মোসলমান বর্ত্তমান সময়কার ন্যায় এরূপ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় নাই। এ সম্পর্কে দলীল-প্রমাণ উল্লেখের মোটেই কোন প্রয়োজন নাই। আমলের শিথিল হওয়া ব্যতীত, ধর্ম্ম-বিশ্বাসও আঁধারে প্রবেশের দরুন মোসলমান ৭২ ফির্কায় বিভক্ত। পরস্পর ইহারা ধর্ম্ম-মতের ঘোর বিরোধী। অন্য কথা যাইতে দিলেও স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা, –মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র গুণাবলী ও অস্তিত্ব সম্বন্ধেও ভীষণ মতবিরোধ পাওয়া যায়। ঈমানের অবস্থা এই যে, শতকরা ৯৯ জন মোসলমানের অন্তর হইতে ঈমান সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। খোদা আছেন বলিয়া মৌখিক স্বীকৃতি থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে, অন্তরে খোদার বিশ্বাস পাওয়া যায় না। অন্তর গোপন নাস্তিকতার কবলগ্রস্ত। মাত্র মৌখিকভাবে ও গতানুগতিকভাবে প্রচলিত বিশ্বাস স্বরূপে আল্লাহ্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। কিন্তু একটু তাকাইয়া দেখিলে পরিষ্কার জানা যায় যে, তাঁহারা আল্লাহ্তা'আলার অস্তিত্ব সম্পর্কে শত শত সন্দেহের কুহকে নিপতিত। তারপর, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের মহাকল্যাণময় সত্তা সম্বন্ধেও তাঁহাদের ঈমান কোন মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়। সামান্য আলোড়নেই তাহা টলায়মান হইয়া পড়ে। পারত্রিক জীবন, পাপ-পুণ্যের প্রতিফল এবং ফেরেশ্তাদের অস্তিত্ব সকলই কাল্পনিক বিষয়ে পর্য্যবসিত।

তারপর, এবাদতের যে সকল পথে পদক্ষেপের ফলে পূর্ব্ববর্ত্তী মোসলমানগণ খোদাতা'আলার দরবারে পৌঁছিতে সমর্থ হইতেন, তাহা ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়। যে শের্কের বিরুদ্ধে সমগ্র কোরআন শরীফ ভরপুর, মোসলমানদের কার্য্য-কলাপে তাহাই ফুটিয়া উঠিতেছে। অর্থ-প্রীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। খোদাতা'আলার অস্তিত্বের প্রতি নির্ভর করিবার মত স্থান ধন-দৌলতকে দেওয়া হইতেছে। কবরসমূহে যাইয়া সেজদা করা হয়। মদ্যপান, ব্যভিচার এবং জুয়ার বাজার গরম। সুদ নেওয়া-দেওয়া তথা 'খোদা-তা'আলার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হওয়া' বলিয়া উল্লিখিত হওয়া সত্ত্বেও মাতৃস্তন্যের ন্যায়

পেয় হইয়া পড়িয়াছে। মোসলমানদের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি দুর্ব্বল ও খোকলা হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয়ান শক্তিগুলি উহাদিগকে তাহাদের গ্রাসস্বরূপ মনে করিতেছে। বহিরাক্রমণের দ্বারা ইসলাম এরূপ ক্লিষ্ট হইতেছে যে, ইহা যেন আজও নাই, কালও নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। নবীদের সর্দ্দার মোহাম্মদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ও সাল্লামের উপর জঘন্য হইতে জঘন্যতম, অতিশয় আপত্তিকর আক্রমণসমূহ করা হইতেছে। তাঁহার পবিত্র-চিত্ত পুণ্যময়ী সহধর্ম্মিণীগণের প্রতি নানা প্রকার অপবাদ আরোপ করা হইতেছে। ইসলামের শিক্ষাকে বিকটরূপে রূপায়িত করিয়া হাস্য-বিদ্রূপ করা হইতেছে। ক্রুশ-ধর্ম্ম প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে এবং নাস্তিকতা মনোহর সাজে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ ইসলাম বিচারশূন্য তুমুল বাত্যার মুখে নিপতিত। খোদার হাত ইহার উদ্ধারের জন্য সম্প্রসারিত না হইলে, ইহা তীরে ভিড়া অসম্ভব। ইত্যাকার অবস্থায় ইসলামের সাহায্যার্থে আলেমগণের দাঁড়ানো কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা ঘুম-ঘোরে অভিভূত। আরও আক্ষেপের কথা তাঁহারা নিজেরাই সহস্র সহস্র রোগে সংক্রামিত। তাঁহাদের ঈমানের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে, খোদা পানাহ্। কয়েক পয়সার জন্য ঈমান বিক্রয়ের প্রস্তুতি পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল যাবতীয় অবস্থা উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, এই সম্বন্ধেই আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময়েই ইসলামের শ্রেষ্ঠতম ও মহাপ্রতাপান্বিত মোজাদ্দেদ মসীহ্-মাহ্দীর আগমন সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। কারণ এইরূপ ঘোর প্রয়োজন কালেও আল্লাহ্-তা'আলার তরফ হইতে কোন ইস্‌লাহ্‌কারী (কোন সংস্কারক) আবির্ভূত না হইলে –নাউযুবিল্লাহ্– খোদাতা'আলার এই যে ওয়াদা, তিনি কোরআন ও ইসলামের হেফাযত করিবেন এবং দীনের খেদমতের জন্য খলীফা এবং মোজাদ্দেদগণকে দাঁড় করাইতে থাকিবেন, ইহা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ষষ্ঠ আলামত ঃ

ষষ্ঠ আলামত মসীহ্ ও মাহ্দীর এই বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার সময়ে নির্দ্দিষ্ট তারিখ-দ্বয়ে চন্দ্রের ও সূর্য্যের গ্রহণ হইবে। ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ–

"ইন্না লে-মাহ্দীনা আয়াতায়নে লাম্ তাকুনা মুন্‌যু খাল্‌কিস্ সামাওয়াতে ওল্ আর্দে, ফাইয়ান্-কাসেফুল্ কামারু লে আওওয়ালি লাইলাতেম্ মিন্ রামযানা ও তানকাসেফুস্-শামসু ফিন্‌নিসফে মিন্‌হু" ('দারকুত্‌নি', ১ম জেল্‌দ, ১৮৮পৃঃ)।

অর্থাৎ, "আমাদের মাহ্দীর জন্য দুইটি নিদর্শন নির্দ্দিষ্ট আছে। আসমান জমিন সৃষ্টির পর এই নিদর্শন অন্য কোন 'মামুর,' কোন প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম-সংস্কারকের সময়ে প্রকাশ পায় নাই। তন্মধ্যে একটি হইল প্রতিশ্রুত মাহ্দীর সময়ে রমযান মাসের মধ্যেকার প্রথম তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হইবে (অর্থাৎ, চন্দ্রের ১৩ই তারিখে। কারণ, চন্দ্র

গ্রহণের জন্য খোদাতাআলা কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রাকৃতিক বিধানে ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই তারিখত্রয় নির্দ্ধারিত আছে। বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই ইহা অবহিত আছেন) এবং সূর্য্য গ্রহণ হইবে মধ্য তারিখে।" (অর্থাৎ, সেই রমযানেরই ২৮ তারিখে। কারণ, সূর্য্যগ্রহণের জন্য প্রাকৃতিক বিধানে ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে তারিখত্রয় নির্দ্ধারিত আছে।) বিশ্ববাসী জানেন যে, ১৩১১ হিজরী মোতাবেক ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ (বাং ১৩০০ সন) এই নির্দশনদ্বয় অত্যন্ত উজ্জ্বলাকারে পূর্ণ হইয়াছে।

হিজরী ১৩১১ সনের রমযান মাসে প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী চন্দ্রগ্রহণের নির্ধারিত তিন তারিখের মধ্যে প্রথম তারিখ, অর্থাৎ ১৩ই তারিখের রাত্রিতে চন্দ্র-গ্রহণ সংঘটিত হয় এবং এই মাসেই সূর্য্য-গ্রহণের জন্য প্রাকৃতিক বিধানানুসারে নির্ধারিত তারিখত্রয়ের মধ্য-তারিখ, অর্থাৎ ২৮শে তারিখ দিনের বেলায় সূর্যগ্রহণ হয়। এই নিদর্শন দুই বার প্রদর্শিত হয়। প্রথমে পূর্ব্ব গোলার্ধে, এবং পরে পশ্চিম গোলার্ধে অর্থাৎ আমেরিকাতেও প্রদর্শিত হয়। উভয় সময়েই হাদীসোক্ত নির্ধারিত তারিখদ্বয়েই ইহা প্রকাশিত হয়। তারপর, শুধু হাদীসেই এই নিদর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে, এমন নয়। কোরআন শরীফেও ইহার প্রতি ইশারা পাওয়া যায়। 'সূরাহ্ কেয়ামাতের' 'প্রথম রুকূতে' বলা হইয়াছে ঃ

"ওয়া খাসাফাল্ কামারু ওয়া জুমেয়াশ্ শামসু ওয়াল্ কামারু" অর্থাৎ, "চন্দ্র গ্রহণ হইবে এবং এই গ্রহণের সহিত সূর্য্যও চন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইবে।" অর্থাৎ, উহারও এই মাসেই গ্রহণ হইবে।

এখন দেখুন, কেমন পরিষ্কারভাবে এই আলামত পূর্ণ হইয়া আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, এই সেই সময়, যখন মাহ্দী আসিবার প্রতিশ্রুতি ছিল। কারণ তাঁহার আবির্ভাবকালীন লক্ষণ পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ আপত্তিপূর্ব্বক বলেন যে, এই হাদীস 'মরফূ' (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা সহ বর্ণিত) নয়। ইহার রেওয়ায়াতের শৃঙ্খল ইমাম বাকের পর্যন্ত পৌঁছিয়াই শেষ হইয়া যায়। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছায় না। তারপর, এই হাদীসে চাঁদের গ্রহণ রমযানের প্রথম রাত্রিতে এবং সূর্য্যের গ্রহণ রমযান মাসের মধ্য তারিখে হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। অথচ, চন্দ্র গ্রহণ ১৩ই তারিখে এবং সূর্য্য গ্রহণ ২৮শে তারিখে সংঘটিত হয়। এই সকল আপত্তির উত্তর এই ঃ অবশ্য, হাদীসের পরিভাষানুসারে এই হাদীস বাহ্যিকভাবে 'মৌকুফ' (অর্থাৎ, ইহার বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খল ধারাবাহিকভাবে শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছায় নাই)। কিন্তু মোহাদ্দেসগণের ব্যবহৃত পরিভাষা অনুসারে ইহা বিশেষ প্রকার রেওয়ায়াতাকারী কে? অন্ততঃ ইহাও বিবেচনা করা তো উচিত। তিনি আহ্লে-বয়ত নবুবির (সঃ) একজন অত্যুজ্জ্বল রত্ন নহেন কি? ইহাও সকলেই জানেন যে, আহ্লে বয়তের ইমামগণের এই রীতি ছিল যে, ব্যক্তিগত গৌরব ও গুরুত্ববশতঃ বর্ণনাকারীদের শৃঙ্খল নাম বনাম আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামা পর্যন্ত পৌঁছানো তাঁহারা জরুরী মনে করিতেন না। তাঁহাদের এই অভ্যাস অতি খ্যাত। যাহা

হউক, এই হাদীস আমরা তৈয়ার করি নাই। ইহা ১৩০০ বৎসরের পূর্ব্বেকার। তারপর দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই যে, মাসের প্রথম তারিখে ও মধ্য তারিখে যথাক্রমে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ হওয়া 'সুন্নতুল্লাহ্'র বিরুদ্ধ–ইহা ঐশী-নিয়ম তথা প্রাকৃতিক বিধানের বিরোধী। প্রাকৃতিক বিধান আল্লাহ্র তৈরী। প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে চন্দ্র-গ্রহণ মাসের ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই তারিখের কোন তারিখে এবং সূর্য্য গ্রহণ ২৭শে ২৮শে ও ২৯শে তারিখগুলির মধ্যে কোন তারিখে সংঘটিত হওয়াতেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং, প্রথম তারিখ দ্বারা এই সকল তারিখের প্রথম এবং মধ্যতারিখ দ্বারা ইহাদের মধ্যম তারিখই বুঝায়। 'মাসের' প্রথম ও মধ্যম তারিখ কখনো বুঝায় না। ইহার আরো একটি প্রমাণ এই যে, আরবী ভাষায় মাসের প্রাথমিক রাত্রিগুলির চাঁদকে 'হেলাল' বলা হয়। কিন্তু হাদীসে 'কমর' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কমর' বলিতে চতুর্থ তারিখ হইতে পরবর্ত্তী রাত্রিগুলির চাঁদকে বুঝায়। সুতরাং পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, প্রারম্ভিক রাত্রিগুলিকে বুঝান কখনো উদ্দেশ্য নয়। তারপর, চিরদিনই মোসলমান উলামা এই তারিখগুলির এই অর্থই করিয়া আসিতেছেন, যাহা আমরা করিয়াছি। এযুগেও মৌলবী মোহাম্মদ লেক্ষুকে সাহেব এই নিদর্শন জাহের হওয়ার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন ঃ

"তৈরহুঈঁ চান্দ সাতিহুঈঁ সুরজ গিরহণ হুসি ইস্‌সালে, আন্দর মাহে রমযান লেখা ইএহ্ হিক রেওয়ায়াতে।"–"একই রমযান মাসে ১৩ তারিখে চন্দ্র গ্রহণ এবং ২৭ তারিখে সূর্য গ্রহণ হইবে।"

এই কাব্যপদে মৌলবী সাহেব ভ্রমবশতঃ ২৮ তারিখের স্থলে ২৭ তারিখ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে নীতি অনুসরণ করিয়াছি, তিনিও উহা অবলম্বনেই ইহার অর্থ করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, বাস্তবিক ঘটনাও ইহারই সমর্থনপূর্ব্বক প্রথম তারিখে অর্থাৎ ১৩ই তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং মধ্য তারিখে অর্থাৎ ২৮শে তারিখে সূর্য্য-গ্রহণ হইয়াছে।

বস্তুতঃ এই নিদর্শন অতি স্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে কোন বাহানা করিবার জো নাই। বিশ্বস্ত উপায়ে জানা গিয়াছে যে, এই নিদর্শন প্রকাশ হইলে পর কোনো কোনো মৌলবী সাহেব তাঁহাদের উরুতে থাপড়ের পর থাপড় দিয়া বলিতেছিলেন, "এখন খলকত গোমরাহ্ হইল, এখন খলকত গোমরাহ্ হইল।" ইহা এ কথার উজ্জ্বল প্রমাণ যে, সত্যই রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলিয়াছিলেন ঃ– *"ওলামাউহুম্ শর্‌রু মান্ তাহ্‌তা আদীমিস্ সামায়ে।"*

অর্থাৎ, "মসীহ্ মাওউদের সময়ে আলেমগণ পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী হইবেন।" এক দিকে খোদার নিদর্শন জাহের হইল। অপর দিকে মৌলবী সাহেবান এইজন্য শোকাভিভূত হইলেন যে, এই নিদর্শন প্রকাশ পাইল কেন? ইহার ফলে তো লোকেরা তাঁহাদের ফাঁদ হইতে বাহির হইয়া মির্যা সাহেবকে মানিতে আরম্ভ করিবে।

আক্ষেপ, শত আক্ষেপ! হে দুর্ভাগা মৌলবী সম্প্রদায়, আপনারা বহু সরল প্রকৃতির, খোদার বান্দা গোম্‌রাহ্ করিয়াছেন। আপনাদের প্ররোচনায় লোকেরা দেখিয়াও দেখে নাই– শুনিয়াও শোনে নাই, বুঝিয়াও বুঝে নাই। খোদাকে ভয় করুন। এক দিন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে।

সপ্তম আলামতঃ

সপ্তম আলামত সম্বন্ধে বলা হইয়াছিল যে, মসীহ্ মাওউদের জমানায় 'দাব্বাতুল-আরদ্' বাহির হইবে। ইহা লোকদিগকে দংশন করিবে, মোমেন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিবে এবং দেশব্যাপী ঘুরিয়া বেড়াইবে। কোরআন শরীফেও ইহার উল্লেখ আছে। খোদাতাআলা বলেন ঃ–

"ও ইযা ওকাআল্-কাউলু আলায়হিম আখ্-রাজ্না লাহুম্ দাআব্বাতাম্ মিনাল্ আরদে তুকাল্লেমুহুম্ আন্নান্-নাসা কানু বে-আয়াতেনা লা ইউমেনূন" ('সূরাহ্ নমল্', রুকূ ৬)।

অর্থাৎ "যখন (মসীহ্ মাওউদকে পাঠানোর দ্বারা) খোদার 'হুজ্জত'–তাঁহার যুক্তি তাহাদের জন্য পূর্ণ হইবে, তখন আমরা পৃথিবীতে এক প্রকার জীবাণু সৃষ্টি করিব। উহারা লোকদিগকে দংশন করিবে। ইহা এ কারণে হইবে যে, লোকেরা খোদার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনিবে না।" তারপর, হাদীস শরীফেও কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হওয়ার আলামতস্বরূপে "দাব্বাতুল্-আরদের' উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, মসীহ্ মাওউদের জামানায় এক প্রকার কীট বাহির হইবে। উহারা দেশব্যাপী ঘূর্ণন করিবে এবং মোমেন ও কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিবে।

এখন দেখুন, হযরত মির্যা সাহেবের সময়ে প্লেগের প্রকোপ হওয়ায় এই আলামত কীরূপ স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। প্লেগ এক প্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় সকলেই স্বীকার করেন। 'দাব্বাতুল্-আরদ' অর্থও 'ভূমির কীট'। কোরআন শরীফে অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছেঃ "দাব্বাতুল্ আর্‌দে তাকুলু মিন্‌সায়াতাহু" (সূরাহ্ সাবা, রুকূ ২) অর্থাৎ, এক প্রকার ভূ-কীট হযরত সুলায়মানের (আঃ) যষ্টি ভক্ষণ করিতেছিল।" এখানে মোফাস্‌সেরগণ "দাব্বাহ্" অর্থ "কীট" করেন। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র সময়ে যে "দাব্বাতুল-আরদ" প্রকাশ পাইবে, উহার অর্থ "কীট" ব্যতীত আর কিছু করিবার সঙ্গত কারণ নাই। তারপর, রেওয়ায়াতসমূহে যে সকল আলামত 'দাব্বাতুল্-আরদের' বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই রূপাত্মক ও অলংকারমূলক। সত্যই, প্লেগ 'দাব্বাতুল-আরদ' (ভূস্থ জীবাণু)। ইহা হযরত মসীহ্ মাওউদের সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া 'হক্' এবং 'বাতেলের' মধ্যে, সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছে। বাস্তবিক, ইহা কাফেরদের মাথাকেও চিহ্নিত করিয়াছে এবং মোমেনদের মাথাকেও চিহ্নিত করিয়া তদ্বারা উভয় সম্প্রদায়েরই পারস্পরিক পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছে। ইহা একটি সত্য ঘটনা যে, হযরত

মসীহ্ মাওউদের (আঃ) জামানায় প্লেগের ফলে জামাতে আহ্‌মদীয়ার যে উন্নতি হয়, তাহা অন্য কোন উপায়ে হয় নাই। এই মহামারী হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধবাদীদিগকে বাছিয়া বাছিয়া আক্রমণ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, হযরত মির্যা সাহেব এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে ইহার ক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণরূপে বাঁচানো হয়। দেশে যখন প্লেগ প্রকাশ পাইয়াছিল, তখন কোন কোন দিন কয়েক শত ব্যক্তির বয়াতের দরখাস্ত হযরত মির্যা সাহেবের নিকট পৌঁছিত। মানুষ তখন আত্মহারা হইয়া তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আসিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রথম কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত আহমদীগণের সংখ্যা কয়েক শতের অধিক পৌঁছে নাই। কিন্তু প্লেগ, তথা 'দাব্বাতুল্-আরদ' প্রাদুর্ভূত হওয়ার পর ১৯০০ খৃঃঅব্দ হইতে দেখিতে দেখিতে বয়াত গ্রহণকারীদের সংখ্যা সহস্র সহস্র নয়, কয়েক লক্ষে উপনীত হয়। অনন্তর, ইহার জন্য আল্লাহরই যাবতীয় প্রশংসা।

প্লেগে কোন কোন আহমদীও প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া আপত্তি করা, অজ্ঞানতার পরিচায়ক। কারণ, প্রথমতঃ তুলনামূলক উপায়ের দ্বারা দেখিতে হইবে যে, আহমদী ও গয়ের-আহমদীর মধ্যে প্লেগ আক্রমণের অনুপাত কি ছিল। তারপর, আঁ হযরতের (সঃ) যুদ্ধাবলীতে কি মোসলমান 'শহীদ' হন নাই? অথচ, ঐ সকল যুদ্ধ কাফেরদের জন্য 'এলাহী আযাব' ছিল। সুতরাং, দেখিতে হইবে যে, প্লেগের ফলে কোন্ সম্প্রদায়ের উন্নতি হইয়াছিল এবং কোন্ সম্প্রদায়ের অবনতি ঘটিয়াছিল? আকস্মিকরূপে যে সকল বিরল ঘটনা আহমদীগণের মধ্যে সংঘটিত হয়, তাহা 'শাহাদত' ছিল। এই সকল শাহাদত প্রাপ্তির সৌভাগ্য আধ্যাত্মিকতার রণাঙ্গণে খোদাতা'আলা আমাদের কোন কোন সিপাহীকে প্রদান করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জমাতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং আল্লাহ্‌তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সকলেই সর্ব্বতোভাবে 'মহ্‌ফুয' ছিলেন। তাঁহারা সকলেই প্লেগ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদে ছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদিতায় যাহারা শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই ইহার কবলগ্রস্ত হয়। সবচাইতে বড় কথা, এই মহামারী অলৌকিক উপায়ে আহমদীয়া জমাতের উন্নতি আনয়ন করে। শত্রুদের সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং আমাদের সংখ্যা বর্ধিত হয়। বস্তুতঃ 'দাব্বাতুল-আরদ' প্রাদুর্ভূত হইয়া ইহার কাজ সম্পাদন করিয়া গিয়াছে। এখন, কেহ খোদাতা'আলার হুযূরে রোদন, ক্রন্দন, গিরিয়াজারি এবং দোয়া করিতে করিতে নাসিকা ক্ষয় করিলেও, অন্য কোন 'দাব্বাতুল্-আরদ' তাহার মরজি মোতাবেক জাহের হইবে না। যাহা জাহের হওয়ার ছিল, হইয়াছে। অবশ্য, যাহাদের মস্তিষ্কে অজ্ঞানতার এবং স্বেচ্ছাচারিতার এক প্রকার 'দাব্বাতুল্-আরদ' প্রচ্ছন্ন আছে, এবং উহা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে- খোদা করুন, যেন উহাও বাহির হইয়া যায়, এবং তাহারাও কিছুটা স্বস্তি লাভ করে।

অষ্টম আলামত ঃ

অষ্টম আলামত এই যে, মসীহ্ মাওউদ দামেস্কের পূর্ব্ব দিকে একটি শ্বেত মিনারার নিকটে নাযেল হইবেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেনঃ–

"ইআন্‌যেলু ইন্‌দাল মিনরাতিল্ বায়যাএ শারকিয়া দামেশ্‌ক" (মিশকাত)।

"মসীহ্ মাওউদ দামেস্কের পূর্ব্ব দিকে সৌফেদ মিনারার পার্শ্বে অবতীর্ণ হইবেন।" এ সম্বন্ধে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে, এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মসীহ্ মাওউদ আকাশ হইতে নাযেল হইবেন না, বরং তিনি এই উম্মতেরই একজন ব্যক্তি মাত্র। সুতরাং, মিনারার পার্শ্বে নাযেল হওয়ার কখনো এই অর্থ হইতে পারে না যে, তিনি বাস্তবিক আকাশ হইতে কোনো মিনারার উপর অবতরণ করিবেন এবং মিনারা হইতে পরে নীচে অবতরণ করিবেন। দ্বিতীয়, এই হাদীসে মিনারার "উপর" অবতীর্ণ হওয়ার কোনো কথা নাই। বলা হইয়াছে, তিনি মিনারার পার্শ্বে অবতরণ করিবেন। অর্থাৎ, তিনি যে অবস্থায় অবতরণ করিবেন, শ্বেত মিনারা তাঁহার পার্শ্বে থাকিবে। ইহা বলা আবশ্যক, কাদিয়ানে (পাঞ্জাব, ভারত) যেখানে হযরত মির্যা সাহেবের বাড়ী অবস্থিত, উহা দামেস্কের ঠিক পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। অর্থাৎ, ইহা দামেস্কের ঠিক পূর্ব্বে একই সমাক্ষ রেখায় অবস্থিত। সুতরাং, দামেস্কের পূর্ব্ব দিক হওয়ার বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্নই উঠে না। রহিল "মিনারা" শব্দ। ইহার অর্থ মসীহ্ মাওউদের আগমন এমন যুগে হইবে যে, তখন যাতায়াত ও মেলামেশার উপকরণের আধিক্য হইবে। অর্থাৎ, রেলগাড়ী, জাহাজ, ডাক, তার, বেতার, মুদ্রণ যন্ত্র প্রভৃতির ফলে ইসলাম প্রচারের কাজ অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িবে, যেন তিনি এক মিনারার উপর দাঁড়ানো আছেন–তাহার আওয়াজ দূর দূরাপি পর্য্যন্ত পৌছিতেছে এবং তাঁহার জ্যোতিঃ ত্বরায় বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িতেছে, এই প্রকার হইবে।

কারণ, মিনারার ইহাই বিশেষত্ব। অন্য কথায়, ইহার অর্থ এই নয় যে, মসীহ্ মাওউদের অবতরণ মিনারার 'উপরে' হইবে, বরং ইহার অর্থ মসীহ্ মাওউদ যে অবস্থায় আবির্ভূত হইবেন, উহাতে শ্বেত মিনারা তাঁহার 'পার্শ্বে' থাকিবে। অর্থাৎ, ধর্ম্ম প্রচারের উৎকৃষ্টতম উপায়গুলি তিনি প্রাপ্ত হইবেন। এই অর্থের দিক হইতে "পূর্ব্বদিক" দ্বারা ইহারও প্রতি ইশারা থাকিতে পারে যে, মসীহ্ মাওউদের সূর্য্য পূর্ব্ব গগনে অতি মনোহর অবস্থায় উদিত হইবে এবং ইহার কিরণমালা অতি সত্বর পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়াইবে। তারপর, 'মিনারা' দ্বারা ইহাও বুঝাইতে পারে যে, উচ্চ স্থানে কোন বস্তু থাকিলে উহাকে যেমন সকলেই দেখিতে পারে এবং দূর দূরান্তের অধিবাসীরাও উহাকে দেখিতে পায়, সেইরূপ মসীহ্ মাওউদের কদমও এক 'মিনারার' উপর থাকিবে। তিনি এরূপ উজ্জ্বল ও জ্বলন্ত যুক্তি-প্রমাণসহ আবির্ভূত হইবেন যে, মানুষ নিজেই চক্ষু বন্ধ না

করিলে এবং তাঁহার আলোকমালা হইতে মুখ না ফিরাইলে, নিশ্চয় সকলেই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিবে। কারণ, তিনি থাকিবেন এক উচ্চ স্থানে।

'মিনারার' সহিত 'শ্বেত' শব্দ যোজনায়ও বিশেষ কৌশল বিদ্যমান। যদিও সকল মিনারাই দূর হইতে দেখা যায়, কিন্তু উহা শ্বেত বর্ণ হইলে বিশেষতঃ চমকপ্রদ হয় এবং দর্শকের সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অথবা, "শ্বেত" শব্দে ইহা বুঝায় যে, মসীহ্ মাওউদের উর্ধ্ব অবস্থান নির্দ্দোষ প্রকৃতির হইবে। অর্থাৎ তিনি কোন পার্থিব জাঁকজমকের দরুন বা পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তিবশতঃ কোন উচ্চ স্থানে থাকিবেন না—তাঁহার উচ্চ অবস্থান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধভাবে আধ্যাত্মিক হইবে এবং পবিত্র ও মোকাদ্দস আকৃতিতেই তিনি লোকের নয়ন-গোচর হইবেন, যদি লোকেরা একদর্শিতায় ও আঁধার-প্রিয় হওয়ায় আপনা-আপনিই তাহাদের চক্ষু বন্ধ না করে। ইহার বাহ্যিক দৃষ্টান্ত এইরূপ। যদি কেহ তাহার গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া উহার মধ্যে বসে, সূর্য্য উদয় হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রকোষ্ঠে অন্ধকারই থাকিবে। ইহাতে সূর্য্যের কোনই দোষ নাই। সেই প্রকার, মনের কপাটগুলি কেহ রুদ্ধ করিলে, আধ্যাত্মিক সূর্য্য কীরূপে তাহাকে আলো পৌঁছাইতে পারে? হযরত মির্যা সাহেব এই আলামত পূর্ণ হওয়ার সম্বন্ধে তাঁহার একটি কবিতার পদে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ–

"আয্ কাল্‌মায়ে মিনারায়ে শারকী আজব মদার, চুঁ খোদ্ যে মাশ্‌রেক আস্ত তজল্লিয়ে নাইয়ারাম্" অর্থাৎ, "রেওয়ায়াতগুলিতে পূর্ব্ব মিনারার উল্লেখ থাকায় হয়রান হইও না। কেননা, আমার সূর্য্য পূর্ব্ব দিকেই উদয় হইয়াছে।"

নবম আলামত ঃ

নবম আলামত এই যে, হাদীস শরীফে মসীহ্ মাওউদের আকৃতি, তাঁহার 'হুলিয়া' বর্ণিত হইয়াছে। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ–

"বাইনামা আনা নাএমুন্ আতুফু বিল্-কা'বাতে ফা-ইযা রাজুলুন্ আদামু সাব্‌তুশ্‌শা'রে ইআন্‌তেফু আও ইউহ্‌রাকু রাসুহু মাআন্ কুলতু মান্ হাজা, কালুব্‌নু মার্‌ইয়্যামা সুম্মা যাহাবতু আল্‌তাফতু ফা-ইযা রাজুলুন্ জাসিমুন্ আহ্‌মারু জা'দুররাসে আ'ওয়ারুল্ আইনে কায়ান্না আইনাহু এনাবাতুন তাফিইয়াতুন্ ফাকুল্‌তু মান হাযা কালু হাযাদ-দজ্জালু" ('সহীহ্ বুখারী,' কেতাব বদউল খল্‌ক)।

তারপর আরো বলেন ঃ–

"ইয়ান্‌যেলু ইন্‌দাল্ মিনারাতিল্ বাইযায়ে শারকীয়া দামেশ্‌কা বাইনা মাহ্‌যুদাতাইনে ওয়াযেয়ান কাফ্‌ফাইহে আলা আজনেহাতে মালাকাইনে ইযা তা' তায়া রাসাহু কাতারা ও ইযা রাফাআহু তাহাদ্দারা মিনহু মিস্‌লা জুম্মানিন্ কাল্‌লু'লুয়ে ফালা ইয়াহেল্লু লেকাফেরিন্ ইয়াজেদু মিন্ রীহে নাফসেহী ইল্লা মাতা" (সহীহ্ মোস্‌লেম, ২য় জেল্‌দ)।

"আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি কা'বার তওয়াফ করিতেছি। তখন এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ গোধূম বর্ণ ছিল। চুলগুলি লম্বা ও সোজা। তাঁহার মাথা হইতে জল-বিন্দুগুলি টপ্ টপ্ পড়িতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইনি কে'? আমাকে বলা হইল, 'ইনি ইব্‌নে মরিয়ম'। তারপর, আমি একজন স্থূলকায় ব্যক্তি দেখিতে পাইলাম। লাল বর্ণ। তাহার মাথার চুলগুলি কোঁকড়ানো। তাহার এক চক্ষু অন্ধ। তাহার একটি চোখ যেন আঙ্গুরের ন্যায় ফোলা। আমাকে বলা হইল যে, সে দাজ্জাল। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মসীহ্ মাওউদ দামেস্কের পূর্ব্ব দিকে শ্বেত মিনারার নিকট অবতীর্ণ হইবেন, এই অবস্থায় যে, তিনি দুইটি জরদ বর্ণের চাদর দ্বারা আবৃত থাকিবেন এবং তিনি তাঁহার বাহুদ্বয় দুই ফেরেশ্‌তার স্কন্ধের উপর ধারণ করিবেন। তিনি মাথা নীচু করিলে উহা হইতে পানির ফোঁটা পড়িবে এবং তিনি মাথা উঠাইলে উহা হইতে মুক্তা ঝরিবে। সকল কাফেরই তাঁহার শ্বাস স্পর্শে প্রাণ ত্যাগ করিবে।"

এই যে হুলিয়া হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, দেখুন, কেমন সুন্দরভাবে হযরত মির্যা সাহেবের মধ্যে পাওয়া যায়। জগদ্বাসী অবগত আছেন, তাঁহার বর্ণ গোধূম বর্ণ ছিল। তাঁহার কেশ রেশমের ন্যায় মসৃণ, সোজা ও দীর্ঘ ছিল। সোজা এমন ছিল যে, রেশমের এক একটি সুতার ন্যায় পৃথক পৃথক আকারে দেখা যাইত। তারপর, তিনি দুই জরদ চাদরে আবৃত ছিলেন। অর্থাৎ, তাঁহার দুইটি রোগ ছিল এবং মসীহ্ ও মাহ্‌দী হওয়ার দাবী হইতে লইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গী ছিল। হযরত মির্যা সাহেব বলেন ঃ–

'দুইটি রোগ আমার সহিত লাগিয়াই আছে। একটি দেহের উর্দ্ধ ভাগে এবং অপরটি দেহের নিম্নভাগে। উপরিভাগে হইল শিরঃপীড়া এবং অধঃ ভাগে হইল বহুমূত্র। এই উভয় রোগই তখন হইতেই আছে, যখন হইতে আমি আমার 'মামুর মিনাল্লাহ্,' (আল্লাহ্‌র নিকট হইতে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম সংস্কারক) হওয়ার দাবী প্রচার করিয়াছি। আমি এগুলির জন্য দোয়াও করিয়াছি। কিন্তু নিষেধাত্মক উত্তর পাইয়াছি" ('হকীকাতুল্ ওহী', ৩০৭ পৃঃ)।

স্বপ্ন-রাজ্যে জরদ বর্ণের কাপড়ের অর্থ রোগ। ইহা এমন স্পষ্ট সত্য যে, ইহার ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। ('তা'তীরুল্ আনাম' ২য় খণ্ড, ৪১ পৃঃ)। হাদীসের অবশিষ্টাংশ, অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদের নিশ্বাসে কাফের মরিবে এবং তাঁহার মাথা হইতে জলবিন্দু ও মুক্তা ঝরিবে প্রভৃতি সম্বন্ধে আলামত সংক্রান্ত আলোচনার শেষে একটি সংক্ষিপ্ত নোট সন্নিবিষ্ট করিব। এগুলি হুলিয়ার অন্তর্গত নয়। ইহারা সাধারণ আলামতসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

মসীহ্‌র অবতরণ সম্বন্ধে এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী

এখন যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-এর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দীর নযূল (অবতরণ) সংক্রান্ত লক্ষণাবলীর আলোচনা-পর্ব সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেহেতু এর পরবর্তী আলোচনা (অর্থাৎ নযূলের দশম লক্ষণের বর্ণনা) শুরু করিবার পূর্বে হযরত

মির্যা সাহেবের একটি উদ্বৃতি লিপিবদ্ধ করা আবশ্যকীয়, যে উদ্ধৃতিটিতে তিনি হযরত ঈসার সশরীরে পুনরাগমন তথা অবতরণের আকীদা সম্পর্কে একটি অতি জোরালো ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

"আকাশ হইতে প্রতিশ্রুত মসীহের অবতরণ শুধু একটি মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রাখিবে, কেহই আকাশ হইতে অবতরণ করিবে না। আমাদের যত সব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছেন, তাঁহারা সকলেই পরলোক গমন করিবেন এবং তাঁহাদের কেহই মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবেন না। তারপর তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়মপুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবে না। তারপর, তাহাদের সন্তানেরাও মরিবে। তাহারাও মরিয়মপুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তারপর, তাহাদের সন্তানেরাও মরিবে। তাহারাও মরিয়মপুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইবে - ক্রুশের প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে, - বিশ্ব-পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়াছে কিন্তু মরিয়মপুত্র ঈসা (আঃ) আজও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িবেন এবং আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা নবী (আঃ)-এর অপেক্ষারত কি মুসলমান কি খৃষ্টান, সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হইয়া আকাশ হইতে অবতরণের এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম (ইসলাম) ও একই ধর্ম-নেতা (সঃ) হইবেন। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অতঃপর আমার দ্বারা বীজ বপিত হইয়াছে, এখন ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হইবে। কেহ ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না" ('তাজকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন,' ১৯০৩ সনে মুদ্রিত)।

মসীহ্ মাওউদের কাজ ঃ

দশম আলামত ঃ

দশম আলামত বলা হইয়াছিল মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন, শূকর কতল করিবেন, দাজ্জাল বধ করিবেন এবং অন্যান্য ধর্মসমূহের উপর ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিবেন। এমন কি, সূর্য্য পশ্চিম দিক হইতে উদয় হওয়া আরম্ভ করিবে। মসীহ্ মাওউদ যাবতীয় মত-বিরোধের সত্য সত্য ফয়সালা করিবেন। হারানো ঈমান আবার পৃথিবীতে কায়েম করিবেন এবং বহু অর্থ বিতরণ করিবেন। কিন্তু লোকেরা সেই অর্থ গ্রহণ করিবে না। হাদীসসমূহে উক্ত হইয়াছে যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ–

"ওয়াল্লাহে লা-ইয়ান্‌যেলান্নাবনু মারইয়্যামা হাকামান্ আদ্‌লান্ ফাল্‌ইয়াক্‌সেরান্নাস্ সালীবা ও লাইয়াক্‌তো-লান্নাল্ খিন্‌জির ও লা-ইয়াযা-নাল্ জিয্‌ইয়াতা ও লাআইউৎরা-

কান্নাল্ কালাসু ফালা ইউস্আ আলাইহা ও লা-তায্হাবান্নাশ্ শাহ্নাউ ও আত্তাবাগুযু ও আত্তাহাসুদু ও লা-ইউদ্উআওনা ইলাল্ মালে ফালা ইয়াক্বেলুহু আহাদুন।" ('মোসলেম শরীফ) "ও ফি রেওইআতিন্ ইউফিযুল মালা হাত্তা লা ইআক্বেলুহু আহাদুন।" (বুখারী শরীফ)

দাজ্জাল কতল সংক্রান্ত রেওয়ায়াতের ফারসী তরজমা আহলে-হাদীস সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতা ভূপালের নবাব আল্লামা সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম করিয়াছেনঃ–

"দাজ্জাল চুঁ নযর বঙ্গসা কুনাদ বগুদাযাদ্ চুনাঁচে নমক দরআব বগুদাযাদ ও বগুরিযাদ্।" ('হুজাজুল কেরামাহ্')

"ফাইয়াৎলুবুহু হাত্তা ইউদ্রেকুহু বেবাবিলুদ্দে ফাইয়াক্তুলুহু।" ('মোসলেম') "ও ফি রেওইয়াতিন্ ও তাৎলেউশ-শাম্সু মিন্ মাগরেবেহা।" (মিশকাত) "ও ফি রেওয়াইয়াতিন্ লাও কানাল্ ঈমানু ইন্দাস্ সুরাইয়্যা লনালাহু রাজুলুম্ মিন্ হাউলাএ।" ('বুখারী) "ও কালাল্লাহুতা'লা হুয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিল্হুদা ও দ্বীনিল্ হাক্কে লেইউয্হেরাহু আলাদ্-দ্বীনে কুল্লেহী ও লাও কারেহাল্-মুশ্রেকুন" ('সূরাহ্ তওবা,' রুকূ ৫)।

অনুবাদ ঃ– "খোদার কসম, তোমাদের মধ্যে ইব্নে মরিয়ম নিশ্চয়ই নাযেল হইবেন এবং তিনি তোমাদের মত-বিরোধের সত্য সত্য মীমাংসা করিবেন (অর্থাৎ, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও কর্ম্মাদির ব্যাপারে যে সকল অনৈক্য সৃষ্টি হইবে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ সেগুলির যথার্থ মীমাংসা করিবেন) এবং তিনি নিশ্চয়ই ক্রুশ ভঙ্গ করিবেন, শূকর বধ করিবেন এবং জিযিয়া মৌকুফ করিবেন (এবং ইহার ব্যাখ্যাস্বরূপে বুখারীর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যুদ্ধ রহিত করিবেন) এবং তাঁহার যুগে উষ্ট্রগুলি পরিত্যক্ত হইবে; অর্থাৎ উহাদের পৃষ্ঠে আর ভ্রমণ করা হইবে না। (তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে) প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা দূরীভূত হইবে। মসীহ্ মাওউদ লোকদিগকে ধন-ভাণ্ডারের প্রতি আহ্বান করিবেন, কিন্তু কেহই তাঁহার অর্থ গ্রহণ করিবে না; এবং এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বহু অর্থ বিতরণ করিবেন, কিন্তু কেহই তাহা নিবে না। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, দজ্জাল তাঁহাকে দেখিবামাত্র জলে লবণ দ্রব হওয়ার মত দ্রবীভূত হইয়া পড়িবে। দাজ্জাল তাঁহাকে দেখিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ্ উহার পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক বাবে লুদ্দের নিকট নাগাল পাইবেন এবং উহাকে কতল করিবেন। তাঁহার সময়ে সূর্য্য পশ্চিম দিকে উদয় হইবে এবং ঈমান সপ্তর্ষী মণ্ডলে (সুরাইয়াতে) উঠা স্বরূপ পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিলেও একজন পারশ্য বংশীয় কামেল পুরুষ উহাকে আবার পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনিবেন। (অর্থাৎ, মসীহ্ মাওউদ হারানো ঈমান পৃথিবীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন)। এবং কোরআন শরীফে আল্লাহ্তা'আলা বলিয়াছেন, "আল্লাহ-ই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন, যেন তিনি অন্য ধর্ম্মসমূহের উপর ইহার প্রাধান্য স্থাপন করেন। (এই আয়াতকে

মোফস্সেরগণ মসীহ্ মাওউদের জামানার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং পরিষ্কার লিখিয়াছেন যে, এই ওয়াদা মসীহ্ মাওউদের সময় পূর্ণ হইবে।")

মসীহ্ মাওউদের লক্ষণাবলীর মধ্যে ইহা দশম লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে, যাবতীয় আলামতের ইহাই প্রাণ। কারণ, ইহাতে মসীহ্ মাওউদের কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। কার্য্য দ্বারাই একজন আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-সংস্কারক, একজন রূহানী মোস্লেহের সবচেয়ে বড় পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য আমরা এই আলামতের আলোচনা একটি স্বতন্ত্র, পৃথক অধ্যায়ে করা সমীচীন মনে করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, যদি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মির্যা সাহেব আসিয়া ঐ সকল কাজ করিয়া দেখাইয়াছেন, যাহা মসীহ্ মাওউদের হস্তে সম্পাদিত হওয়া নির্ধারিত ছিল, তবে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহ আর থাকিতে পারে না। অতঃপর, অন্য কোন কল্পিত মসীহ্র অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ বৃথা। কারণ, যদি অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও ধরিয়া নেওয়া হয় যে, হযরত মির্যা সাহেব মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দী নহেন, তথাপি মসীহ্ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহ্দীর জন্য নির্ধারিত কার্য্য তিনি সম্পাদন করায় "আসল" (আমাদের মতে কল্পিত) মসীহ্ ও মাহদী প্রেরণ সম্পূর্ণ বৃথা হইয়া পড়ে। খোদা কখনো কোন নিরর্থক কার্য্য করেন না। তিনি পরম বিজ্ঞ ও কৌশলময়। তাঁহার প্রতি কোন নিরর্থক কার্য্য আরোপিত হইতে পারে না। কিন্তু এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, কোন কোন প্রারম্ভিক কথা বর্ণনা করা অত্যাবশ্যক।

সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন, 'ক্রুশ ভঙ্গ করিবার' অর্থ কী?

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বিবেচনা করিতে পারেন যে, ক্রুশ ভাঙ্গিবার অর্থ মসীহ্ মাওউদ এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত জাহেরী ক্রুশ ভাঙ্গিবেন তাহা কখনো হইতে পারে না। কারণ প্রথমতঃ ইহা একজন খোদা প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম-সংস্কারকের মর্য্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার কার্য্য করিবার ফলে কোন যথার্থ লাভ নাই। ক্রুশ-কাষ্ঠ ভাঙ্গিলেই কি মসীহ্র উপাসনা লোপ পাইবে? বা ইহাতে কি পৃথিবীর যাবতীয় কাঠ শেষ হইয়া যাইবে এবং খৃষ্টানেরা ভবিষ্যতে আর ক্রুশ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না? ভাল মত স্মরণ রাখুন, যে পর্য্যন্ত খৃষ্টান-ধর্ম্মীয় ভ্রান্ত ধারণাগুলির জোর থাকিবে, ক্রুশও থাকিবে। শুধু এই কাষ্ঠ-খণ্ড ভাঙ্গিবার ফলে সন্তুষ্ট হওয়া বালোচিত মনোবৃত্তি বটে। ইহাতে শত্রুদের কৌতুক-কৌতুহল সৃষ্টি ব্যতীত আর কোনই লাভ নাই। সুতরাং ক্রুশ শুধু ইহাতেই ভঙ্গ করা যাইতে পারে, যদি খৃষ্টানদের হৃদয় জয়ের দ্বারা ক্রুশ ধর্ম্মের জোর বিনষ্ট করা যায় এবং শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে উহার অপ্রকৃততা প্রতিপাদন করা হয়। তদবস্থায়, অবশ্য ক্রুশের জাহেরী কাষ্ঠ-ফলকও ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কারণ, মানুষ ক্রুশ সংক্রান্ত বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলে ক্রুশ কাষ্ঠগুলি আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে। তারপর ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, খৃষ্টান-ধর্ম্ম কোন সময় একেবারেই বিলুপ্ত হইবে, এরূপ ধারণা পোষণ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, কোরআন শরীফে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে ঃ *"ও আগ্রাইনা বাইনাহুমুল্ আদাওতা ওয়াল্ বাগ্যাআ ইলা ইয়াওমিল্*

কিয়ামাতে" ('সূরাহ্ মায়েদাহ্,' রুকূ ৯)। "ইহুদী এবং খৃষ্টানদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা আমরা কেয়ামতকাল পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখিব।" এই স্পষ্ট উক্তি হইতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। সুতরাং, ক্রুশ ভাঙ্গিবার কখনো এই অর্থ হইতে পারে না যে, ক্রুশীয় ধর্মের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন হইবে। ইহার অর্থ ইহার শক্তি নাশ হইবে। ইহার প্রাবল্য থাকিবে না। পৃথিবীতে প্রভুত্বকারী ধর্ম্মগুলির মধ্যে গণ্য না হইয়া ইহা দুর্ব্বল ও পরাভূত ধর্ম্মগুলির মধ্যে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'দাজ্জাল বধ' অর্থ কী?

ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, দাজ্জাল কোন একজন ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। ইহা খৃষ্টান জাতি এবং তাহাদের পাদ্রীদের নামান্তর মাত্র। সুতরাং, ইহা প্রমাণিত হওয়ার পর কখনো এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে না যে, 'দাজ্জাল কতলের' দ্বারা ইহাদের ধ্বংস সাধন বুঝায়। 'দাজ্জাল কতলের' ইহাই সুনিশ্চিত অর্থ যে, খৃষ্টান জাতিগুলির, তাহাদের ধর্ম্মীয় ভ্রান্ত ধারণাগুলির, তাহাদের জড়বাদের এবং তাহাদের ভ্রমাত্মক ফিলসফির সকল প্রভুত্ব ধূলায় পর্য্যবসিত হইবে। এখানে একটি বিশেষ তত্ত্ব স্মরণ রাখিবার যোগ্য। 'দাজ্জাল' দ্বারা শুধু খৃষ্টান ধর্ম্ম বুঝায় না। কারণ, ইহাতো আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামার সময়েও বিদ্যমান ছিল। ইহার সহিত তাঁহার মোকাবিলাও হইয়াছিল এবং ইহা পরাজিতও হয়। সুতরাং যদি শুধু খৃষ্টীয়ান ধর্মের ভিত্তিহীন ধারণাগুলি এবং ঐ সকল ধারণার সমর্থকেরা 'দাজ্জাল' হইয়া থাকে, তবে ইহারা তো তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং তিনি বরং ইহাদিগকে 'কতল' করেন। অথচ, তিনি বলিয়াছেন যে, দাজ্জালকে শুধু মসীহ্ 'কতল' করিবেন। আরো বলিয়াছেন, 'দাজ্জাল আমার সময়ে বাহির হইলে, আমি উহার সম্মুখীন হইব" ('মিশকাত,' দাজ্জাল প্রসঙ্গ)। ইহা হইতে জানা যায় যে, ইহা তাঁহার সময়ে প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং, তাঁহার সময়ে যাহা প্রকাশ পায় নাই, বাধ্য হইয়া এইরূপ বস্তুই অর্থ করিতে হইবে যাহা তাঁহার জামানায় জাহের হয় নাই। উহা কী? উহা খৃষ্টান জাতির ভ্রান্ত ধারণাসমূহের প্রভুত্ব এবং পৃথিবীময় প্রসার ঘটা। খৃষ্টান জাতিদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়বাদিতাজনিত যে ভীষণ ফ্যাসাদের সৃষ্টি হইয়া সারা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহা তাহাই। তারপর ইহা দ্বারা বুঝায়, "ফায়জে-আওয়াজ" বা 'কুটিল মধ্য যুগে' যে সকল ভ্রান্ত ধারণা মোসলমানগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম-বিশ্বাসগুলির সহায়তার কারণ হইয়াছে, তাহা। দৃষ্টান্তস্থলে, হযরত ঈসার (আঃ) জীবনবাদ, জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে আকাশে উত্তোলন, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার ইস্লাহ্র জন্য মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামকে ছাড়িয়া খোদাতা'আলা কর্ত্তৃক হযরত ঈসার হেফাযত, সমস্ত নবীগণের মধ্যে শুধু হযরত ঈসা (আঃ) শয়তান হইতে পবিত্র হওয়া, তাঁহার পাখী সৃষ্টি এবং মৃত ব্যক্তিদিগকে পুনরুজ্জীবন দান প্রভৃতি মতবাদ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের সময়ে ছিল না। তখন খৃষ্টান জাতির ভ্রান্তিকর ধর্ম্মমতগুলির

প্রাধান্যও ছিল না এবং সেইগুলি বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভও করে নাই। তখন তাহাদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলে যে ভীষণ জড়বাদিতা এবং ধর্ম্মের পথে ভয়াবহ ফেৎনার সৃষ্টি হইয়াছে, এ সকল কিছুই ছিল না। তখন মোসলমানদের ধারণাবলীও বিকৃত হইয়া খৃষ্টান মতবাদের সহায়তা করিত না। সুতরাং, এই সকল বিষয় এবং ইহাদের সমর্থকেরাই 'প্রকৃত 'দাজ্জাল'–যাহা বর্ত্তমান যুগে পরিপূর্ণ শক্তি লইয়া প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সুতরাং, দাজ্জাল কতলের দ্বারা এই দাজ্জালেরই কতল বুঝায়। অর্থাৎ, 'দাজ্জাল বধ' অর্থ, খৃষ্টান মতবাদের প্রাবল্য এবং ইহার সাহায্যকারী বিষয়াবলীর সম্পূর্ণ মুলোৎপাটন। এগুলিই বর্ত্তমান যুগে সাংঘাতিক উপায়ে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। আল্-হামদুলিল্লাহ্–আল্লাহ্‌রই সম্যক প্রশংসা, হযরত মির্যা সাহেবের দ্বারা এই কতলের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, এবং দাজ্জাল সেই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং পাইতেছে যে, ইহার ফলে আর কখনো পুনরুজ্জীবিত হইতে পারিবে না। সুনিশ্চিতরূপে অবহিত হউন, ইহার অন্তিমকাল সমুপস্থিত। যাঁহাদের অন্তর্চক্ষু আছে, তাঁহাদের নিকট সে মৃতদের মধ্যে পরিগণিত। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখুন।

তৃতীয় প্রশ্ন, 'দাজ্জাল দ্রবীভূত হওয়ার' অর্থ কী?

দাজ্জাল দ্রবীভূত হওয়ার অর্থ, খোদাতাআলা মসীহ্ মাওউদকে এইরূপ প্রভাব ও শক্তি দিবেন যে, তাঁহার সম্মুখে দাজ্জাল আপনা-আপনি নিস্তেজ হইতে আরম্ভ করিবে। তাহার হাত পা শিথিল হইয়া পড়িবে। মসীহ্ মাওউদের সম্মুখীন হওয়াকে সে ভয় করিবে; এবং খোদাতাআলা মসীহ্ মাওউদের জামানায় এই প্রকার গোপন শক্তি প্রয়োগ করিবেন যে, দাজ্জালকে ভিতরে ভিতরেই শেষ করিয়া ফেলিবে। পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা যাইবে যে, ইহার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

চতুর্থ প্রশ্ন, 'বাবুল্-লুদ্দ' ('লুদ্দ-ফটক') অর্থ কী?

কোন কোন মোহাদ্দেসের মতে 'লুদ্' দামেস্কের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানের নাম। ইহা শুধু একটা ধারণা মাত্র। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম ইহার কোন অর্থ করিয়াছেন বলিয়া কোন উক্তি নাই। তিনি ইহার নির্দ্দিষ্ট কোন অর্থ না করায় যুক্তিসঙ্গত উপায়ে ইহার অর্থ গ্রহণ করিবার অধিকার আমাদের আছে। আমরা বলি, 'লুদ্দ' একটি আরবী শব্দ। ইহা 'আলাদ্' শব্দের বহুবচন। 'আলাদ্' অর্থ, "ঝগড়াকারী'। ('আক্‌রাবুল্-মোয়ারেদ') কোর্‌আন শরীফেও বর্ণিত হইয়াছে *"ও-হুয়া আলাদ্দুল্-খেসাম্"*–"অত্যন্ত ঝগড়াপরায়ণ ('সূরাহ্ বাকারাহ্', রুকূ ২৫)। আরো বর্ণিত হইয়াছেঃ *"কাওমান্-লুদ্দা"*–ঝগড়াকারী জাতি" ('সূরাহ্ মরিয়ম,' রুকূ ৬)। সুতরাং, শাব্দিক হিসাবে, "বাবুল্-লুদ্দে" অর্থ "ঝগড়াকারীদের ফটক'। এই হিসাবে হাদীসে নবুবীর অর্থ মসীহ্ মাওউদ দাজ্জালকে ঝগড়াকারীদের ফটকে নিধন করিবেন। অর্থাৎ, দাজ্জাল মসীহ্ মাওউদ হইতে পলায়ন করিবে। কিন্তু ঝগড়াকারীদের ফটকের নিকট মসীহ্ মাওউদ

অবশেষে উহাকে পাকড়াও করিবেন এবং বধ করিবেন। এখন এই ব্যাখ্যানুসারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কারণ, উল্লিখিত বাক্যের সোজা ও পরিষ্কার অর্থ দাজ্জাল মসীহ্ মাওউদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিবে কিন্তু তিনি উহার পশ্চাদ্ধাবন করিবেন এবং তর্কযুদ্ধে-('মুনাযারায়') ভূতলশায়ী করিয়া উহাকে বধ করিবেন। অর্থাৎ, তরবারী দ্বারা উহার কতল না হইয়া যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা উহার নিধন কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। ইহাই প্রতিপাদ্য।

পঞ্চম প্রশ্নের সমাধান বাকী আছে। 'ধন-মালের প্রতি আহ্বান' অর্থ কী?

ইহার উত্তরও সহজ। 'মাল' অর্থ 'রূহানী মাল'। মসীহ্ মাওউদ জগতের কাছে প্রভূত আধ্যাত্মিক ধন-মত্তা উপস্থিত করিবেন। কিন্তু জগদ্বাসী তাহা গ্রহণ করিবে না। তারপর, ইহা দ্বারা এ কথারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মসীহ্ মাওউদ তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের জন্য বড় বড় পুরস্কার ধার্য্য করিবেন যেন তাহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মোকাবেলা করে। কিন্তু কোন বিরুদ্ধবাদী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার লাভের অধিকারী হইবে না। অর্থাৎ, তিনি ধন-মত্তা পেশ করিবেন, কিন্তু কেহই তাহা লইবে না। নতুবা, শুধু সংসারী দুনিয়াদারদের মত ধন বিতরণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণের পক্ষে কখনো শোভনীয় নহে।

উপরোক্ত গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুত মাহ্দী ও মসীহ্র কার্য্য, সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া নির্ণীত হয় ঃ–

(১) অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের *"হাকাম্-আদাল"* রূপে তিনি ন্যায়-বিচার ও মীমাংসা করিবেন।

(২) ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল বহিরাক্রমণ হইতেছে, তিনি তাহা প্রতিরোধ করিবেন। বিশেষতঃ খৃষ্টান মতবাদ ও জড়বাদের প্রকোপ বিনষ্ট করিবেন এবং ইসলামকে অন্যান্য ধর্ম্মসমূহের উপর প্রবল করিবেন। ইসলামের তবলীগ বিশ্বের কোণে কোণে পৌছাইবেন–বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে। অর্থাৎ, ইয়ূরোপ ও আমেরিকা প্রচার বলে তিনি জয় করিবেন।

(৩) হারানো ঈমান পৃথিবীতে তিনি পুনঃ সংস্থাপন করিবেন।

এই তিনটি কার্য্য সাধন মসীহ্ মাওউদের জন্য নির্ধারিত রহিয়াছে। আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে, হযরত মির্যা সাহেব এই ত্রিপ্রকার কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তাঁহার পর তাঁহার খলীফাগণও করিতেছেন। বস্তুতঃ খলীফাগণ তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত। কৃতকার্য্যতা বিষয়ে, পক্ষপাতিত্বহীন শত্রুও অস্বীকার করিতে পারে না।

মসীহ্ মাওউদের প্রথম কার্য্য ঃ

মসীহ্ মাওউদের প্রথম কাজ ন্যায় বিচারক হিসাবে অভ্যন্তরীণ অনৈক্যসমূহের মীমাংসা করা। সুতরাং, এ সম্বন্ধে জানা কর্তব্য, বর্ত্তমান যুগে উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে বহু প্রকার অভ্যন্তরীণ মতানৈক্য বিদ্যমান। যথা ঃ–

(১) খোদাতা'আলার গুণাবলী (সীফাত) সম্বন্ধে মতবিরোধ।

(২) 'মালায়েকা' বা ফেরেশ্‌তাগণ সম্বন্ধে এখ্‌তেলাফ।

(৩) সেলসেলা রেসালত সংক্রান্ত মতানৈক্য।

(৪) মৃত্যুর পর জীবন, আমলের ভাল-মন্দ প্রতিফল, এবং বেহেশত-দোযখ সম্বন্ধে মতভেদ।

(৫) তক্‌দীরের বিষয়ে মতভেদ।

(৬) কোরআন ও হাদীসের মর্যাদা সম্বন্ধে মতবিরোধ।

(৮) আহ্‌লে হাদীস এবং আহ্‌লে ফেকাহ্‌ লইয়া মতবিরোধ।

(৯) জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম-বিষয়সমূহের মতবিরোধ।

(১০) ফেকাহ্‌র মসায়েল্‌ সম্বন্ধে অনৈক্য।

এই দশ প্রকার মতবিরোধ বর্ত্তমান যুগে ইসলামী দুনিয়ায় এক প্রকার ভীষণাকৃতি আঁধারের আয়োজন করিয়াছিল। আত্ম-কলহ ব্যতীত এই সকল বিরোধের ফলে মোসলমানগণের মধ্যে এরূপ বিষয়সমূহের উদ্ভব হইয়াছিল যে, তদ্বারা ইসলামের বদনাম হইয়াছিল। শত্রুরা ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার মহা সুযোগ লাভ করে। কোন কোন বুদ্ধিমান মোসলমান ইহাতে নাচার হইয়া মুক্তির উপায়ের অভাবে ইসলামের অবস্থার প্রতি অশ্রুপাত করিতেছিলেন, এবং কোন কোন দুর্ব্বল ঈমানের মোসলমানতো ইসলামকে বিদায় দিতেছিলেন। এইরূপ তুমুল বাত্যার সময় আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁহার ওয়াদা অনুসারে হযরত মির্যা সাহেবকে "হাকাম আদাল্‌" -ন্যায় বিচারক ও মীমাংসা কারীরূপে আবির্ভূত করেন। তিনি আসিয়াই শ্বেত-পতাকা উত্তোলন করেন এবং ঘোষণা করেন যে, "আসো এখানে, খোদা আমাকে তোমাদের মতবিরোধের মীমাংসাকারকরূপে পাঠাইয়াছেন। আসো, আমি তোমাদের সত্য- সত্য মীমাংসা করিব।" অতঃপর, তিনি বিচারকের আসন গ্রহণ করেন এবং আধ্যাত্মিক বিচার আরম্ভ করেন।

সর্ব্বপ্রধান মতবিরোধ ছিল, সাধারণভাবে মোসলমানদের মধ্যে এই ধারণা বিস্তার লাভ করে যে, খোদা পূর্ব্বকালে অবশ্য আপন বান্দাগণের সহিত কথা বলিতেন, কিন্তু এখন তিনি তাহা করেন না। অন্য কথায়, তিনি শোনেন, কিন্তু কথা বলেন না। মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) আসিয়া মীমাংসা জানাইলেন, –ধর্ম্ম-পুস্তকীয় ও যৌক্তিক উপায়ে অকাট্য প্রমাণ-সমূহ দ্বারা প্রদর্শন করিলেন যে, খোদা সম্বন্ধে এইপ্রকার ধারণা পোষণ করা ভীষণ 'এল্‌হাদ'–ধর্ম্মহীনতা। ইহা খোদাতা'আলার উপর ভীষণ দোষারোপ এবং তাঁহার গুণাবলীর উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ। খোদাতা'আলার কথা বলার শক্তি বাতেল হয় নাই। তিনি বলিলেন যে, খোদা কালাম না করিলে ইসলামও মৃত ধর্ম্মসমূহেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। ইহার ভিত্তিও অপরাপর ধর্ম্মের ন্যায় শুধু কেচ্ছা-কাহিনীর উপরেই আসিয়া সংস্থাপিত হয়। ইহাতে কোন সত্যিকার প্রেমিক বা কোন প্রকৃত অন্বেষকের পিপাসা

কখনো মিটিতে পারে না। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, ইসলাম, কোরআন শরীফ এবং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম সর্ব্বদাই সুমিষ্ট ফল প্রদান করিয়া আসিতেছেন। কোরআন মজীদের বাণী *"লাহুমুল বুশ্‌রা ফিল্ হায়াতেদ্ দুন্‌য়্যা"* ('তাহাদের জন্য ইহলৌকিক জীবনেই সুসংবাদ) অনুসারে সেই সুমিষ্ট ফল ইহাই যে, তাঁহাদের প্রকৃত আজ্ঞানুবর্ত্তী খোদাতা'আলার সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধ স্থাপনের পরম সৌভাগ্য লাভ করে–সে তাহার ক্ষমতানুযায়ী খোদাতা'আলার বাক্য লাভে অনুপ্রাণিত হয়। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বিষয়টি উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রস্ফুটিত করিলেন (তাঁহার রচিত 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া,' 'নুসরাতুল-হক', 'নযূলুল্-মসীহ্', 'হকীকতুল ওহী' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখুন)।

তারপর, খোদাতা'আলার সম্বন্ধে এই মতানৈক্য ছিল, খোদাতা'লা কাহারো সম্বন্ধে 'আযাব' দেওয়ার মীমাংসা না করা পর্য্যন্ত, তাহার প্রতি অবশ্য রহমত নাযেল করিতে পারেন, কিন্তু আযাব দেওয়ার ফয়সালার পর তৌবা, ইস্তেগফার করিলেও আযাবের ফয়সালা পরিবর্তনপূর্বক তিনি রহমত নাযেল করিতে পারেন না। তিনি তাঁহার পূর্ব্ব ফয়সালা অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য। এইসব ধারণা হইতে আমরা খোদার পানাহ্ চাই। হযরত মির্যা সাহেব এ বিষয়টিও যুক্তি দ্বারা পরিষ্কার করিলেন ও প্রমাণ করিলেন যে, এই বিশ্বাসটি সত্য নয়। খোদাতা'আলার 'কামেল কুদরত', তাঁহার অসীম শক্তি তাঁহার অপরিসীম দয়া–তাঁহার অপার রহমতের বিরোধী নহে। খোদাতা'লা বলেন, *'ওয়াল্লাহু গালেবুন আলা আমরিহী'* ('আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার মীমাংসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রাখেন' -সূরাহ্ ইউসুফ) ('আনওয়ারুল-ইসলাম', 'আঞ্জামে-আথাম', 'নযূলুল্-মসীহ্', 'হকীকতুল-ওহী', প্রভৃতি দেখুন)।

তারপর, খোদাতা'লা সম্বন্ধে এই মতবিরোধও ছিল যে, তিনি বনী-ইসরাঈল এবং বনী ইসমাঈল ব্যতীত আর কোন উম্মতে রসূল পাঠান নাই, এবং তাঁহার অনুগ্রহের জন্য শুধু এই দুইটি গোষ্ঠীকেই মনোনীত করিয়াছলেন। হযরত মির্যা সাহেব যুক্তি দ্বারা এই ধারণা ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণ করেন। ধর্ম্মীয় গ্রন্থমূলক এবং বিশুদ্ধ যৌক্তিকতামূলক প্রমাণাদি দ্বারা তিনি প্রদর্শন করেন যে, প্রত্যেক উম্মতই খোদাতা'আলার সহিত বাক্যালাপের সুযোগ পাইয়াছে এবং প্রত্যেক উম্মতেই তাঁহার রসূল আসিয়াছেন। যেমন কুরআন করীম বলে, *"ওইম্মিন উম্মাতিন ইল্লা খালা ফিহা নাযীর'* (এমন কোন জাতি নাই যে, উহার মধ্যে সতর্ককারী হন নাই।) তিনি হিন্দুদের কৃষ্ণ, বৌদ্ধদের গৌতম বুদ্ধ, পারসিকগণের জরথুস্ত্র এবং চীনবাসীগণের কনফিউসিয়াসের রেসালত স্বীকারপূর্ব্বক আন্তর্জাতিক সম্বন্ধসূচক যুগান্তরের আয়োজন করেন (চশ্‌মায়ে মারেফাত' 'পয়গামে সোলেহ' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

তারপর, খোদাতা'আলার এল্‌হাম সম্বন্ধে মতানৈক্য ছিল। এল্‌হাম সম্বন্ধে বলা হইত যে, শাব্দিক এল্‌হাম হয় না। শুধু একটা ভাব মনে উদ্রেক হয় মাত্র। অন্য কথায়,

ভাল বা মন্দ যে সকল ভাব মনে জাগে সকলই এল্হাম। হযরত মির্যা সাহেব এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করেন। কোরআনের শিক্ষা এবং যৌক্তিকতা ও অভিজ্ঞতা বলে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, যদিও প্রচ্ছন্ন ওহী,–'ওহী-খফী'ও এক প্রকার 'কালামে এলাহি' (আল্লাহ্র বাণী); কিন্তু অধিকতর উচ্চ ও অধিকতর নিরাপদ ও সুরক্ষিত 'কালাম' (ঐশীবাণী) "শাব্দিক উপায়ে' নাযেল হয়। কোরআন করীমের ওহীও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। ('বারাহীনে আহ্মদীয়া' 'নযূলুল্-মসীহ্' প্রভৃতি দেখুন)।

তারপর, খোদাতা'আলার দোয়া কবুল করিবার গুণ সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। বলা হইত যে, দোয়া একটি এবাদত মাত্র। দোয়ার ফলে খোদাতা'আলা তাঁহার ফয়সালা বা এরাদা–তাঁহার সংকল্প বা মীমাংসা কখনো পরিবর্ত্তন করেন না। হযরত মির্যা সাহেব এই ধারণাকে প্রবল যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত করেন। কোরআনের শিক্ষা, প্রত্যক্ষ ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা মূলে সুনিশ্চিত প্রমাণের বলে উল্লিখিত ধারণার অসারতা তিনি প্রকাশ করেন ('আয়নায়ে-কামালাতে-ইসলাম', 'বারাকাতুদ্-দোয়া' প্রভৃতি দেখুন)।

তারপর, খোদাতা'আলার সত্তা সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। বলা হইত যে, তিনি যেন তাঁহার কোন কোন 'এখতিয়ার' (অধিকার) তাঁহার কোন কোন বান্দার হস্তে সমর্পণ করেন এবং তাঁহারাও স্বতন্ত্রভাবে খোদার মতই 'কুদরত' (ঐশী-শক্তি) প্রদর্শন করিতে থাকেন। এই ধারণার ফলে ইসলামে বহু মিথ্যা গল্প-গুজবের সৃষ্টি হইয়াছে। হযরত মির্যা সাহেব যুক্তি- প্রমাণের সাহায্যে ইহা ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণ করিয়াছেন (হযরত মির্যা সাহেবের ডাইরী প্রভৃতি দেখুন)।

তারপর, খোদাতা'আলার পরেই 'মালায়েকা' (ফেরেশ্তাগণ) সম্বন্ধে বহু প্রকার মতভেদ ছিল। তাঁহারা কীরূপ? তাঁহাদের কাজ কী? তাঁহারা কীরূপে কার্য্য করেন? তাঁহাদের প্রয়োজনীয়তা কী? প্রভৃতি, প্রভৃতি। হযরত মির্যা সাহেব অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ গবেষণা দ্বারা এই সকল সূক্ষ্ম বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন এবং এই মসলা সম্বন্ধে সত্য পথের সন্ধান দেন ('তৌযীহে-মরাম', 'আয়নায়ে-কামালাতে ইসলাম', এবং হযরত খলীফাতুল-মসীহ্ সানী প্রণীত 'মালায়েকাতুল্লাহ্ 'প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

তারপর, সেল্সেলা রেসালত সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। বলা হইত যে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের উপর সর্ব্ব প্রকার নবুওয়ত 'খতম' হইয়াছে। এখন কোন ব্যক্তি তাঁহারই "ফয়েয'–তাঁহারই আশীষপ্রাপ্ত এবং তাঁহারই শরীয়তের খাদেম হইলেও নবী হইতে পারে না। হযরত মির্যা সাহেব প্রবল যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, 'খাতামুন্নাবিয়ীন' অর্থ যাহা মনে করা হয়, তাহা নয়। নবুওয়তের সেল্সেলা বন্ধ হওয়ার এই অর্থ নয় যে, এখন কোন প্রকার নবীই আসিতে পারেন না। কারণ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের পর শুধু শরীয়তবাহী নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু শরীয়তবিহীন, প্রতিবিম্বাকার –'গয়ের-তশ্রিয়ী,

যিল্লী' নবুওয়তের দ্বার রুদ্ধ হয় নাই। যদি নবুওয়তের যাবতীয় বিভাগ বন্ধ এবং কর্ত্তিত হইয়া থাকে, তবে ইহার অর্থ–'নাউযুবিল্লাহ্'–আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের অস্তিত্বের ফলে উম্মতে মোহাম্মদীয়া একটি অতি গৌরবময় মহাকৃপা ও ঐশী পুরস্কার হইতে কাটা গিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি ধর্ম্ম-গ্রন্থীয় প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা এই মসলার অসারতা প্রমাণ করেন ('এক গলতি কা এজালা', 'তোহ্ফা গোলড়বিয়া', 'নযূলুল্-মসীহ্', 'হাকীকাতুল্-ওহী' প্রভৃতি দেখুন)।

তারপর, নবী ও রসূলগণ সম্বন্ধে একটি সাংঘাতিক মতভেদ ছিল, সকল নবীই প্রকারান্তরে গোনাহ্গার। হযরত ঈসা (আঃ) ব্যতীত কোন নবীই 'মাসুম' (নিষ্পাপ) নহেন। একমাত্র তাঁহাকেই শয়তান স্পর্শ করে নাই। তিনি ব্যতীত, অন্য কোন নবীই শয়তানের স্পর্শ হইতে পবিত্র নহেন। হযরত মির্যা সাহেব শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে এই ধারণা ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণ করিয়াছেন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটন করিয়াছেন ('নূরুল্-কোরআন, 'রিভিও অফ্ রিলিজিয়ন্স' পত্রে 'ইসমতে আম্বিয়া' সংক্রান্ত তাঁহার প্রবন্ধাবলী ইত্যাদি দেখুন)।

তারপর, নবুওয়তের অর্থ। নবী এবং নবুওয়তের মকাম দ্বারা কী বুঝায়? অনুরূপ প্রশ্নাবলী সম্বন্ধেও যে সকল ভ্রান্ত ধারণা স্থান পাইয়াছিল তাহাও হযরত মির্যা সাহেব পরিষ্কার করিয়াছেন ('হাকীকাতুল-ওহী' প্রভৃতি দেখুন)।

তারপর, মৃত্যুর পরপারের জীবন, বেহেশ্ত, দোযখ, শাস্তি ও পুরস্কার সম্বন্ধে বহু আজগুবী ধারণা প্রচলিত হইয়াছিল। ফলে অন্যদের পক্ষে ইসলামের উপর 'হামলা' করিবার মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বেহেশ্ত ও দোযখের স্বরূপ (হকীকত) সম্বন্ধে যে সকল ধারণা প্রকাশ করা হইত, বস্! খোদা পানাহ্। হযরত মির্যা সাহেব এ সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহী, সরস ও সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ যুক্তিযুক্ত বিষয়াদি লিখেন এবং কোরআন এবং হাদীস হইতে প্রকৃত তত্ত্বসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ফলে পূর্ব্বে যে সকল শত্রু আক্রমণ করিত, তাহারাও উচ্চ প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে ('ইসলামী উসূল কি ফিলাসফি' প্রভৃতি দেখুন)।

'তক্দীর' যাবতীয় মতানৈক্যের কেন্দ্র ছিল। ইহার সম্বন্ধে মতভেদের সীমা-পরিসীমা ছিল না। তিনি ইহাকে এরূপ পরিষ্কার করিয়া বুঝাইলেন যে, এখন একজন বালকও তাহা বুঝিতে পারে (এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন পুস্তকে খণ্ড খণ্ডভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে 'চশমায়ে মা'রেফত' 'জঙ্গে মোকাদ্দাস' দ্রষ্টব্য। একত্রে এক স্থানে এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে হইলে হযরত খলীফাতুল-মসীহ্ সানীকৃত 'তকদীর-ই-এলাহী' দেখুন)।

'খেলাফতে রাশেদা' সম্বন্ধে সুন্নী-শিয়া মতবিরোধ অতি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনবিদিত। তিনি ইহার সত্যাসত্য মীমাংসা করিয়াছেন ('সিররুল খোলাফা', 'হুজ্জাতুল্লাহ্' প্রভৃতি এবং হযরত মির্যা সাহেবের সাহাবী মৌলবী আব্দুল করীম (রাঃ) কৃত "খেলাফতে রাশেদা" দেখুন)।

কোরআন ও হাদীসের 'মরতবা' সম্বন্ধে অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি অপরটির উপর বিচারপতিত্ব করিবে, তৎসম্বন্ধে এই প্রকার মতাবলী প্রকাশ করা হইত যে, শুনিলে একজন মুসলমানের দেহে রোমাঞ্চ হয়। মোসলমানদের এক 'ফেরকা' কোরআন শরীফকে পিছনে ফেলিয়া হাদীসের প্রতি ঝুঁকিয়াছে। হযরত মির্যা সাহেব এই সকল বিষয়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন এবং সুন্নাহ্‌কে হাদীস হইতে পৃথক হওয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কোরআন, সুন্নাহ্‌ ও হাদীসের পৃথক পৃথক মর্য্যাদা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তিনি সংস্থাপন করিয়াছেন ('আল্‌ হক্‌ লুধিয়ানা', 'রিভিয়্যু রব্‌ মোবাহাসা চোক্‌রালবী', 'কিশ্‌তিয়ে-নূহ', প্রভৃতি দেখুন)।

'আহলে-ফেকাহ্‌' ও 'আহলে হাদীসদের পারস্পরিক মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব অতি পরিচিত। হযরত মির্যা সাহেব যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা পক্ষগণকে তাহাদের ভ্রান্তি সম্বন্ধে সতর্ক করেন। উভয় সম্প্রদায়ের দোষ-গুণের সমালোচনা করেন এবং উভয়ের বাড়াবাড়ি হইতে মধ্য-পন্থা অবলম্বন করেন ('ফতওয়া আহ্‌মদীয়া' প্রভৃতি দেখুন)

তারপর মোজেযাসমূহের হকীকত (প্রকৃত তত্ত্ব) এবং ঐশী-নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে 'আহ্‌লে-হাদীস' 'নেচারী' (প্রকৃতিবাদী) এবং হানাফীদের মতভেদের সীমা ছিল না। হযরত মির্যা সাহেব এ বিষয়ে পূর্ণ গবেষণা প্রকাশ করেন। তাহাদের মতভেদের আর কোনই ঠাঁই রাখা হয় নাই ('সুরমা-চশমে-আরিয়া,' 'বারাহীনে-আহ্‌মদীয়া,' চশমায়ে-মারেফাত,' হাকীকাতুল,-ওহী,' প্রভৃতি দেখুন)

তারপর, 'জেহাদ' সমস্যা সাংঘতিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহা ইসলামের উপর এক দুরপনেয় কলঙ্ক আনিতেছিল। হযরত মির্যা সাহেব যুক্তি-প্রমাণের উজ্জ্বল আলোকে ইহাদের সমাধান এবং কোরআন শরীফে বর্ণিত স্পষ্ট নীতি 'লা ইক্‌রাহা ফিদ্দীন' (-'ধর্ম্মে কোনো বলপ্রয়োগ নাই') অনুযায়ী সত্য পথ প্রদর্শন করেন ('রেসালাহ্‌ জেহাদ, 'হাকীকাতুল- মাহ্‌দী,' চশমায়ে-মারেফাত, 'জঙ্গে মোকাদ্দাস,' প্রভৃতি দেখুন)।

তারপর, আম্বিয়া আলায়হেমুস্‌ সালাম কর্ত্তৃক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংবাদ লাভ এবং ইহার নিগূঢ় তত্ত্বাবলী সংক্রান্ত মসলা ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হযরত মির্যা সাহেবের বক্তৃতা ও লেখার ফলে এখানেও সূর্য্যের উদয় হইল ('আঞ্জামে-আথম', 'আন্‌ওয়ারুল্‌-ইস্‌লাম,' 'হকীকাতুল্‌-ওহী' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

'তারপর, 'ফেকাহ্‌র' মসলাগুলিতে অনৈক্যের অন্ত ছিল না। হযরত মির্যা সাহেব কোন কোন অমৌলিক মতভেদ থাকিতে দেন এবং ইহাকে উম্মতের জন্য 'রহমত'স্বরূপ নির্দ্ধারণ করেন এবং কোন কোন স্থলে যুক্তি দ্বারা যথার্থ পথ প্রদর্শন করেন (তাঁহার 'ডাইরী,' 'ফাতাওয়া আহমদীয়া' প্রভৃতি দেখুন)

মোসলমানদের মধ্যে যে সকল মতানৈক্য দেখা দিয়াছিল, এবং হযরত মির্যা সাহেব 'হাকাম' বা বিচারকরূপে যেগুলির মীমাংসা করেন, তন্মধ্যে কতকগুলি সংক্ষিপ্তভাবে

উল্লেখ করা গেল। যদি উম্মতের এখতেলাফসমূহের পূর্ণ বিবরণ এবং হযরত মির্যা সাহেবের মীমাংসাবলীর সম্পূর্ণ উল্লেখ করিতে হয়, তবে এক বিরাট গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। তজ্জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ কতিপয় স্থূল মতভেদ উল্লেখ করা হইল।

এস্থলে যদি কেহ এই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, মতভেদ সম্বন্ধে তো সমস্ত উলামাই তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, হযরত মির্যা সাহেব অধিক কি করিলেন, তবে ইহা একটি নিরর্থক সন্দেহ করা হইবে। কারণ, অভিমত প্রকাশ এক কথা, আর বিচারক ('হাকাম') হইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করা অন্য কথা। কোন বালকও অভিমত প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব যেভাবে উম্মতের এখতেলাফ-সমূহের মীমাংসা করিয়াছেন, উহাতে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। তদ্বারা তাঁহার 'হাকাম' (প্রত্যাদিষ্ট বিচারক) হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আলোকপাত হয়। ঐসকল বিশেষত্ব এই ঃ–

(১) তিনি কোন বিষয়ে কোন দলের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক কোন অভিমত দেন নাই। সর্ব্বদাই তিনি একজন সালিস, একজন বিচারকরূপে মীমাংসা দিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার মীমাংসাসমূহ কাহারো অধিকার হরণের বিষক্রিয়া হইতে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র। ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব। তাঁহার মীমাংসাবলী বিচার করিলে প্রত্যেকেই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তিনি প্রত্যেক মীমাংসাই ন্যায়ের সহিত বিনা পক্ষাবলম্বনে প্রদান করেন।

(২) তিনি শুধু অভিমতই প্রকাশ করেন নাই, বিশুদ্ধ যুক্তি ও ধর্ম্ম পুস্তকীয় প্রমাণ, উভয় দিক হইতেই, যেন সূর্য্য আনিয়া দিয়াছেন। তিনি একজন সত্যান্বেষীর জন্য অনৈক্যের কোন পথ রাখেন নাই। যে বিষয়েই কলম ধরিয়াছেন সর্ব্বদার জন্য উহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার কোন লেখাই টলানো যায় না। একদর্শিতা-শূন্য ব্যক্তি মাত্রই তাঁহার লেখার অকাট্যতা স্বীকার না করিয়া পারে না। তিনি প্রত্যেক মীমাংসারই যে সূত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অস্বীকারকারীর পলায়নের কোন সুযোগ নাই।

(৩) তিনি অলৌকিক শক্তি এবং খোদায়ী নিদর্শনসমূহের বলে তাঁহার প্রত্যেক কথার সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অর্থাৎ শুধু ধর্ম্ম গ্রন্থীয় প্রমাণ ও বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারাই তিনি তাঁহার কথা প্রমাণিত করেন নাই, বরং অস্বীকারকারীর বিরোধিতার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্যের নিদর্শন প্রদর্শনের দ্বারা তাঁহার মীমাংসাবলীর উপর খোদায়ী সমর্থনের মোহর স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং কোথায় এই মীমাংসা আর কোথায় বেচারা মৌলবীদের বহস, তাঁহাদের সমালোচনা! "চে নিস্‌বত খাক্ রা বা আলমে পাক!"- পবিত্র 'স্বর্গ-জগতের' সহিত মাটির কি সম্বন্ধ!

মসীহ্ মাওউদের দ্বিতীয় কাজ ঃ

মসীহ্ মাওউদের দ্বিতীয় কাজ বহিরাক্রমণ রোধ এবং অপর ধর্ম্মসমূহের উপর ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন। ইসলামের তবলীগ সম্প্রসারিত করিয়া ইসলামের নামে সারা বিশ্ব বিজয়, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহের জয় সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। এই কাজও যে প্রকার সর্ব্বসৌষ্ঠ উপায়ে তিনি সম্পাদন করিয়াছেন এবং যে প্রকার সুষ্ঠুরূপে উহা সম্পাদিত হইতেছে উহা নিজেই নিজের দৃষ্টান্ত। সর্ব্বপ্রথমে আমরা ঐ সকল কথা গ্রহণ করিতেছি, যাহা ইসলামের নামে চালু হইয়াছিল এবং যাহা অন্যান্য ধর্ম্মগুলিকে ইসলামের উপর হামলা করিবার মহাসুযোগ সরবরাহ করিতেছিল। এই সকল অভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ফলে, ইসলামের উজ্জ্বল চেহারা ময়লায় আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। হযরত মির্যা সাহেব কীরূপে তাহা পরিষ্কৃত করেন, সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এখন শুধু ঐ সকল কথা বলিবার রহিয়াছে, হযরত মসীহ্ নাসেরী সম্বন্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা মোসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ফলে দাজ্জাল এর শক্তি লাভ করে যে, সে ইসলামের শিবির হইতে কয়েক লক্ষ ব্যক্তিকে বাহির করিয়া লইয়া যায়। সেই কথাগুলি এই ঃ-

(১) মসীহ্ নাসেরী সম্বন্ধে মোসলমানদের এই ধর্ম্ম-বিশ্বাস যে, তিনি সুন্নতুল্লাহ্র বিরুদ্ধে, আল্লাহ্র চিরন্তন কানুনের বিরুদ্ধে এই জড়দেহ লইয়া আকাশে গিয়াছেন এবং মৃত্যু হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। অথচ, নবী-মুকুট মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম মৃত্তিকা গর্ভে কবরে সমাহিত আছেন।

(২) এই বিশ্বাস যে, মসীহ্ নাসেরী জীব সৃষ্টি করিতে পারিতেন। তাঁহার সৃষ্ট কতিপয় পাখী আছে। অথচ, অন্য কোন মানবেরই সে শক্তি নাই।

(৩) এই বিশ্বাস যে, মসীহ্ নাসেরী (হযরত ঈসা) সত্য সত্যই মৃত ব্যক্তিদিগকে জেন্দা করিতেন। তিনি মৃত ব্যক্তিকে বলিতেন, উঠো, আর তাহারা কবর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিত। এই প্রকারে তিনি সহস্র সহস্র মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর কোন নবীকে এই শক্তি দেওয়া হয় নাই।

(৪) এই বিশ্বাস যে, মসীহ্ নাসেরীই এই মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন যে, তিনি দাজ্জাল বধ করিবেন। সত্য সংবাদ বহনকারী নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর সকল ফেৎনা অপেক্ষা দাজ্জালের ফেৎনা বড়। হযরত ঈসা (আঃ) ব্যতীত অন্য কাহারো এই ফেৎনা দূরীভূত করিবার ক্ষমতা নাই। 'নাঊযুবিল্লাহ' মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামেরও ছিল না এবং অন্য কোন নবীরও ছিল না। শুধু এই কার্যের কারণেই মসীহ নাসেরীকে মৃত্যু হইতে নিরাপদ রাখা হইয়াছে, যেহেতু সম্ভবতঃ খোদাও তাঁহার মত অন্য কোন মোসলেহ্ বা ধর্ম্ম-সংস্কারক সৃষ্টি করিতে অক্ষম!

(৫) এই বিশ্বাস যে, মসীহ্ নাসেরী ব্যতীত কোন নবীই শয়তানের স্পর্শ হইতে পবিত্র নহেন। মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ও উহা হইতে পবিত্র ছিলেন না এবং অন্য কেহই না ('নাউযুবিল্লাহ্')। সকলেই কোন না কোন গোণাহ্ করেন, করেন নাই শুধু মরিয়মের এই অত্যাশ্চর্য্য পুত্র!

হযরত মসীহ্ নাসেরী সম্বন্ধে মোসলমানদের মধ্যে এই পাঁচটি সাংঘাতিক ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাদের দ্বারা খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম মহাশক্তি লাভ করে। ইহার ফলে মোসলমানগণ খৃষ্টীয়ানদের সহজ শিকারে পরিণত হইয়াছিল। খৃষ্টীয়ানেরা কয়েক লক্ষ মোসলমানকে এই ফাঁদের দ্বারাই খৃষ্টীয়ান করিয়াছিল। এক বেচারা মোসলমান এই সকল ফাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অনন্যোপায় ছিল। একবারের ঘটনা। একজন উচ্চ পদস্থ খৃষ্টীয়ান পাদ্রী লাহোরে ওয়াজ করিতেছিলেন। তিনি এই সকল কথাই মোসলমানদের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেন। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন কোন মৌলবী সাহেবানও ভয়ে জড়সড় হইতেছিলেন। খৃষ্টীয়ান পাদ্রী ঐ সকল যুক্তি সগর্জ্জনে উপস্থিত করিতেছিলেন। দৈবক্রমে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, যিনি কয়েক বৎসর হইল ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় আমাদের মোবাল্লেগ ছিলেন, তথায় পৌঁছেন। তিনি পাদ্রী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পাদ্রী সাহেব, আপনি এ সব কি বলিতেছেন? আমরা তো এসকল কথা গ্রহণ করি না। কোরআন এবং হাদীস দ্বারা এগুলি প্রমাণিত হয় না। আমরা তো মসীহ্কে (আঃ) একজন নবী মাত্র মানি। তিনি তাঁহার পূর্ণ জীবন যাপনের পর মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। অন্য কোন নবীর মধ্যে নাই, তাঁহার এমন কোন বিশেষত্ব ছিল না। তাঁহার চেয়ে বড় বড় আরো নবী হইয়াছেন।" মুফতি সাহেবের এই সকল কথার পর, পাদ্রী সাহেব বলিলেন, "মালুম হোটা হায়, টুম্ কাডিয়ানী হো। ওয়েল্ হাম্ টুমসে বাত নাহি কারতা।" এই বলিয়া পাদ্রী সাহেব তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ করিলেন।

দেখুন, এই বিশ্বাসগুলি কত মারাত্মক। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব এ সকলই ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলিয়া নির্ধারণ করিলেন। তিনি কোরআন ও হাদীস হইতে সপ্রমাণ করিলেন যে, এ সকল ধারণা পরে সৃষ্টি হয়। কোরআন ও হাদীসে উহাদের কোনই ভিত্তি নাই। এই প্রকারে তিনি এক আঘাতেই দাজ্জালের এক পা ভঙ্গ করেন। কারণ দাজ্জালের ছিল দুই পা। একটি ছিল মোসলমানদের বিকৃত ধারণাবলী। তদ্দারা সে খুব ভর পাইয়াছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তাহার কাজ বড় সহজ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অপর পা ছিল তাহার নিজেরই ভ্রান্ত ধারণাবলী। ইহাদের বলে সে প্রবল বন্যার বেগে চলিয়াছিল। বস্তুতঃ, ইসলামের বিরুদ্ধে অপরাপর ধর্ম্মগুলি যে সকল আক্রমণ করিতেছিল, তন্মধ্যে একটি প্রধান অংশ ছিল মোসলমানদের স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। এই সকল ভ্রান্তিমূলক ধারণা যুক্তিযুক্ত উপায়ে সংশোধিত হওয়ায় বহিরাক্রমণের এই অংশ সম্পূর্ণই বিধ্বস্ত হইল।

হযরত মির্যা সাহেবের ইহা একটি অতি মহান খেদমত। মোসলমানগণ এ জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা মোসলমান জাতি মহা

উপকৃত। **প্রথমতঃ** এই সকল ভ্রান্ত ধারণার ফলে মোসলমানদের অবস্থা নেহাৎ শোচনীয় আকার ধারণ করে। এই সকল বিশ্বাসের ফলে তাহাদের ঈমানে পোকা ধরিয়াছিল। এই সকল বিশ্বাসের সংশোধনের ফলে মোসলমানদের অবস্থা শুধরাইল, তাহাদের ঈমান ধ্বংস হওয়া হইতে রক্ষা পাইল। **দ্বিতীয়তঃ** এই সকল আকায়েদের ফলে ইসলাম অপরাপর ধর্ম্মসমূহের দ্বারা ভীষণভাবে আক্রান্ত হইত। মোসলমানগণ তাহাদের এই সকল ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে, আম্-খাস্ সকলেই মসীহ্ নাসেরীকে লইয়া ইসলামের উপর আক্রমণের সুযোগ পাইত। মোসলমানগণ তাহাদের ভ্রান্ত ধারণাবলী ধর্ম্মের অঙ্গীভূত মনে করায় এবং কোরআন ও হাদীস হইতে তাঁহারা স্ব স্ব মতে সনদ গ্রহণ করিত বলিয়া অবস্থা আরো বিকটাকৃতি ধারণ করে। কারণ, তদ্দারা শুধু মোসলমানের উপরই প্রতিক্রিয়া হইত না, ইসলামও আঘাত পাইত। কিন্তু তাহাদের ধারণাগুলি ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় ইসলাম এই প্রকার আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছে। তজ্জন্য আল্লাহ্তাআলারই সকল প্রশংসা।

মসীহ্ মাওউদের এই কার্য্যের অপর দিক হইল অপরাপর ধর্ম্মসমূহের উপর আক্রমণের দ্বারা উহাদিগকে পরাস্ত করা। ইহাও অতি সুষ্ঠু উপায়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে। ভারতবর্ষ সকল ধর্ম্মাবলীর আবাসস্থল। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এতগুলি ধর্ম্মের এরূপ জোর পাওয়া যায় না। তারপর ভারতবর্ষেরও পাঞ্জাব প্রদেশ, বিশেষতঃ সকল ধর্ম্মের কেন্দ্র। খৃষ্টীয়ানদের এখানে জোর আছে। আর্য্য, শিখ, ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ, দেব সমাজ সকলেরই এ প্রদেশে প্রবল জোর। যে সকল ধর্ম্মের প্রাণের কোন প্রকার স্পন্দন আছে, পাঞ্জাব কোনটি হইতেই শূন্য নয়। সুতরাং পাঞ্জাবেই মসীহ্ মাওউদ আবির্ভূত হওয়ার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী স্থান ছিল, যাহাতে সকল ধর্ম্মগুলিই তাঁহার সহিত স্ব স্ব শক্তি পরীক্ষা করিতে পারিত; এবং যাবতীয় ধর্ম্মসমূহের সম্মুখীন হইয়া তিনি উহাদিগকে পরাস্ত করিবার সুযোগ লাভ করিতেন। অবহিত হউন, হযরত মির্যা সাহেব উল্লিখিত সকল ধর্ম্মাবলীর নিকট দুইভাবে প্রমাণের কার্য্য সম্পূর্ণ করেন। এক, বিশুদ্ধ যুক্তি এবং ধর্ম্ম-পুস্তকীয় প্রমাণের দ্বারা উহাদের ভ্রান্ত হওয়া সপ্রমাণ করেন। দুই, খোদায়ী নিদর্শন ও আধ্যাত্মিক শক্তির সহযোগে তিনি উহাদিগকে পরাজিত করেন এবং ইসলামকে মহাবিজয়ীরূপে উপস্থিত করেন।

খৃষ্টানদের সহিত হযরত মির্যা সাহেবের সংগ্রাম ঃ

প্রথমে আমরা খৃষ্টান ধর্ম্মের বিষয় গ্রহণ করিতেছি। কারণ, অনেক দিক দিয়া ইহার দাবী অগ্রগণ্য। এই ধর্ম্মের ভিত্তি তিনটি বিষয়ের উপর সংস্থাপিত।

প্রথম, ত্রিত্ববাদ। অর্থাৎ, খোদার তিনটি অংশ আছে ঃ (১) পিতা, অর্থাৎ, যিনি সুবিদিত খোদা। (২) পুত্র, অর্থাৎ মসিহ্ নাসেরী। তিনি মানব আকারে পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হন। (৩) পবিত্রাত্মা। পিতা ও পুত্রের মধ্যে ইহা যোগ-সূত্র। এই তিনই সতন্ত্র এবং পৃথক পৃথক খোদা। তবু, খৃষ্টানদের মতে খোদা তিন নহেন, খোদা একই।

দ্বিতীয়, খৃষ্টান ধর্ম্মের অপর ভিত্তি মসিহ্‌র ঈশ্বরত্ব। এই বিশ্বাস অনুসারে মসীহ্ পৃথিবীতে আসেন এবং মানবাকৃতিতে অবতরণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন খোদা অর্থাৎ তিনি খোদার পুত্র ছিলেন। তিনি নিজের কোরবানী দ্বারা মানবজাতিকে গোনাহ্ হইতে নাজাত (মুক্তি) দেওয়ার জন্য প্রেরিত হন।

তৃতীয়, এই ধর্ম্মের অপর ভিত্তি হইল প্রায়শ্চিত্ববাদ। মোসীয় বিধান মতে ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ অভিশপ্ত মৃত্যু। মসীহ্ নাসেরী মানবজাতির জন্য ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন। যাহারা তাঁহার উপর ঈমান রাখে, তাহাদের সকলের গোনাহ্ তিনি এই প্রাকারে নিজ মাথায় বহন করিলেন। তিনি এই অভিশাপের বোঝার চাপে তিন দিন অতিবাহিত পূর্ব্বর্ক আবার পূর্ব্ববৎ সদাপ্রভু পিতার ডান হাতের পার্শ্বে আকাশে যাইয়া উপবেশন করেন।

এই সকল মূল বিশ্বাসের অনুসঙ্গে খৃষ্টীয়ানেরা ইহাও বিশ্বাস করে যে, অযাচিত কৃপা অর্থাৎ তৌবা, এস্তেগফারের ফলে গোনাহ্ মাফ করা খোদাতালার গুণাবলীর বিরোধী। কারণ, ইহা ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধ। 'আদম-হাওয়া' হইতে মানুষ গোনাহ্‌র বীজ উত্তরাধিকার সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং, কেহই সম্পর্ণূরূপে পাপ মুক্ত নয়। পক্ষান্তরে, গোনাহ্ মাফ হয় না বলিয়া নাজাতের জন্য বাহিরের কোন কিছুর প্রয়োজন অপরিহার্য্য। ইহাই প্রায়শ্চিত্ব। অর্থাৎ, ক্রুশে যিশু (মসীহ্)র প্রাণ ত্যাগ। তারপর তারা ইহাই বিশ্বাস করে যে, 'শরিয়ত' এক 'লানৎ'। মসীহ্ তাহাদিগকে ইহা হইতে স্বাধীনতা দিয়াছেন, ইত্যাদি।

এই ভূমিকা দানের পর হযরত মির্যা সাহেব এবং খৃষ্টীয়ান জগতের মধ্যে যে পবিত্রযুদ্ধ হয়, বর্ণনা করা হইতেছে। উহার ফলে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের বাক্যানুযায়ী ক্রুশ ভঙ্গ হয় এবং দাজ্জাল কতলের নমুনা প্রকাশ পায়। এমনি ত হযরত মির্যা সাহেব জীবনের প্রারম্ভ হইতে খৃষ্টীয়ানদের সহিত রুহানী সংগ্রামের কোনো না কোনো শৃঙ্খল জারী রাখেন। অতীব বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত হয় যে, যখন তিনি যুবক মাত্র ছিলেন এবং শিয়ালকোটে চাকুরী করিতেন, তখন হইতেই তিনি পাদ্রী বাট্‌লার প্রভৃতির সহিত ধর্ম্মীয় আলাপ করিতেন। তারপর, 'বারাহীনের-আহমদীয়ার' ইস্তাহারও প্রকারান্তরে তাহাদের সকলের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছিল। কিন্তু ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে সন্নিহিত সময়ে বিশেষতঃ যখন উক্ত মহাগ্রন্থের চতুর্থ খন্ড মুদ্রিত হইল, তখন তিনি ইংরেজী ও উর্দ্দুতে একটি ইস্তাহারের বিশ হাজার সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারের অত্যন্ত ব্যাপক প্রচার করিলেন তিনি। ইয়ুরোপের দেশ সমূহে, আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশেও বহুল পরিমাণে তিনি ইহা বিতরণ করিলেন। বড় বড় লোক, সম্রাট, বাদশাহ, গণতন্ত্র ও সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, রাজনীতিবিদ, মনিষি, দার্শনিক

এবং ধর্ম্ম নেতাগণের নিকটেও রেজষ্টরীযোগে পত্র সরূপ ইহা প্রেরণ করিলেন। যদিও এই ইস্তাহারে সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই সম্বোধন করা হইয়াছিল, কিন্তু খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে ইহা বিশেষরূপে বন্টন করা হয়। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছিল যে, আল্লাহতা'লা মসিহ্ নাসেরীর কদমে তাঁহার পর্দাপণ মত, চলিত শতাব্দীতে তাঁহাকে 'মোজাদ্দেদ' করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বিশ্ববাসীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন যে, খোদা পর্য্যন্ত পৌছাইতে পারে শুধু ইসলামই। কেহ তাঁহার এই দাবীর প্রমাণ চাহিলে এবং ইহার সত্যতা জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট হইতে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হইতে পারে। সত্যান্বেষীদিগকে খোদায়ী নিদর্শনবলী ও প্রদর্শিত হইবে। (হযরত মির্যা সাহেব প্রণীত ইস্তাহারাবলী 'তাবলিগে-রেসালত' ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই ইস্তাহারের সন্নিহিত সময়ে তিনি একটি মুদ্রিত পত্রও মশ্‌হুর পাদ্রী, আর্য্য, ব্রাহ্ম, প্রকৃতিবাদী ও বিরুদ্ধবাদী মৌলবী সাহেবানদের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাতে লিখিত ছিল, যদি কেহ ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করে, বা তাঁহার মোজাদ্দেদ হওয়ার বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করে, তবে সে সত্যান্বেষীরূপে এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট কাদিয়ানে আসিয়া অবস্থান করিলে, নিশ্চয়ই কোন না কোন নিদর্শন অবলোকন করিবে। যদি এই মেয়াদের মধ্যে কোন অলৌকিক নির্দশন প্রকাশ না পায়, তবে তিনি ক্ষতি পূরণ স্বরূপ বা জরিমানা স্বরূপ এইরূপ ব্যক্তিকে মাসিক দুই শত টাকা হিসাবে মবগল চব্বিশ শত টাকা নগদ প্রদান করিবেন। ঐ ব্যক্তি যেভাবে ইচ্ছা করেন, সন্তোষ বিধান করিতে পারেন। ('তাবলীগে রেসালত' দ্রষ্টব্য)

দেখুন, মীমাংসার ইহা কেমন সরল ও সুন্দর উপায় ছিল। ইহার ভিত্তি ছিল কত সত্য। পাদ্রী সাহেবান তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও নির্ব্বাচন পূর্ব্বক এক বৎসরের জন্য কাদিয়ান পাঠাইতে পারিতেন। আর কিছু না হইলেও তাঁহাদের মিশনের সাহায্যকল্পে আড়াই হাজার টাকাই অন্ততঃ লাভ হইত। ইসলামের পরাজয় এবং তাঁহাদের জয় তা ছিল সতন্ত্র বস্তু। হযরত মির্যা সাহেবের এবং তাঁহার প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিগণের অন্ততঃ মুখ ত অবশ্যই বন্ধ হইত। কিন্তু খুবই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, অসত্য সত্যের সম্মুখে উপস্থিত হইতে সর্ব্বদাই ভয় পায়, যদি উহার শেষ ভাগ্য উহাকে টানিয়া এখানে উপস্থিত না করে। আর এখানে ত সত্যের পরম বার্ত্তা বাহক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) পূর্ব্ব হইতেও এই সংবাদ দিয়াছিলেন যে, দাজ্জাল মসিহ্ মাওউদের সম্মুখে আসিলে পানির মধ্যে লবণের মত দ্রবীভূত হইবে। সে তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিবে। সুতরাং, সে কিরূপ তাঁহার সম্মুখে আসিতে পারিত? হযরত মির্যা সাহেব শুধু সাধারণ আন্দোলন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, ঘরোয়াভাবেও কখন কখন কোন কোন পাদ্রীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন এবং বিশেষ জোরের সহিত আন্দোলন চালাইয়াছেন। কিন্তু কোন পাদ্রী সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। বাটালা হইতে কাদিয়ান এগার মাইল মাত্র ব্যবধান। তৎকালে সেখানে পাদ্রী হোয়াইট ব্রিকট্ সাহেব ছিলেন।

তাঁহাকেও উদ্বুদ্ধ করিবার বহু চেষ্টা করা হয়। তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এখন, দেখুন এই জলন্ত প্রমাণ, যাহা এই জাতির নিকট পূর্ণাকারে উপস্থিত করা হয়, উহা কিরূপে উহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতেছে!

পরিশেষে, ১৮৯৩ খৃঃঅব্দে অমৃতসরের পাদ্রীরা এই শর্ত্তানুসারে ত মীমাংসায় স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু তর্ক-যুদ্ধ (মুনাজারা) করিতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। খৃষ্টীয়ানদের পক্ষ হইতে মিস্টার আবদুল্লাহ আথাম (এক্সট্রা এসিসট্যান্ট কমিশনার) মুনাযের (তর্ককারী) নিযুক্ত হন। পাদ্রী টমাস্ হাওয়েল এবং পাদ্রী ঠাকুর দাস প্রভৃতি তাঁহার সাহায্য করিবেন বলিয়া সাবস্ত্য হয়। ইসলামের পক্ষ হইতে হযরত মির্যা সাহেব মুনাযের মান্য হইলেন। অমৃত সহরে এই মোবাহাসা আরম্ভ হইল। খৃষ্টীয়াদের পক্ষ হইতে মিঃ মার্টন ক্লার্ক হইলেন সভাপতি এবং মোসলমানদের পক্ষ হইতে শেখ গোলাম কাদের ফসিহ্ সভাপতি হইলেন। পনের দিন পর্য্যন্ত মুনাযারা চলিল। এই তর্ক-যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন কে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের নিজ হইতে কিছুই বলার প্রয়োজন নাই। সভার বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে "জঙ্গে মোকাদ্দাস" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা পাঠে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকটেই একথা লুক্কায়িত থাকিতে পারে না যে, কে জয়ী হইয়াছিলেন এবং কে পরাজিত? মোবাহাসা সম্বন্ধে দুইটি বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যিনি এই কেতাব পাঠ করিবেন, তিনি এক অত্যাশ্চর্য্য আনন্দ উপভোগ করিবেন।

প্রথম, প্রত্যেক দাবী প্রমাণের জন্য হযরত মির্যা সাহেব একটি অখন্ডণীয় নীতি উপস্থিত করিলেন। ইহা সকল দ্বন্দের মূলোচ্ছেদ করে। খৃষ্টীয়ান মহোদয়েরা ইহার প্রতি কোনই লক্ষ্য করিলেন না, করিতেও পারিতেন না। ইহা পালনে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনোন্যপায় হইয়া পড়িতেন। নীতিটি কি ছিল আমরা পরে বলিব।

দ্বিতীয়, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহা অনুভব না করিয়াই পারেন না যে, হযরত মির্যা সাহেবের প্রবল জেরায় তিষ্ঠিতে না পারিয়া কয়েক জায়গাতেই আথাম সাহেব খ্রীষ্টানদের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মমত ছাড়িয়া ব্যক্তিগত ধারণা বিশেষের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত আত্মরক্ষার উপায়ন্তর খুঁজিয়া পান নাই। কয়েক স্থানেই তাঁহার দাবী ও প্রমাণ সর্ব্বজনবিদিত খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম-বিশ্বাসগুলির বিরোধী ছিল বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে তিনি পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন। ইহাও হযরত মির্যা সাহেব সাফল্য-মন্ডিত হওয়ার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নতুবা সকলেই জানেন, শত্রু যতই নিরুত্তর হউক না কেন, কখনো চুপ করে না। যাহা হউক, এই মোবাহাসা ইসলামের জন্য মহাসাফল্যজনক মোবাহাসা বলিয়া প্রমাণিত হয়, এবং খৃষ্টীয়ানেরা খুলাখুলিভাবে পরাস্ত হয় ('জঙ্গে মোকাদ্দস' দ্রষ্টব্য)।

তারপর, পাদ্রী ফতেহ্ মসিহ হযরত মির্যা সাহেবের সম্মুখীন হইতে চাহিল। কিন্তু এমন জব্দ হইল যে, আর মাথা তোলে নাই। অবশ্য, তাহার কুৎসিত অন্তরের একটি

রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। হযরত মির্যা সাহেব ইহার প্রশ্নাবলীর অসারতা সম্পুর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন (নূরুল্-কোরআন দ্রষ্টব্য)।

ইহার পর, আর কোন পাদ্রী তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার সাহস করে নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার কাজ পরিচালিত রাখিলেন। 'নুরুল-কোরআন','সেরাজুদ্দীন ঈস্যাঈ কে চার সাওয়ালোঁ কা জওয়াব' এবং 'কেতাবুল্-বরিয়া'র ন্যয় অত্যন্ত শক্তশালী কেতাবসমূহ প্রণয়ন করেন। পরিশেষে খৃষ্টীয় ১৯০০ সনের লাহোরস্থ পাঞ্জাবের লর্ড বিশপ রেভারেন্ড জর্জ লেফ্রয়কে চ্যালেঞ্জ দিয়া খৃষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধে সাম্পুর্ণিক 'হুজ্জত' করা হয়। হযরত মির্যা সাহেবের উদ্‌যোগে এক দল আহমদী বিশপ সাহেবকে একটি লিখিত দরখাস্ত দ্বারা এই চ্যালেঞ্জটি দেন। উহাতে লিখিত হইয়াছিল যে, তিনি এ দেশে সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম-নেতা। সত্যান্বেষীদিগকে প্রবোধ দেওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্যের অর্ন্তগত। তিনি প্রকারন্তরে মোসলমানদিগকে মোবাহাসার (তর্কযুদ্ধ) জন্য আহবানও করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাকে যিশু খৃষ্টের দিব্যি দিয়া বলা হইতেছে যে, তিনি যেন পশ্চাদপদ না হন এবং সত্যের ও অসত্যের মধ্যে প্রভেদ প্রকাশ হইতে দেন। ইসলাম এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের সত্যতা নিরূপণ সম্পর্কে হযরত মির্যা সাহেবের সহিত লাহোরে একটি নিয়মিত মোবাহাসা দ্বারা তিনি খোদাত'লার সৃষ্টির প্রতি দয়া করুন। বস্তুতঃ অত্যন্ত গাইরত প্রদায়ক ভাষায় বিশপ সাহেবকে মোবাহাসার জন্য আহবান করা হয়। কিন্তু বিশপ সাহেব সম্মুখীন হওয়ার সাহস করেন নাই। তিনি টাল বাহানাক্রমে পাশ কাটাইলেন মাত্র ('রিভিও অব্ রিলিজিয়ান্স্' কাদিয়ান দ্রষ্টব্য)।

১৯০২ খৃঃ অব্দে হযরত মির্যা সাহেব ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামের তবলীগ সম্পুর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে একখানি ইংরাজী মাসিক "রিভিও অব্ রিলিয়ান্স্" প্রবর্ত্তন করেন। ইহাতে ইসলামের সত্যতা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের খন্ডনমূলক অতি শক্তিশালী ও নিরুত্তরকারক সন্দর্ভ সমূহ তিনি লিখিলেন। ইহাতে খৃষ্টীয়ানদের ' দাঁত খাটা' হইয়া গেল। বহু একদর্শিতা শূন্য খৃষ্টীয়ান এই সকল প্রবন্ধ অতুলনীয় হওয়া স্বীকার করেন। হযরত মির্যা সাহেব বিশুদ্ধ যুক্তি ও ধর্ম্মপুস্তকীয় প্রমাণসমূহের দ্বারা সুনিশ্চতরূপে প্রমাণ করিলেন যে, ত্রিত্ববাদের ধারণা স্বয়ং বাইবেলের বিরোধী। ইহা মানব প্রকৃতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার নেহাৎ অযোগ্য হওয়া ছাড়া মানব বুদ্ধিরও প্রকাশ্য বৈরী বটে। তিন খোদা থাকা দুই অবস্থার অতিরিক্ত নহে। হয়ত তাঁহারা তিনজনের মধ্যে প্রত্যেকেই খোদা হইবার স্ব স্ব স্থানে সম্পূর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেকেরই খোদ হইবার পূর্ণ গুণাবলী আছে। নতুবা তাদের একজনও স্বয়ং সম্পর্ণ নহেন এবং তাঁহারা তিনজনে মিলিয়া পূর্ণ সত্তা। প্রথোমক্ত অবস্থায় তিন খোদা থাকা একটি নিরর্থক ব্যাপার। কারণ, এই তিন জনের মধ্যে প্রত্যেকেই পূর্ণ অস্তিত্ব হওয়ায়, তাঁহাদের প্রত্যেকেই পৃথকভাবে এই কারখানা চালাইতে সক্ষম । সুতরাং, যেখানে এক খোদা কাজ করিতে পারেন, সেখানে তিন খোদাকে কাজ করিতে হয়। যদি তাহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ এই বিশ্ব পরিচালনের অযোগ্য হইয়া

থাকেন তবে তাঁহারা প্রত্যেকেই ত্রুটিযুক্ত এবং তাহারা কেহই খোদা নহে। এই প্রকার যুক্তি দ্বারা তিনি বুদ্ধির দিক হইতে ত্রিত্ববাদের খন্ডন করিলেন। তারপর ইহাও প্রমাণ করিলেন যে, খৃষ্টীয়ানদের মূল ধর্ম্মপুস্তক ইঞ্জীল কখনো ত্রিত্ববাদের সমর্থন করে না। বরং ইঞ্জীলের মূল শিক্ষা ছিল তৌহিদ-একত্ববাদ।

এইরূপ, তিনি খৃষ্টের ঈশ্বরত্বের বিশ্বাসের উপর এরূপ আঘাত করিলেন যে, তাঁহাকে খোদা প্রতিপন্ন করা ত দূরের কথা, খৃষ্টীয়ানগণের পক্ষে মসীহ্ নাসেরীকে একজন পূর্ণমানব প্রমাণ করাও দুরূহ হইয়া পড়িল। তারপর, প্রায়শ্চিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধ সমূহ লিখিলেন। সেইগুলি এরূপ শক্তিশালী প্রমাণিত হইল যে, কোন কোন খৃষ্টীয়ান স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে এই সকল প্রবন্ধের কোন উত্তর নাই ('ইসলামী অসুলকী ফিলসফী' সংক্রান্ত খ্যাতনামা রাশিয়ান কাওন্ট টলস্টয়ের অভিমত দ্রষ্টব্য)। তিনি প্রমাণিত করিলেন যে, প্রায়শ্চিত্ববাদ প্রকৃতির বিরুদ্ধ মত। যায়দের রক্তে বকরের গোনাহ্ মাফ হওয়া, ইহা এরূপ একটি ধারণা যে, মানববুদ্ধি ইহাকে দূর হইতে প্রত্যাখ্যান করে। তিনি প্রমাণ করিলেন যে, গোনাহ্ শুধু ঈমান ও একীনের দ্বারা দূরীভূত হইতে পারে। তজ্জন্য কোন রক্ত কোরবানীর প্রয়োজন নাই। ধর্ম্ম-পুস্তকীয় প্রমাণাদি দ্বারাও তিনি এই ধারণার অপনোদন করেন। সেইরূপ, অযাচিত দয়া সংক্রান্ত কাল্পনিক মতের অসারতাও তিনি প্রতিপন্ন করিলেন। বস্তুতঃ তিনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশুদ্ধ যুক্তি ও ধর্ম্ম-পুস্তকীয় প্রমাণ উভয় প্রকারেই যৌক্তিক ও সাম্পূর্ণিক সমালোচনা করেন এবং তদ্বরা ইহাকে এরূপভাবে ঘায়েল করিলেন যে ইহা আর পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে না।

যুক্তি ও ধর্ম্ম-পুস্তকীয় সমালোচনা ব্যতীত তিনি আরো এক মহান কার্য্য করেন। তদ্বরা খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রসাদ একদম চুরমার ও ছাড়া হইয়াছে। ইহা হইল ক্রুশের ঘটনা এবং মসিহ্ নাসেরীর কবর সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা। তিনি ইঞ্জিল ও ইতিহাস হইতে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত করিয়াছেন ঃ

প্রথম, মসিহ্ নাসেরীর ক্রুশে প্রাণ ত্যাগের উপর প্রায়শ্চিত্ববাদের মূল ভিত্তি সংস্থাপিত। তাঁহাকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হইয়াছিল সত্য কিন্তু তিনি ক্রুশে প্রাণ ত্যগ করেন নাই। মুর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহাকে জীবিতই ক্রুশ হইতে নামানো হয়। এই কথা তিনি এরূপ প্রখর যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে তাহাতে কোন প্রকার সন্দেহের স্থান নেই।

দ্বিতীয়, তিনি স্পষ্ট প্রমাণসমূহের দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, খোদা স্বরূপে প্রতিপন্ন মসিহ্ নাসেরীর মৃত্যু হইয়াছে।

তৃতীয়, তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, ক্রুশের ঘটনার পর ঈসা আলাইহেস সালাম সিরিয়া হইতে হিজরত পূর্ব্বক কাশ্মীর অঞ্চল আগমন করেন। তারপর তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণিত করেন যে, শ্রীনগর খান-ইয়ার মহল্লায় মসীহ্‌র (আঃ) কবর বিদ্যমান।

এখন, তাঁহার এই তিনটি মহান গবেষণার ফলে কী ভীষণ প্রতিক্রিয়া ধর্ম্মের উপর হইতেছে সব লক্ষ্য করুন। এই গবেষণার পরেও কি মসীহ্‌র ঈশ্বরত্ব এবং প্রায়শ্চিত্ববাদের কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে? হযরত মসীহ্‌ ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ না করা অর্থ প্রায়শ্চিত্ববাদ ধুলিসাৎ হওয়া। তারপর, মসীহ্‌ তাঁহার জীবনের দিনগুলি অন্যান্য মানুষের ন্যায় কাটাইয়া মৃত্যুলাভ করা, সমাহিত হওয়া এবং তাঁহার কবরও পাওয়া যাওয়ায় শুধু তিনিই মরেন নাই, তাঁহার ঈশ্বরত্বেরও মৃত্যু হইয়াছে। বস্তুতঃ শুধু তিনিই কবরে সমাহিত নহেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঈশ্বরত্ব সমাহিত এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের যাবতীয় ইন্দ্রজাল উড়িয়া গিয়াছে। (মসীহ্‌ হিন্দুস্তান মে', 'রাযে-হকিকত' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

হযরত মির্যা সাহেব 'রুহানী মোকাবিলার' জন্যও খৃষ্টীয়ানদিগকে আহবান করেন এবং বারংবার তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ দেন- তাহারাত এই দাবী করে যে, সরিষা বৎ ঈমানের দ্বারাও তাঁহারা তাহাই করিতে পারে, যাহা মসীহ্‌ তাঁহাদের ধারণা মত করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টীয়ানদিগকে তাহারা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া তাহাদের ঈমানের পরিচয় দেওয়ার জন্য ভীষণভাবে আহ্‌বান করা হয়। তিনি মসীহ্‌র ইশ্বরত্ব শুধু অস্বীকারই করেন নাই, বরং তাঁহার চেয়ে আপনি শ্রেষ্ঠ হওয়া ঘোষণা করেন। কোন সন্দেহ নাই, মসীহ্‌ নাসেরী নবীগণের মধ্যে একজন নবী ছিলেন, কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব ঘোষণা করিলেন, যদি খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে কাহারো রূহানী কামালাতের (আধ্যাত্মিক গুণ-সম্পদের) দিক দিয়া তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সার্মথ্য থাকে, তবে সম্মুখীন হইতে পারে এবং তাঁহার সহিত শক্তি পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পারে যে, খোদা কাহার সহিত আছেন। তিনি আরো লিখিলেন যে, 'কুরআ' নিক্ষেপ (লটারী) করতঃ কোন কোন সাংঘাতিক ব্যধিগ্রস্ত রোগী যেন উভয় পক্ষের জন্য নির্ব্বাচন করা হয়। কতকগুলি খৃষ্টীয়ানেরা নেয় এবং কতকগুলি হযরত মির্যা সাহেবকে দেওয়া হয়। তিনি তাঁহার ভাগের রোগীদের জন্য দোয়া করিবেন। তাঁহার খোদার নিকট তাহাদের আরোগ্য চাহিবেন। খৃষ্টীয়ানেরাও তাহাদের ভাগের রোগীদের আরোগ্যের জন্য ঈসা মসীহ্‌র নিকট দোয়া করিতে পারে এবং তাহাদের জড় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারে। পরে, দেখা যাইবে, কোন পক্ষের খোদা জয়ী হন এবং কে লাঞ্ছিত হয়। তিনি প্রতিযোগিতামূলক এই আহ্‌বান বারবার করিতে থাকেন এবং ইহার সম্বন্ধে বহু সংখ্যক ইস্তাহার প্রচার করেন। পাদ্রীদিগকে অত্যন্ত গয়রতে আঘাত দেওয়া হয়, তাহাদের বড় বড় বিশপদের নিকট আহ্‌বানমূলক পত্র প্রেরিত হয় কিন্তু কেহই সম্মুখীন হওয়ার সাহস করে নাই। ইহাপেক্ষা বড় আত্মিক মৃত্যু-যাহা এই জাতির ঘটিয়াছে, আর কি হইতে পারে? ('তবলীগে রেসালত' 'রিভিয়ু অব্‌ রিলিজিয়ন্‌স্‌' 'হকীকাতুল-অহী' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

তারপর, ১৮৯৩ খৃঃঅব্দে যে মহামোবাহাসা (তর্ক-যুদ্ধ) অমৃতসরে খৃষ্টীয়ানদের সহিত তাঁহার হইয়াছিল এবং উহা 'জঙ্গে মোকাদ্দস' নামে প্রকাশিত হয়, সেই

মোবাহাসার শেষে তিনি খৃষ্টীয়ান তর্ককারী (মুনাযের) ডিপুটি আব্দুল্লাহ আথাম সম্বন্ধে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। আথাম আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামুকে "দাজ্জাল" বলিয়াছিল এবং হযরত মীর্য সাহেব ও ইসলামের প্রতি হাস্য প্রকাশ করিয়াছিল। আথাম এক সৰ্ব্বৈব মিথ্যা ও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এক মতের উপর আস্থাশীল। সেজন্য, যদি সে সত্যের প্রতি না ঝুঁকে, তবে পনের মাসের মধ্যে মৃত্যু দন্ড পাইয়া 'হাবিয়া' দোযখে নিপতি হইবে। ('তবলীগ রেসালত', 'রিভিও অব্ রিলিজিয়ন্স্' 'হকীকাতুল-অহী' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

এই ভবিষ্যবাণীর ফলে আথামের মনে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইল যে, সভাস্থলে তখন আথাম মুখ হইতে জিহবা বাহিরে ঝুলাইয়া এবং তাহার দুই কানে হাত দিয়া বলিল, "আমি ত 'দাজ্জাল' বলি নাই।" অথচ, সে তাহার "আন্দরুনা-বাইবেল" নামক পুস্তকে এ কথাই বলিয়াছিল। ইহার পর যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল তাহার এই ভয় ও ত্রাস ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আথাম শহর হইতে শহরান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহার ভীতি-গ্রস্ত চিন্তাধারা কখনো উন্মুক্ত তরবারী, কখনো সর্প স্বরূপে তাহাকে দেখাইতে লাগিল (পাদ্রী ডাঃ মার্টিন ক্লার্ক কর্ত্তৃক আদালতে বিবৃতি এবং "কেতাবুল বারিয়া" দ্রষ্টব্য)। আথাম তাহার মুখ ও কলম ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিল। জানা গিয়াছে, ঐ সময় নির্জ্জনে বসিয়া আথাম কোরআন শরীফ পর্য্যন্ত পাঠ করিত। যদিও খৃষ্টীয়ানেরা তাঁহার ভয় ত্রাস করিবার উদ্দেশ্যে তাহার জন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিল, তবু তাঁহার ভয় বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পরিশেষে, তাহার অবস্থা এই পর্য্যায়ে পৌছিল যে, তাহাকে ঘনঘন মদ্য পান করানোর দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখা হইত। বস্তুতঃ, সে সব দিক হইতেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের সত্যতা এবং কোরআন শরীফের সত্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া প্রকাশ করিল। সুতরাং, খোদাতা'লা ভবিষ্যদ্বাণীর শর্ত্তানুসারে তাহাকে মেয়াদের মধ্যে 'হাবিয়ায়' পতন হইতে রক্ষা করেন।

মিথ্যাবাদীদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছে বলিয়া খৃষ্টীয়ানেরা শোরগোল করিতে লাগিল। ইহাতে হযরত মির্যা সাহেব তাহাদিগকে যুক্তি প্রমাণের দ্বারা বুঝাইলেন যে, আথাম ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই রক্ষা পাইয়াছে। কারণ, ইহা একটি মিশ্র ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। ভবিষ্যদ্বাণীটির অর্থ ছিল, আথাম প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে পনের মাসের মধ্যে 'হাবিয়ায়' নিপতিত হইবে, এবং সত্যের প্রতি ঝুঁকিলে নিরাপদ থাকিবে। অন্য কথায়, এক দিকে তাহার ধ্বংস হওয়ার এবং অন্য দিকে তাহার জীবিত থাকারও ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল। সুতরাং, তাহার ভীত হওয়ার এবং নত হওয়ার বিশেষ প্রমাণ রহিয়াছে বলিয়া তাহার জীবিত থাকাও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছিল। ইহার বিরোধী ছিল না। কিন্তু খৃষ্টীয়ানেরা ইহা স্বীকার করে নাই; বরং বলা উচিত, তাহারা স্বীকার করিতে চাহে নাই। ইহাতে হযরত মির্যা সাহেবের

ইসলামী গয়রত উদ্বেলিত হইল। তিনি ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন, যদি আথাম এই হলফ্ করে যে, ভবিষ্যদ্বাণীর ফলে সে ভয় পায় নাই এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই, আর এই হলফের এক বৎসরের মধ্যে সে ধ্বংস না হয়, তবে তিনি নগদ এক হাজার টাকা তাহাকে পুরস্কার দিবেন এবং তদবস্থায় তিনি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন এবং তাহারা সত্যবাদী প্রতিপন্ন হইবে। এই টাকা এখনই যে কোন সালিসের নিকট ইচ্ছা, তাহারা গচ্ছিত রাখিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে। কিন্তু আথাম সাহেব এ দিকে আসিলেন না।

ইহাতে হযরত মির্যা সাহেব পুনরায় ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, আথাম নত হয় নাই বলিয়া হলফ্ করিলে তাহাকে তিনি দুই হাজার টাকা পুরস্কর দিবেন। কিন্তু এবারও সে চুপই থাকিল। ইহাতে তিনি তৃতীয়বার ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, আথাম হলফ্ করিলে তিনি তিন হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। কিন্তু এবারও কোন প্রত্যুত্তর করা হইল না। পরিশেষে, তিনি চতুর্থবার ইস্তাহার দ্বারা ঘোষণা করিলেন যে, তিনি নগদ চারি হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন, যদি আথাম এই হলফ্ করে যে, ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা তাহার মনে কোন ভয়ের সঞ্চার হয় নাই এবং সে কোন প্রকারেই ঝুঁকে নাই। তিনি আরো লিখিলেন যে, হলফ্ করিলে এক বৎসরের মধ্যে জীবনলীলা সাঙ্গ হইবে এবং ইহার সহিত কোনই শর্ত্ত নাই। আর যদি সে হলফ্ না করে, তবে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকটেই ইহা প্রমাণিত হইবে যে, হলফ্ না করিয়া সত্য ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে মাত্র। তদবস্থায়, তিনি এক বৎসরেরও সীমা নির্দ্দিষ্ট না করিয়া বলেন যে, শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হইবে এবং কোন কৃত্রিম খোদা তাহাকে এই ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইহার পর, তিনি ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে আরো এক ইস্তাহার দ্বারা এই বিষয়েরই পুনরুল্লেখ করিলেন। তিনি লিখিলেন ঃ-

"আমি তাঁহার নামে হলফ্ করিতেছি, যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি আথামও হলফ্ করিতে চায় এবং আমার উপস্থিতকৃত ভাষায় (অর্থাৎ, পনের মাসের মেয়াদকালে তাহার অন্তরে ভবিষ্যদ্বাণীর ভয় প্রবল ছিল না এবং ইসলামের সত্যতার প্রভাব তাহার চিত্তে পড়ে নাই, আর সে কোন প্রকারেই ঝুঁকে নাই) এক জনতার মধ্যে আমার সম্মুখে তিনবার হলফ্ পূর্ব্বক বলে এবং আমি 'আমিন' বলি, তবে আমি তৎক্ষণাৎ চারি হাজার টাকা তাহাকে দিব। যদি হলফ্ করিবার তারিখ হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত সে জীবিত ও নিরাপদ থাকে, তবে উহা তাহার টাকা হইবে এবং ইহার পর এই সকল জাতিরা আমাকে যে সাজা চায়, দিবে। পৃথিবীর যাবতীয় শাস্তির মধ্যে কঠিনতম শাস্তি তাহারা আমাকে দিলেও আমি অস্বীকার করিব না। আর তাহার হলফের পর, আমারই এলহামের ভিত্তি দ্বারা, আমি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার চেয়ে আমার পক্ষে অধিক লাঞ্ছনা আর কিছুই হইবে না।" ('তবলীগে রেসালত', ৪র্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য) পাঠক, খোদাতা'লার কুদরতের তামাশা দেখুন, এই শেষ ইস্তাহারের পর সাত মাস অতিক্রমের পূর্ব্বেই ২৭শে

জুলাই, ১৮৯৬ খৃঃঅব্দে আথামের মৃত্যু হইল। আথামের মৃত্যুর পরেও হযরত মির্যা সাহেব বিরুদ্ধবাদীদের উপর 'হুজ্জৎ' পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শুধু খৃষ্টীয়ানদিগকেই নহে, যাবতীয় বিরুদ্ধবাদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেন ঃ

"যদি এখনো কোন খৃষ্টীয়ান আথামের এই মিথ্যাচারণ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ করে, তাহা হইলে আসমানী সাক্ষ্যের দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া নিতে পারে। আথাম ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মরিয়াছে। এখন, সে নিজেই তাহার স্থলবর্ত্তী হইয়া আথামের ব্যাপারে হলফ্ করিতে পারে। অর্থাৎ, এই মর্ম্মে হলফ্ করিবে যে, আথাম ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাবে ভীত হয় নাই, বরং তাহার উপর এই চারিটি আক্রমন হইতেছিল। (অর্থাৎ, হযরত মির্যা সাহেবের তরফ হইতে তাহাকে হত্যা করিবার জন্য কখনো তরবারী সহ লোক পাঠানো হইয়াছে, কখনো সাপ ছোঁড়া হইয়াছে, কখনো কুকুর শিক্ষা দিয়া পাঠানো হইয়াছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি, 'নাউযুবিল্লাহ্-মিন্-যালেকা') যদি এই হলফ্কারীও এক বৎসর পর্যন্ত রক্ষা পায়, তবে দেখ, আমি এখন অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি ইহা সহস্তে প্রকাশ করিব যে, আমার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইয়াছে। উল্লেখিত হলপের সহিত কোন শর্ত্ত থাকিবে না। ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার ফয়সালা হইবে এবং খোদার নিকট যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে আছে, তাহার মিথ্যা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে" (আঞ্জামে আথাম, '১৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু ইহাতেও বীর বাহাদুর খৃষ্টীয়ান সন্তানেরা 'মর্দ্দে-ময়দান' স্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আল্লাহু আকবার! ইহা কত ভীষণ লাঞ্ছনা, কী ভীষণ পরাজয়ই না ছিল, যাহা ইসলামের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে খৃষ্টীয়ানদের ঘটিয়াছিল। কিন্তু যাহার চক্ষু নাই, সে কী প্রকারে দেখিবে? (বিস্তৃত আলোচনার্থে 'জঙ্গে-মোকাদ্দস', 'আন্ওয়ারুল ইসলাম, 'আঞ্জামে আথাম' প্রভৃতি দেখা কর্ত্তব্য)।

আথামের এই লাঞ্ছনাময় মৃত্যুতে খৃষ্টীয়ান শিবিরে শত্রুতার ও ঈর্ষার ভীষণাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। তাহার মৃত্যুর পর অধিক দিন যায় নাই, অমৃতসরের অতি বিখ্যাত খৃষ্টীয়ান মিশনারী এবং অমৃতসরের মোবাহাসায় আথামের সহকারী ও সাথী পাদ্রী ডক্টর মার্টিন ক্লার্ক হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে খুনের প্রচেষ্টার অভিযোগ পূর্ব্বক এক মিথ্যা মোকাদ্দমা দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহাকে হত্যা করার জন্য মির্যা সাহেব ঝিলম নিবাসী জনৈক আব্দুল হামিদকে অমৃতসর প্রেরণ করেন। পাদ্রী সাহেব লালসা ও ভয় প্রদর্শনের দ্বারা উক্ত আব্দুল হামিদকে তাঁহার মতলব মোতাবেক জবানবন্দীও করাইলেন। এই মুকদ্দমা দায়েরের পূর্ব্বেই আল্লাহতা'লা হযরত মির্যা সাহেবকে এলহামের দ্বারা জানইলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা হইবে, কিন্তু পরিণামে তিনি নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইবেন। তিনি এই এলহাম প্রচার করিলেন। ইহার পর মোকদ্দমার কার্য্য আরম্ভ হয়। আর্য্য সমাজীরা এবং গয়ের আহমদী মোসলমান আলেমরা খৃষ্টীয়ানদের সাহায্য করিলেন এবং খোলাখুলিভাবে তাহাদের সাথ দিলেন। আর্য্য

উকীলেরা মার্টিন ক্লার্কের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে মোকদ্দমায় উকালতি করিলেন। মোসলমান মৌলবীগণ আগে বাড়িয়া হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন। কিন্তু আল্লাহতা'লা গুরুদাসপুরের ডিপুটী কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগ্‌লাসের নিকট সত্য উদঘাটন করিলেন। পরিশেষে, ফল কী হইল? আব্দুল হামিদ ডগল্‌াসের পায়ে পড়িয়া স্বীকার করিল যে, মোকদ্দমাটি জাল মাত্র এবং পূর্ব্বেকার জবানবন্দী পাদ্রীদের শিখান ছিল। সুতরাং আল্লাহতা'লার প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে হয়রত মির্যা সাহেব সম্মানের সহিত নির্দোষী সাব্যস্ত হইলেন। পাদ্রীরা মাথায় পরাজয় ও লাঞ্ছনার ডালি ছাড়া মিথ্যা চক্রান্ত ও খুনের সংকল্প করিবার দুরপনেয় কলঙ্কের ডালিও লইল। ইসলামের একটি সুস্পষ্ট জয়লাভ হইল ('কেতাবুল বারিয়া' দেখুন)।

যখন হযরত মির্যা সাহেব দেখিতে পাইলেন যে, খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে কেহই দোয়া এবং 'এফাযা রূহানীর' দিক দিয়া সম্মুখীন হইল না। তখন তিনি তাহাদিগকে 'মোবাহালার' জন্য আহ্বান করিলেন। যদি তাহারা তাহাদের ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া যথার্থই বিশ্বাস করে, তবে তাহারা তাঁহার সহিত মোবাহালায় প্রবৃত্ত হউক। অর্থাৎ, তাহারা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া দোয়া করিবে ঃ "সদা প্রভু, আমরা খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মকে সত্য জানি এবং ইসলামকে একটি মিথ্যা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করি। আমাদের প্রতিপক্ষ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইসলামকে সত্য মনে করেন এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিশ্বাসগুলিকে ভ্রান্ত বলিয়া নির্দেশ করেন এখন সদা প্রভু, প্রকৃত বিষয় তুমিই জান। তুমি আমাদের উভয়ের মধ্যে যথার্থ মীমাংসা কর। আমাদের মধ্যে যে পক্ষের দাবী অসত্য, উহাকে সত্য পক্ষের জীবদ্দশায় এক বৎসরের মধ্যে আজাব দেও।" হযরত মির্যা সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনিও এই প্রকার দোয়া করিবেন এবং দেখিবেন যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কে খোদার আজাবগ্রস্ত হয় এবং কাহারা সম্মানিত হয়। আক্ষেপের বিষয়, খৃষ্টীয়ানদের মধ্যে কেহই এই প্রতিযোগিতার জন্য উপস্থিত হয় নাই ('তবলীগে রেসালত' দ্রষ্টব্য)।

এইচ, এ ওয়েল্‌টার সাহেব একজন আমেরিকান পাদ্রী ছিলেন। তিনি ইংরাজীতে সেল্‌সেলা আহ্‌মদীয়ার সম্পর্কে একখানি ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন। উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয়ানেরা কাহারো ধ্বংস বা লাঞ্ছনা চায় না। এই জন্য কোন খৃষ্টীয়ান মির্যা সাহেবের সম্মুখীন হয় নাই। ভাল, অতি ভাল! কিন্তু বিচার করিতে হইবে যে, আথামের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে বলিয়া শহরে শহরে শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল কে? কে সঙ বাহির করিয়াছিল? তারপর, তাহার মৃত্যুতে রোষান্বিত হইয়া খুনের প্রচেষ্টামূলক মিথ্যা অভিযোগপূর্ব্বক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল কে? কে হযরত মির্যা সাহেবকে শাস্তি দেওয়াইয়া হয়ত ফাঁসির বা দ্বীপান্তরিত করিবার আয়োজন করিয়াছিল? ওহে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের বিনয়ী মেষগণ! তোমরাইত এই সকল যাবতীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তোমরা এ সবই করিতে পার। তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদিগকে বাধা দেয় না। কিন্তু ইসলাম এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে সত্য সত্য মীমাংসার উদ্দেশ্যে

খোদার হুযূরে দোয়ার জন্য হাত উঠানোতে তোমাদের ধর্ম্মের কথা স্মরণ হইল। তোমরা ইসলাম এবং ইহার পবিত্র প্রবর্ত্তকের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় ও লেখায় বিষোদ্গার এবং গালাগালি দ্বারা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিবার ধর্ম্মানুমতি পাও। ইসলামের অনিষ্ট করণে তোমরা কোন সুযোগই হারাইতে পার না। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম-বিবাদের মোকদ্দমা খোদার আদালতে উপস্থিত করা হয়, তোমরা সেখানে 'এক গালে থাবড় খাইয়া আঘাতকারীর নিকট অপর গালটিও উপস্থিত করিবার' উপদেশ-বাণী পালনের চিন্তায় বিভোর হও। এই সকল কারণেই হাদীস শরীফে তোমাদের যে 'নাম' রাখার ছিল রাখা হইয়াছে। 'মোবাহালার' ক্ষেত্রে খৃষ্টীয়ান প্রেমে ধর্ম্ম-শিক্ষা পরিপন্থী হইয়াছে, ভাল কথা। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিদর্শনাবলী দর্শন করিতে, বা প্রদর্শন করিতে এবং রোগীদের আরোগ্য দানের জন্য প্রতিযোগিতা মূলে দোয়া করিতে নিষেধ কী ছিল?

যাহা হোক, প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটি বলা হইল। আমরা বলিতেছিলাম হযরত মির্যা সাহেব খৃষ্টীয়ানদিগকে মোবাহালার্থে সর্ব্বোপায়ে আহবান করেন। কিন্তু কেহই সম্মুখীন হওয়ার সাহস করে নাই। কিন্তু এই উপায়েও ইসলামের প্রাধান্য এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের পরাজয় প্রকাশ করা খোদাতা'লার অভিপ্রেত ছিল। এই সময়েই **আমেরিকায় ডুই নামক এক ব্যক্তি** দন্ডায়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন স্কচ। দেখিতে দেখিতে সে একটি সুবৃহৎ জমাত গঠন করিল। খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতামূলক ধ্বজা-হস্তে সে কহিল, "আমি খৃষ্টের প্রেরিত। শীঘ্রই খৃষ্ট আসিবার সুসংবাদ লইয়া আমি আসিয়াছি।" সে আরো বলিল যে, ইসলামের বিলোপ সাধনও তাহারই কাজ। এই ব্যক্তি ইসলামের পরম শত্রু এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রেমে বিলীন ছিল। তাহার সহকারিতায় একটি সংবাদপত্রও বাহির হইত। উহার নাম ছিল (Leaves of Healing) 'লীভ্স অব্ হিলিং'। সে তাহার এই পত্রিকায় লিখিল, "যদি আমি সত্য নবী না হই, পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তিই খোদার নবী নহে।" আরো লিখিল, "আমি খোদার নিকট দোয়া করিতেছি, যেন শীঘ্র সে দিন আসে যখন পৃথিবীতে ইসলাম বলিতে কিছুই না থাকে। সদা-প্রভো, তুমি ইহাই কর। সদাপ্রভো, তুমি ইসলামকে ধ্বংস কর।" এই ব্যক্তি আঁ-হযরতের প্রতিও ভীষণ গালাগাল করিত। সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম। বস্তুতঃ সমগ্র খৃষ্টীয়ান জগতে ইসলামের শত্রুতায় এবং ইহার প্রতি গালি বর্ষণে এ ব্যক্তি সকলের অগ্রগামী ছিল। হযরত মির্যা সাহেব তাহার ফেৎনার কথা জানিতে পারিলেন। তিনি এক ইস্তাহারের দ্বারা তাহাকে 'মোহাবালার' জন্য আহ্বান করিলেন। এই ইস্তাহার আমেরিকার এবং ইউরোপের বহু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। এই সকল পত্রিকার তালিকা **'হকীকাতুল-অহী'** গ্রন্থে এবং 'রিভিয়ু অব্ রিলিজিয়ন্স' (Review of religions) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ডুই অতিশয় গর্ব্বিত ব্যক্তি ছিল। সে হযরত মির্যা সাহেবের এই মোবাহালা আহ্বানের উত্তর না দিয়া তাহার পত্রিকায় লিখিলঃ "ভারতবর্ষে এক নির্ব্বোধ মোহাম্মদী মসীহ্ আছে। সে বার বার আমাকে লিখিতেছে যে, কাশ্মীরে

যিশু খৃষ্টের কবর বিদ্যমান। লোকেরা বলিতেছে, আমি ইহার উত্তর দেই না কেন? আমি তাহার (অর্থাৎ তাহার 'মোবাহালার') উত্তর করি না কেন? কিন্তু তোমরা কি মনে কর যে, আমি এই সকল মশা মাছির উত্তর দিব? আমি ইহাদের উপর পা রাখিলে, পদ-দলনে নিধন করিব।" তারপর, অপর এক সংখ্যায় লিখিল, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে লোকদিগকে একত্রিত করা এবং খৃষ্টীয়ানদিগকে এই শহরে এবং অন্যান্য শহরে আবাদ করা আমার কাজ। এমন কি, সেদিন উপস্থিত হইবে, যখন মোহাম্মদী ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। হে খোদা, আমাদিগকে তুমি ঐ সময় প্রদর্শন কর।" ইহাতে হযরত মির্যা সাহেব পুনরায় এক ইস্তাহারের দ্বারা ডুইকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি আমার মোবাহালার উত্তর দেও নাই। আমি আবার তোমাকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, আমার সম্মুখীন হও। আমি তোমাকে সাত মাসের মুহলত দিতেছি। যদি তুমি এই সময়ের মধ্যেও উত্তর না দেও, তবে ইহা তোমার পলায়ন মনে করা হইবে এবং তোমার "জিয়ন" (Zion) শহরের উপর দৈব বিপদ অবতীর্ণ হইবে। যাহা তুমি মসীহ্ নাসেরীর অবতরণের জন্য তৈয়ার করিয়াছ। খোদা আমার দ্বারা ইসলামের জয় প্রদর্শন করিবেন।" এই ইস্তাহারও আমেরিকার বহু কাগজে প্রকাশিত হয়। ১৯০২ ও ১৯০৩ খৃঃ সনের আমাদের মাসিক "রিভিও অব্ রিলিজিয়ন্স" (Review of Religions) পত্রেও ইহার উল্লেখ বিদ্যমান। তারপর ১৯০৭ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারীর এক ইস্তাহারে হযরত মির্যা সাহেব ঘোষণা করিলেন, "খোদা বলিতেছেন, আমি এক তাজা নিদর্শন প্রদর্শন করিব। ইহা দ্বারা মহা জয় লাভ হইবে। ইহা সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন হইবে " ('কাদিয়ানকে আরিয়া আওর হাম' পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

এখন, দেখুন, খোদা কি প্রদর্শন করিলেন। ডুই হযরত মির্যা সাহেবের সহিত প্রতিযোগিতা কালে একজন মহাপ্রতাপান্বিত ব্যক্তি ছিল। অনুবর্ত্তীগণের এক প্রকান্ড জমাতের সে ছিল নেতা। রাজ রাজাদের মত জাঁকজমকের সহিত সে বাস করিতেছিল। দেশবাসী ও স্বধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট সে অত্যন্ত সম্মানিত বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার পূর্ব্বোক্ত গালাগাল এবং হযরত মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর পর তাহার কি হইল, শুনুন ঃ

১) তাহার সম্বন্ধে প্রমাণিত হইল যে, সে মদ্য পান করিত। অথচ, সে মদ্যের বিরুদ্ধে ধর্ম্মোপদেশ দান করিত।

২) আরো প্রমাণিত হইল, সে জারজ ছিল।

৩) তাহার অনুবর্ত্তীরা তাহার প্রতি বীত-শ্রদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিল এবং তাহার কয়েক কোটি টাকা হস্তগত করিয়া তাহাকে তাহার নির্মিত জিয়ন শহর হইতে বিতাড়িত করিল।

৪) তখন তাহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছে মাত্র। তাহার অতি উত্তম স্বাস্থ্য। বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সে একটি তক্তার মত বিছানায় শায়িত হইল।

(৫) পরিশেষে, হযরত মির্যা সাহেবের ১৯০৭ খৃঃ সনের ২০ শে ফেব্রুয়ারীর শেষ ইস্তাহারের সামান্য কয়েক দিন পরেই, অর্থাৎ ১১ই মার্চ, ১৯০৭ খৃঃ অব্দের পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইল যে, ডুই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। ডুই সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা ও ঐতিহাসিকতা দেখার জন্য পড়ুন ওয়াশিংটনের মুবাল্লেগ চৌধুরী খলিল আহমদ নাসের সাহেব প্রণীত 'ডুইকা ইব্রাত্নাক আঞ্জাম।'

দেখুন, ইহা কত মহা প্রতাপান্বিত নিদর্শন স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া হযরত মির্যা সাহেবের হস্তে ইসলামের সত্যতা এবং খৃষ্টীয়ান ধর্মের ভ্রান্ত হওয়া প্রমাণিত হইল! হযরত মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইহা সমগ্র বিশ্বের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত মহা নিদর্শন হইল। কারণ, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহে হযরত মির্যা সাহেব এবং ডুইয়ের প্রতিযোগিতার সংবাদগুলি প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বত্র আলোচিত হইতেছিল। ইহা অপেক্ষা বড় ক্রুশ ভাঙ্গন ও দাজ্জাল কতল আর কি হইতে পারে? যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি দেখুন। ('হকিকাতুল্-অহি' এবং Review of Religions vol.6 দেখুন)।

মোট কথা, হযরত মির্যা সাহেব চারিটি বিভিন্ন দিক হইতে ক্রুশ ভাঙ্গিবার এবং দাজ্জাল কতল করিবার কার্য সম্পন্ন করেন। যথা ঃ-

প্রথম, যে সকল আভ্যন্তরীণ মতভেদের ফলে ইসলাম দুর্নামগ্রস্ত হইতেছিল এবং বিধর্মীরা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে উৎসাহিত হইতেছিল, প্রবল যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তিনি তাহা স্খালন করেন।

দ্বিতীয়, তিনি বিশুদ্ধ যুক্তি ও ধর্ম্ম-পুস্তকীয় প্রমাণের দ্বারা খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের মৌলিক বিশ্বাসগুলি মূল-তত্ত্ব হিসাবে খণ্ডন করেন। তাঁহার প্রদত্ত যুক্তি-প্রমাণের ফলে উজ্জল দিবালোকের সৃষ্টি হয়। খৃষ্টীয়ানেরা এক মহা তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়।

তৃতীয়, তিনি ক্রুশের ঘটনা, মসীহ্‌র মৃত্যু এবং মসীহ্‌র কবর সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গবেষণা দ্বারা জ্ঞানমূলক উপায়ে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের উপর যে আঘাত করেন তাহাতে ইহার মূল কর্ত্তিত হয়।

চতুর্থ, দোয়া, 'রুহানী মোকাবিলা' (আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতা) এবং মহা শক্তিশালী ঐশী-নিদর্শন সমূহের সহযোগে তিনি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রদর্শন করেন।

এই চারি প্রকার উজ্জল আলোকচ্ছটার ফলে যে সকল ব্যক্তি মাতৃগর্ভ হইতেই পেচক স্বভাব নিয়া জন্মগ্রহণ করে তাহাদের ছাড়া, অন্য কেহই ইসলামের জয় এবং খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মের পরাজয় সম্বন্ধে কখনও সন্দিহান হইতে পারে না।

'আল্লাহুম্মা সাল্লে আলাইহে ও আলা মাতায়েহী মুহাম্মাদিন্ সালাতান্ ও সালামান দায়েমান ও বারেক ও সাল্লিম।'

(আল্লহ! তোমার মহান অপেক্ষা মহানতর অনুগ্রহ সমূহ তাঁহার উপর এবং তাঁহার পথ প্রদর্শক নবী মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র উপর বর্ষণ কর-তোমার অসীম অনন্ত সালাত, সালাম, বরকত ও রহমত বর্ষণ কর)।

আর্যদের সহিত হযরত মির্যা সাহেবের সংগ্রাম ঃ

তারপরই হইল আর্য্য ধর্ম্ম। আর্য্য সমাজীরা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের নেতৃত্বে ধর্ম্মোত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যাপারে খৃষ্টীয়ানদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু গালাগালি ও কুৎসিত বাক্য প্রয়োগে তাহাদিগকেও অতিক্রম করে। ইহাদের লেখা ও বক্তৃতা ইসলামে শত্রুতা এবং ইসলাম-প্রতিষ্ঠাতার প্রতি মহা বিদ্বেষিতায় পরিপূর্ণ। কোন জাতিই ইহাদের ন্যায় কুবাচ্য প্রয়োগ করে নাই। 'রুহানিয়তের'র সহিত উহাদের দুরবর্ত্তী সম্বন্ধও নাই। ইহারা ইহাদের মূর্খতাপূর্ণ ধারণাসমূহে সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, বাহিরের আলো দেখিলেই তাহাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। হযরত মির্যা সাহেব ইহাদের সম্বন্ধে চমৎকার লিখিয়াছেন ঃ-

"কিড়া যু দব্ রাহা হায়্য গোবর কি তহ্‌কে নীচে, উস্‌কে গুমান মে উস্কা আরদ্ ও সামা ওহী হায়্য।"

"গোবরের নীচে আবদ্ধ কীটের নিকট উহাই তাহার আকাশ ও পাতাল।"

তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহা ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইবার আদৌ যোগ্য নয় বরং তাহাদের স্বকপোল একটি দার্শনিক মত মাত্র। অবশ্য, তাহাদের একটি সৌন্দর্য্য আছে। তাহারা ইস্‌লামের শিক্ষা এবং পারিপার্শ্বিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া প্রতীমা পূজার বিরুদ্ধে হিন্দুদের মধ্যে বেশ চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে তাহারা কিছুটা সাফল্যও লাভ করিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুর্ত্তি পূজা হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া ইহারা এক ভয়াবহ সঙ্কাটাপন্ন স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে, যাহার ভীষণ পরিণাম মুর্ত্তির উপাসনা হইতে কম নয়। সবচেয়ে খারাপ, অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহের মান্য ব্যক্তিগণকে গালি দেওয়া ইহাদের আদর্শ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। নিম্ন বর্ণিত দুইটি স্তম্ভের উপর ইহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত।

প্রথম, খোদা 'আত্মা ও পরমাণুর স্রষ্টা নহেন। উহাদের লইয়া ভাঙ্গা-গড়া করা মাত্র তাঁহার কাজ। সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় ইহারা অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। অন্য কথায়, আত্মা ও মৌল (পরমাণু) খোদার ন্যায় অনাদি ও অনন্ত। খোদা এইগুলি সৃষ্টিও করিতে পারেন না, ধ্বংসও করিতে পারেন না। শুধু আকার-আকৃতির হেরফের দ্বারা তিনি আধিপত্য করিতেছেন।

দ্বিতীয়, এই ধর্ম্ম-মতের অপর স্তম্ভ হইল পুনর্জন্ম। আত্মারা কর্ম্মফলে বিভিন্ন রূপ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। জন্ম পরিগ্রহের এই চক্র হইতে আত্মাসমূহ কখনো মুক্তি পায় না।

যদি কেহ ভাল কাজ করে, ভাল জন্মলাভ করে। দুষ্কার্য্য সম্পন্ন ব্যক্তি কুজন্মগ্রস্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির আদি অবধি এই প্রকার জন্ম চক্র চলিতেছে, চলিতে থাকিবে। কেহ মুক্তি পাইলে ইহা শুধু সাময়িক। আত্মা পুনরায় যোনি গ্রহণে বাধ্য হয়। কারণ. আর্য্য মহাশয়গণের মতে সসীম কর্ম্মের অসীম ফল পাওয়া যায় না।

এতদ্ব্যতীত, আর্য্যদের ইহাও ধর্ম্ম-বিশ্বাস যে, খোদার এল্‌হাম, তাঁহার প্রত্যাদেশ বাণী হওয়া শুধু আর্য্য ভারতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। অন্য কোন জাতি এই সম্পদ লাভ করে নাই। ইহাদের মতে, শুধু বেদ-ই একমাত্র গ্রন্থ, যাহা আদিকাল হইতে মানুষ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই অনন্তকাল ব্যাপী ধর্মপথ প্রদর্শন করিবে। বেদের পর হইতে প্রত্যাদেশ আসা চিরতরে বন্ধ। ইহারা দাবী করে, আদি যুগে প্রদত্ত গ্রন্থই মাত্র প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ। তারপর, তাহাদের ধারণা, ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করিতে পারেন না। তৌবা সত্ত্বেও মানুষ দুষ্কৃতির সাজা অবশ্যই পাইবে। **তারপর,** গার্হস্থ্য জীবন সম্বন্ধে তাহাদের মত, কাহারো পুত্র সন্তান না হইলে পুত্র প্রাপ্তির জন্য পুরুষ তাহার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের দ্বারা সহবাস করাইবে এবং এগারটি পুত্র সন্তান লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কর্ত্তব্য পালন করিবে। এই প্রথাটি **'নিয়োগ'** নামে অভিহিত।

এই হইল, সংক্ষেপে, অধুনা "আর্য্য" নামে পরিচিত হিন্দু মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত। ইহারা দাবী করে যে, হিন্দুদের মধ্যে শুধু ইহারাই বেদের প্রকৃত শিক্ষা পালন করে এবং অপরাপর সকল সম্প্রদায়ই মূল পথ ত্যাগ করিয়াছে। এই সম্প্রদায় ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে পরলোকগত পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীকে ইহাদের নেতা বলিয়া মনে করে।

এই প্রারম্ভিক প্রস্তাবনার পর, হযরত মির্যা সাহেব এই সম্প্রদায়ের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে যে ব্যবস্থা করেন আমরা বলিতেছি। প্রথমে আমরা যুক্তি এবং শাস্ত্রীয় আলোচনার বিষয় গ্রহণ করিতেছি। তারপর, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, রুহানী মোকাবিলার কথা উল্লেখ করিব। আর্য্যদের সহিত হযরত মির্যা সাহেবের প্রকাশ্যতঃ মোকাবিলা আরম্ভ হয় ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর যখন সংবাদ-পত্র সমূহে এই ঘোষণা প্রকাশিত হয় যে আত্মার সংখ্যা অনন্ত। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে পরমেশ্বরও তাহা জ্ঞাত নহেন। এই জন্য তাহারা সর্ব্বদাই মুক্তি লাভ করিতে থাকিবে, তাহাদের মুক্তি কখনো শেষ হইবে না। এই সম্পূর্ণ প্রান্ত মতটি প্রকাশিত হইলে হযরত মির্যা সাহেবই সর্ব্বপ্রথম ইহার প্রতিবাদ করিলেন। তিনি এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অতি শক্তিশালী এবং মুখ বন্ধকারী উত্তর সহ সংবাদ-পত্র সমূহে প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিলেন এবং উত্তর প্রদানকারীর জন্য পাঁচ শত টাকা পুরস্কারও ধার্য্য করিলেন। এই সকল প্রবন্ধের ফলে আর্য্য শিবির প্রকম্পিত হইল। ইতঃপূর্ব্বে তাহাদের আক্রমণাত্মক কার্য্যকারিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। তাহারা সন্নিপাতগ্রস্ত রুগীর ন্যায় আচরণ করিয়া যাইতেছিল। এ দিকে হযরত মির্যা সাহেবের সাধনা লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচরে ছিল। তাঁহাকে কেহও জানিত না। কিন্তু তাঁহার এই সকল প্রবন্ধের ফলে লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আর্য্যেরাও বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হইল। তাহাদের কোন কোন বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলন যে, আত্মার সংখ্যা অনন্ত হওয়া পণ্ডিত দয়ানন্দ মহাশয়ের ব্যক্তিগত ধারণা। ইহার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। লালা জীবন দাস মহাশয় তখন লাহোর আর্য্য সমাজের সেক্রেটারী ছিলেন। আর্য্যদের মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট প্রধান ব্যক্তি। তিনি সংবাদ-পত্রে ঘোষণা করিলেন, "এই মতটি সমাজের মূল মন্ত্রগুলির অন্তর্গত নয়। যদি সমাজের কোন সভ্য ইহার দাবী করেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকেই ইহার উত্তর দিতে হইবে" (হযরত শেখ ইয়াকুব আলী তুরাব এরফানী কৃত "হায়াতুন্-নবী" দ্রষ্টব্য)। তিনি আরো লিখিয়াছিলেন, "আর্য্যগণ স্বামী দয়ানন্দকে অবশ্যমান্য নেতা বলিয়া মনে করেন না। সেজন্য তাঁহার যাবতীয় মতাবলী আর্য্য সমাজের সকলেরই স্বীকার করা জরুরী নয়।" সুব্হানাল্লাহ্! ইহা কত বড় বিজয় ছিল, যাহা আর্য্যদের উপর হযরত মির্যা সাহেব লাভ করেন। একটি মাত্র আক্রমণেই তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

কিন্তু আরো নিন্। তিনি উপর্য্যুপরি প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ দ্বারা পণ্ডিত দয়ানন্দ মহাশয়কে তাঁহার দৃষ্টিতে আত্মারা অনন্ত হওয়ার দাবী প্রমাণ পূর্ব্বক ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণের জন্য আহ্বান করিতে থাকেন। ইহাতে স্বামীজীর পক্ষে গা ঢাকা দেওয়া অসম্ভবপর হইয়া পড়িল। তিনি স্বস্থানে দাঁড়াইতেও পারেন না, সরিতেও পারেন না। অনন্যোপায় হইয়া হযরত মির্যা সাহেবকে জানাইলেন যে, আত্মারা প্রকৃতপক্ষে অনন্ত না হইলেও পুনর্জন্ম সত্য। পাঠক ভাবুন, বেদ হইতে সনদ গ্রহণ দ্বারা স্বামীজী একটি ধর্ম্মমত উপস্থিত করিয়াছিলেন। মতটি ধর্ম্মের মূল সূত্রগত। কিন্তু মির্যা সাহেবের গোলাবর্ষণে তিনি এই ধর্ম্মমত হইতে পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইলেন। আর্য্য সমাজের স্বনাম খ্যাত নেতার-ইহার প্রবর্ত্তকের এই প্রকার পৃষ্ঠ প্রদর্শন অপেক্ষা আর কিরূপ প্রকাশ্য বিজয়লাভ সম্ভবপর? এই বিজয় এরূপ দেদীপ্যমান ছিল যে, "বেরাদরে হেন্দ্" নামক পত্রের সম্পাদক পণ্ডিত শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রী স্বামীজীর প্রতি আস্থাবান না হইলেও একজন হিন্দু স্বরূপে এবং ইসলামের একজন শত্রু স্বরূপে "মির্যা গোলাম আহমদ, রয়িসে কাদিয়ান এবং আর্য্যসমাজ" শীর্ষাধীনে তাঁহার কাগজে লিখিলেন, "যখন মির্যা সাহেব তাঁহার সমালোচনা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, 'উল্লিখিত মতটি ভ্রান্ত, তখন স্বামীজী গত্যন্তর অভাবে মির্যা সাহেবের নিকট খবর করিলেন যে, 'আত্মারা বস্তুতঃ অন্তশূন্য না হইলেও পুনর্জন্মবাদ সত্য।" ('আহমদীয়া পত্রাবলী' ও 'বেরাদরে হেন্দ,' জুলাই ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে)

ইহার পর আর্য্যেরা আত্মার সংখ্যা অন্তহীন হওয়া এবং খোদা উহাদের সংখ্যা না জানা সংক্রান্ত বিশ্বাস পরিহার করে এবং তদস্থলে এই মত গ্রহণ করে যে আত্মা সকল সীমাবদ্ধ সংখ্যক হইলেও উহারা অনন্ত ব্যাপী মুক্তি লাভ করিতে পরে না বলিয়া পুনর্জন্মের চক্রও ক্ষান্ত হইবার নয়।

পণ্ডিত দয়ানন্দ মহাশয় চুপ করিলে পর আর্য্য ক্যাম্পের অপর একজন বিখ্যাত মহারথী সংগ্রামার্থে অগ্রসর হইলেন। ইনি হইলেন অমৃতসরের আর্য্য সমাজের সেক্রেটারী বাবা নারায়ণ সিংহ। প্রথমে তিনি বড়ই উৎসাহ এবং তূর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করেন এবং যে স্থানে তাঁহার গুরুদেব স্বামীজীও দাঁড় থাকিতে পারেন নাই, তিনি সেখানেও দাঁড়াইতে চাহিলেন। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের দুই এক বারের আঘাতেই তিনি সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হইয়া পড়িলেন এবং এরূপ নীরব হইলেন, যেন তিনি কখনো কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার চুপ করা হইতেও বড় কিছু একটা হইল। সে কি? এক কালে আর্য্য সমাজের একজন বিশিষ্ট ও অতি গরম পন্থী নেতা, বাবা নারায়ণ সিংহ আর্য্য সমাজ ছাড়িয়া তাঁহার সনাতন সমাজে প্রত্যাগমন করিলেন। আল্লাহরই মহিমা! হযরত মির্যা সাহেবের দ্বারা ইসলাম কত গৌরবময় বিজয় লাভ করিল!

এখন, আরো আগে চলুন। এই সংগ্রামের পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আর্য্য সমাজ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু পরে দুইজন শীর্ষস্থানীয় নেতা যুদ্ধাসরে উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা ছিলেন মুন্‌শি ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী এবং পণ্ডিত লেখরাম পেশোওরী, পরে লাহোরী। শেষোক্ত ব্যক্তিরা আর্য্য সমাজে স্বামী দয়ানন্দজীর পরেই স্থান ছিল, বরং কোন কোন দিক দিয়া স্বামীজী অপেক্ষাও উচ্চ স্থান ছিল। এই উভয় ব্যক্তিই ইসলামের চরম শত্রু। কঠোর ভাষা প্রয়োগ এবং গালাগালির ব্যাপারে ইঁহাদের কোনই তুলনা নাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের সহিত ইঁহাদের সংগ্রাম চলিতে লাগিল। তারপর, যে প্রকারে এই সংগ্রামের অবসান হয় তাহাও ইসলামের ইতিহাস, বিশেষতঃ আমাদের সেল্‌সেলার ইতিহাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও মহাস্মরণীয় ঘটনা বটে। কিন্তু যেহেতু আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ('রুহানী মোকাকিলার') সহিত ইহার সম্বন্ধ, তজ্জন্য তদনুসঙ্গেই ইহার উল্লেখ করা হইবে।

অতপর, ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে হোশিয়ারপুরে হযরত মির্যা সাহেবের সহিত একজন উগ্রপন্থী আর্য্য, মাষ্টার মুরলী ধরের মোবাহাসা হয়। ইহাতে মাষ্টারের শোচনীয় পরাজয় হয় ('সুর্ম্মা-চশ্‌মে আরিয়া' দেখুন)। এই মোবাহাসার বিবরণসহ হযরত মির্যা সাহেব 'সুর্ম্মা চশমে আরিয়া' নামক এক অতি উচ্চ শ্রেণীর কেতাব লিখেন। শত্রুগণ এই গ্রন্থের কোন উত্তর লিখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়াছে। ইহার পর তিনি আরো এক জবরদস্ত কেতাব 'শাহ্‌নায় হক্' দ্বারা প্রমাণের কার্য্য সমাধা করেন। তদ্দারা আর্য্যদের ধর্ম্মীয় মূল সূত্রগুলির নিপাত সাধন হইল। 'সুর্ম্মা চশ্‌মে আরিয়াতে' আত্মা ও মৌলের অনাদি অনন্ত হওয়ার এবং পুনর্জন্ম প্রভৃতি বিষয়ের যৌক্তিক ও বাকরুদ্ধকারী সমালোচনা করা হয়। ইহা উত্তরশূন্য হওয়ার কোন তুলাই নাই। তিনি প্রমাণ করিলেন যে আত্মা ও মৌল অনাদি হইলে খোদাতা'লার গুণাবলী দোষিত হইয়া পড়ে। কারণ, ইহা স্বীকার করিলে খোদাতা'লার কোন কোন গুণাবলীও ছাড়িতে হয় এবং ঐ সকল গুণাবলী মোটামুটিভাবে আর্য্য মহাশয়েরাও মান্য করেন। দৃষ্টান্তস্থলে, স্রষ্টা ও কর্ত্তা হওয়ার গুণদ্বয়। হযরত মির্যা

সাহেব প্রমাণ করিলেন যে, ভ্রান্ত আবেক্ষণ ও ভ্রান্ত কল্পনার ফলে আত্মা ও মৌলের অনাদী হওয়া এবং পুনর্জন্মবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। অর্থাৎ খোদাতা'লাকে সৃষ্টির প্রযোজ্য বিধানের দ্বারাই ওজন করা হইয়াছে। তারপর, প্রাকৃতিক বিধান এবং আত্মিক বিধানের মধ্যে তারতম্য করা হয় নাই। উভয় বিধানকে একই মনে করা হইয়াছে। অথচ ইহারা পৃথক বিধান এবং ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র পৃথক। তারপর, প্রত্যাদেশ শুধু বৈদিক যুগ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়া এবং বেদের পর হইতে চিরতরে বন্ধ হওয়ার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে, ইহা এক মারাত্মক ভ্রম। ইহা দ্বারা ঈমানের বৃক্ষ দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়। ঈমানের বৃক্ষকে খোদার নিদর্শনাবলী এবং খোদার এলহামের দ্বারা তাজা পানি দেওয়া না হইলে শুস্ক হইয়া পড়ে। ইহা সবুজ ও সজীব না থাকিয়া শুধু গল্পের বিষয়ীভূত হয়। যে ধর্ম্ম প্রত্যাদেশের দরজা বন্ধ করে, ঐ ধর্ম্ম মৃত। কারণ, উহার নিকট শুস্ক গল্প ব্যতীত আর কিছুই নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে, শুধু বেদকে প্রত্যাদেশ মনে করা প্রকারান্তরে খোদাতাআলার "রাব্বুল্ আলামীন" (সর্ব্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক) হওয়া গুণের অস্বীকৃতি মাত্র। খোদা শুধু আর্য্য ভারতেই খোদা নহেন। তিনি সারা বিশ্বের খোদা। সর্ব্বকালীন ও সর্ব্বদেশীয় মানবের নিকট তিনি জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহার এল্হাম অবতীর্ণ করিয়াছেন। এবং তাঁহার রসূলগণকে পাঠাইয়া আসিয়াছেন। পরিশেষে, পূর্ণ পথ প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার পূর্ণ ধর্ম্মবিধান মোহাম্মদ রসুলুল্লুহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহীও সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেন। কোরআন শরীফ সর্ব্বজাতি ও সর্ব্বকালের জন্য প্রদত্ত হয়। কারণ, পৃথিবী এমন অবস্থা এবং এমন যুগে উপনীত হইয়াছিল যে, সকল যুগ ও সকল জাতির উপযোগী ধর্ম্ম-ব্যবস্থা এখন অবতীর্ণ করা যাইত। কিন্তু ইহার পরেও খোদা এল্হামের দরজা বন্ধ করেন নাই। প্রত্যাদেশ প্রেরণ রুদ্ধ হয় নাই। ইহা এখনো খোলা আছে এবং খোলাই থাকিবে। সীমাবদ্ধ কর্ম্মের সীমাহীন ফল না পাওয়া সম্বন্ধে হযরত মির্যা সাহেব বলিলেন, অবশ্যই মানুষের কর্ম্মের সীমা আছে, কিন্তু ভক্ত পূজারীর সঙ্কল্প, তাহার আগ্রহ কখনো সসীম নহে। সুতরাং, ইহার ফল সসীম হওয়ার কোনই হেতু নাই। তারপর কর্ম্মের সীমা থাকা মানুষের আপন ইচ্ছাধীন নহে। ইহা খোদার কাজ। কারণ, মৃত্যু না হইলে- এবং ইহা খোদার কাজ- প্রত্যেক সাধু ব্যক্তিই চিরদিন সৎকাজ করিবার সঙ্কল্প পোষণ করিতেন। তারপর, প্রকৃত তৌবার পরেও খোদা গোনাহ্ মাফ না করিলে ইহা এরূপ জঘন্য ব্যাপার হয় যে, মানব প্রকৃতি উহা সহ্য করিতে পারে না। যাহা মানুষের মধ্যে থাকাও প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, আর্য্য সমাজীরা তাহা খোদার মধ্যে পাইতে পছন্দ করেন না। তারপর, 'নিয়োগ' অতি গর্হিত, অতিশয় নির্লজ্জ ক্রিয়া। কোন গয়রতমন্দ মানুষ ইহা সহ্য করিতে পরে না। বস্তুতঃ, তিনি আর্য্যদের সাকুল্য ধর্ম্মমতের অত্যন্ত গভীর ও সন্তোষজনক সমালোচনা করিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা উহাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তারপর উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের ন্যায় তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বৈদিক শিক্ষা একেবারেই অসম্পূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত এবং শেরেকে পরিপূর্ণ। এই শিক্ষা মানুষের মধ্যে প্রকৃত ইমান ও আত্মশুদ্ধি আনয়ন করিতে অক্ষম।

হযরত মির্যা সাহেবের এই সকল ব্যাখ্যার ফলে আর্য্যদের দন্ত টক্ হইয়া পড়ে। এমন কি কেহ কেহ সেই সময়ে তাঁহাকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করে এবং তন্মধ্যে তাঁহার নিকট নাম-শূন্য চিঠি-পত্র দেয়। ('শাহ্নায়ে-হক্' দেখুন)। কিন্তু অত্যন্ত নির্বিকারভাবে, শান্ত মনে তিনি তাঁহার কাজে নিরত থাকেন এবং 'আর্য্য ধর্ম্ম', 'নসীমে-দাওয়াত,' 'সনাতন ধর্ম্ম,' 'কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম' প্রভৃতি অত্যন্ত জবরদস্ত কেতাবগুলি প্রণয়ণের দ্বারা আর্য্যদের ধ্বংসোন্মুখ দুর্গের উপর আরো বোমাপাত করেন। অবশেষে, ১৯০৭ সালে আর্য্যেরা লাহোরে 'আচ্ছুওয়ালী' নামক স্থানে এক ধর্ম্ম-সভার আয়োজন করে। ইহাতে যোগদানের জন্য তাহারা হযরত মির্যা সাহেবকেও আমন্ত্রণ করে। তিনি একটি অতি উপাদেয় মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু আর্য্যেরা তাহাদের ওয়াদার খেলাফ এবং আতিথেয়তার নিয়ম নিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিরোধিতা দ্বারা তাহাদের বক্তৃতায় জঘন্যতম কুবাচ্য করে এবং উস্কানিমূলক উক্তি ও অন্তরে পীড়া দায়ক বাক্য ব্যবহার করে। ইসলাম এবং ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার উপর জঘন্য আপত্তি সমূহ আরোপ করে। এই সভার সংবাদ হযরত মির্যা সাহেব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার ইসলামী গয়রত উদ্বেলিত হয়। ইহাতে তিনি তাঁহার অতুলনীয় মহাগ্রন্থ 'চশ্‌মায়ে-মারফত' প্রণয়ন করেন। অন্য কথায়, তিনি প্রকৃতই তাঁহার লেখনীর দ্বারা 'মারেফাত' বা তত্ত্ব-জ্ঞানের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিলেন। তর্কযুদ্ধক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার শেষাস্ত্র, যাহা তিনি আর্য্য শিবিরের উপর নিক্ষেপ করেন। কেহ এই কেতাব পাঠ করিলে, অনুভব করিতে পারেন যে, খোদা সেই হস্তে কত মহাশক্তি দিয়াছিলেন, যাহা এই মহাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। বদ্ধপরিকর শত্রুতা কখনো চুপ হয় না। কিন্তু তাহার নীচ ও হীন আচার বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে বলিয়া দেয় যে, আঘাত সাংঘাতিক! জীবন রক্ষা হইবে না। বাস্তবিক যিনি ইসলামের খেদমতের উদ্দেশ্যে 'সূর্ম্মা-চশ্‌মে-আরিয়া এবং' চশ্‌মায়ো মারেফাত' হাতে লইয়া বাহির হইবেন, তিনি আর্য্য ভারতের যেখানেই যাইবেন, বিজয়ধজা তাঁহার পদযুগল চুম্বন করিবে।

এখন, আমরা 'রুহানী মোকাবিলা' বা আত্মিক সংগ্রামের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। প্রথম, আর্য্য সমাজের নেতা ও প্রবর্ত্তক স্বামী দয়ানন্দ তখনো জীবিত। হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সংবাদ লাভ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে স্বামীজীর আয়ুস্কাল শেষ হইয়াছে। শীঘ্রই তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিবেন। বহু আর্য্যকে তিনি সংবাদটি বলিলেন। ইহার অনতি কাল পরেই স্বামীজী অনুবর্ত্তীদিগ হইতে চির বিদায় হইলেন। ('হকিকতুল্ অহি' দেখুন)

ইহার পর পূর্ব্বোল্লিখিত মুনশি ইন্দ্রমন মোরদাবাদী সংগ্রামার্থে উপস্থিত হইলেন। তিনি অত্যন্ত উগ্র ও মুখ-খারাপ লোক ছিলেন। ইঁহার বাক্যের নমুনা দেখিতে হইলে 'কেতাবুল বারিয়া' দেখা কর্ত্তব্য। উহাতে হযরত মির্যা সাহেব অ-মোসলিমগণের অপ্রীতিকর কথাগুলি দৃষ্টান্ত স্বরূপ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

১৮৮৫ সন হযরত মির্যা সাহেব যুক্তি-প্রমাণের চরমত্বের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করিলেন যে বিশিষ্ট স্থানীয় কোন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি এক বৎসর কাল তাঁহার নিকট কাদিয়ান অবস্থান করিয়া যদি এই সময়ের মধ্যে ইসলামের সত্যতা নির্দ্দেশক কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করে, তবে এইরূপ ব্যক্তিকে তিনি মাসিক দুই শত টাকা হিসাবে নগদ চব্বিশ শত টাকা প্রদান করিবেন এবং ঐ ব্যক্তি কোন ঐশী নিদর্শন অবলোকন করিলে কাদিয়ানেই তাহাকে মোসলমান হইয়া তাহার ইসলাম আনয়ন ঘোষণা করিতে হইবে। টাকার সম্বন্ধে যেভাবে ইচ্ছা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিয়া নেওয়া যাইবে। এই ঘোষণার পর মুন্‌শি ইন্দ্রিমন মহাদর্পে উঠিয়া সম্মুখীন হওয়ার জন্য প্রস্তুতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে টাকা দেখাইবার জন্য এবং তাঁহার সম্মুখে কোন বিশ্বস্ত স্থানে টাকা আমানতস্বরূপ জমা করিবার জন্য ইন্দ্রমন দাবী করিয়া লিখিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইন্দ্রমন নাভ্ হইতে লাহোরে পৌঁছিলেন। হযরত মির্যা সাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শিষ্য মিঞা আবদুল্লাহ্ সাহেব সনৌরীকে (রাঃ) কাদিয়ান হইতে রওয়ানা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে লাহোরস্থ কোন কোন বন্ধুর নিকট পত্র দিলেন এবং তথা হইতে টাকা লইয়া ইন্দ্রমন মুন্‌শির নিকট যাওয়ার জন্য তাকিদ করিলেন। তিনি লাহোর পৌঁছিলেন এবং তথাকার কোন কোন বন্ধুর সহিত একযোগে ইন্দ্রমন মহাশয়ের নিকট রাত্রেই লিখিতভাবে খবর করিলেন যে, তাঁহারা টাকা সহ প্রাতে আসিবেন। তিনি যেন বাড়ীতে থাকেন। রাতে টাকা যোগাড় করিয়া ভোরে তাঁহারা ইন্দ্রমন মহাশয়ের বাড়ী পৌঁছিলেন। কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, মুন্‌শি ইন্দ্রমন সাহেব বাড়ীতে নাই। সংবাদ লইয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে রাত্রেই ট্রেনযোগে কোথাও চলিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্রমন মহাশয়ের 'রুহানী মোকাবিলা'-তাঁহার আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এখানেই সমাপ্ত হইল। বাড়ীতে যাইয়া তিনি পলায়নের কথা ঢাকিবার প্রচেষ্টা করিলেন সত্য, কিন্তু সূর্য্য কি মাটি দিয়া ঢাকা যায়? ('তবলীগে রেসালত' দ্রষ্টব্য)

ইহার পর, **পণ্ডিত লেখরামের পালা** আরম্ভ হয়। এই পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত কুবাচ্য পরায়ণ, উদ্ধত স্বভাবাপন্ন, দুর্মতি বিশেষ ছিলেন। তাঁহার মুখ ও কলম উভয়ই ছুরিকার মত চলিত। ইনি হযরত মির্যা সাহেবের সম্মুখীন হওয়ার জন্য কাদিয়ান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের নিকট কয়েক দিন অবস্থানের পর প্রস্থান করেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষাও উদ্ধত হইয়া পড়েন। তিনি হযরত মির্যা সাহেবের নিকট 'নিদর্শন' চাহিলেন। হযরত মির্যা সাহেব ইঁহার সম্বন্ধে দোয়া করিলে উত্তর স্বরূপ যে এলহাম পাইলেন, তাহা তিনি ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সন এক ইস্তাহারের দ্বারা প্রকাশ করিলেন। নিম্নে উহা প্রদত্ত হইলঃ

"অবহিত হউন, এই অধম ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সনের ইস্তেহারে যাহা সেই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল, ইন্দ্রমন মোরাদাবাদী এবং লেখরাম পেশাওরীকে এই আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলাম যে তাঁহারা আগ্রহ করিলে তাঁহাদের নিয়তি সম্বন্ধে কোন কোন

ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হইবে। ঐ ইস্তেহারের পর ইন্দ্রমন ত পশ্চাদপদ হয় এবং কিছুকাল পর তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু লেখরাম মহাদুঃসাহসিকতার সহিত একখানা কার্ড এই অধমের নিকট এই মর্মে প্রেরণ করিল যে, তাহার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণীই ইচ্ছা প্রকাশ করা হউক, সে তাহাতে সম্মত আছে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে ধ্যান করা হইলে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর তরফ হইতে এই এল্হাম হইলঃ

"ইজ্লুন্ জাসাদুন্ লাহু খুআর, লাহু নাসাবুন্ ও আযাব"

অর্থাৎ, "ইহা একটি প্রাণহীন গোবৎস। উহা হইতে এক প্রকার ঘৃণিত শব্দ বাহির হইতেছে। তাহার জন্য ঐ সকল অশ্লীলতা ও বেআদবীর ফলস্বরূপ শাস্তি, দুঃখ এবং আযাব সুনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে তাহা অবশ্যই ভোগ করিবে। অতঃপর, আজ ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সোমবার এই আজাবের সময় জানিবার জন্য মনোনিবেশ করা হইলে খোদাওন্দ করীম আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, **অদ্যকার তারিখ অর্থাৎ, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ সন হইতে ছয় বৎসরের মধ্যে এই ব্যক্তি তাহার কুবাচ্যের সাজা স্বরূপ অর্থাৎ, যে সকল বে-আদবী সে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের প্রতি করিয়াছে, ঐ সকলের সাজা স্বরূপ ভীষণ 'আযাবে' নিপতিত হইবে।** সুতরাং, এখন, আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ দ্বারা সমস্ত মোসলমান, আর্য্য, খৃষ্টীয়ান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট জ্ঞাপন করিতেছি, যদি এই ব্যক্তির উপর ছয় বৎসরের মধ্যে আকিজার তারিখ হইতে এরূপ কোন আজাব নাজেল না হয়, যাহা সাধারণ দুঃখের অতি উর্দ্ধে, আলৌকিক এবং 'এলাহী হয়বত'-ভীতি সম্পন্ন হইবে, তবে জানিবে যে আমি খোদাতা'লার তরফ হইতে নই এবং তাঁহার রূহ্ হইতে আমি এই কথা বলিতেছি না। যদি আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হই, তবে যে কোন প্রকার দণ্ড ভোগের জন্য আমি প্রস্তুত। আমি রাজী আছি, যেন গলায় দড়ি দিয়া আমাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।"

১৮৯৩ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সেই ইস্তাহারেরই প্রারম্ভে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম লেখরাম সম্বন্ধে ফারসীতে কয়েকটা পদাবলী লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয় পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ-

"আলা, আয় দুশ্মনে নাদান ও বেরাহ্, বেতার্স আজ্ তেগে বুর্রাণে মোহাম্মদ। রাহে মৌলা কেহ্ গুম্ কর্দান্দ, মরদুম্ বেজু দর আল ও আইওয়ানে মোহাম্মদাআলা, আয় মন্কের্ আয শানে মোহাম্মদ! কেরামত গর্চে বেনাম ও নেশানাস্ত, বিয়া বেঙ্গের যে গিলমানে মোহাম্মদ।"

অর্থাৎ "সাবধান হে অজ্ঞ ও বিপথচারী শত্রু! (তুমি তোমার মুখের ছোরা সামলাও এবং) মোহাম্মদ রসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের সুতীক্ষ্ণ তরবারীকে ভয় কর। আল্লাহ্তা'লা পর্যন্ত পৌছার যে পথ লোকেরা হারাইয়া ফেলিয়াছে, আস এবং

মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে আলিহী ও সাল্লামের আধ্যাত্মিক সন্তান ও তাঁহার আনীত ধর্ম্মের সাহায্যকারীদের মধ্যে তালাস কর। হাঁ, ওহে মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ আঃ) মর্য্যাদা এবং তাঁহার প্রকাশ্য জ্যোতির অস্বীকারকারী, যদিও এ যুগে 'কেরামত' বা আলৌকিকতা অস্তিত্বশূন্য হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু আস, মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ আঃ) গোলামদের নিকট আসিয়া দেখ।"

তারপর, ১৮৯৩ ২রা এপ্রিল একটি ইস্তাহার দ্বারা তিনি ঘোষণা করেন ঃ- "আজ ২রা এপ্রিল ১৮৯৩, মোতাবেক ১৪ ই রমযান ১৩১০ হিঃ প্রাতঃকালে অল্প তন্দ্রাবশে আমি দেখিতে পাই যে, আমি এক প্রশস্ত বাড়ীতে বসা আছি এবং কতিপয় বন্ধুও আমার পার্শ্বে আছেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি বলবান, ভীতিজনক আকৃতি বিশিষ্ট, যেন তাহার চেহারা হইতে রক্ত ঝরিতেছে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার প্রতি চাহিয়া দেখায় লোকটি অভিনব প্রকৃতির বলিয়া বোধ হইল; যেন সে মানুষ নয়- কঠোর শাস্তি দাতা ফেরেস্তাগণের একজন। তাহার প্রতাপ সকলেরই মনে জাগিল। আমি তাহাকে তাকাইয়া দেখিতেছি, ইতঃমধ্যে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'লেখরাম কোথায়'? তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, লেখরাম এবং অপর এক ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়ার জন্য লোকটি আদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অপর লোকটি কে ছিল স্মরণ নাই।" (তবলীগে রেসালত" দ্রষ্টব্য)

তারপর, তিনি ১৮৯৩ খৃঃ অব্দেই তাঁহার কেতাব 'বরকাতুদ-দোয়াতে' স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন সাহেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক লিখিয়াছিলেন ঃ-

(ইয়ানে 'দুয়ায়ে মৌতে লেখরাম")।

অর্থাৎ, 'ওহে এই যে কহিতেছ! যদি দোয়ার কোনও ক্রিয়া-শক্তি থাকিয়া থাকে, তবে উহা কোথায়? আস, আমি তোমাকে দোয়ার ক্রিয়া দেখাইব। তুমি খোদার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম মহিমা সমূহ অস্বীকার করিও না। যদি দোয়ার ক্রিয়া দেখার অভিলাস থাকে, তবে আস, আমার এই দোয়ার ফল দেখ। ইহার সম্বন্ধে খোদা আমাকে জানাইয়াছেন যে, ইহা কবুল হইয়াছে, অর্থাৎ লেখরাম সম্বন্ধে আমার দোয়া।"

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "দোয়ায়ে মুস্তাজাব" ('এই দোয়া কবুল হইয়াছে') লিখিত হওয়ার সঙ্গেই "ইয়ানে দোয়ায়ে মৌতে লেখ্‌রাম" (অর্থাৎ, 'লেখরামের মৃত্যু সম্বন্ধে দোয়া) পার্শ্বস্থ যে টিকা লিখিত আছে, ইহাও তখনকারই লেখা (বারাকাতুদ্ দোয়া' দ্রষ্টব্য)।

তারপর, তিনি তাঁহার 'কেরামাতুস্ সাদেকীন' নামক কেতাবে ১৮৯৩ খৃঃ সনে লিখেনঃ-

"ও বাশ্বারানি রাব্বি ও কালা মুবাশ্বেরাণ্, সাতারেফু ইয়াওমাল্ ঈদে ওল্ ঈদ আক্‌রাবু।" অর্থাৎ, 'আমার স্রষ্টা ও প্রভু আমাকে লেখরামের মৃত্যু সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, শীঘ্রই তুমি এই ঈদের দিনটি চিনিতে পারিবে- চলিত ঈদের

দিনটিও এই ঈদের অতি নিকটে থাকিবে।" পণ্ডিত লেখরামের মৃত্যু ঈদের দিনের সন্নিহিত সময়ে হওয়ার কথা কোন কোন আর্য্য সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ('সমাচার ও অন্যান্য আর্য্য পত্রিকা দ্রষ্টব্য)।

হযরত মির্যা সাহেবের দিক হইতে ত এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এখন, দেখুন পন্ডিত মহাশয় তাঁহার এক পুস্তকে হযরত মির্যা সাহবের সহিত প্রতিযোগিতা সূত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ-

"কোন মনীষী বলিয়াছেন, 'মিথ্যাবাদীকে তাহার গৃহের দরজায় পৌঁছাইবে'। এই বাক্য প্রতিপালন স্বরূপ মির্যা সাহেবের এই শেষ 'প্রার্থনা'ও মঞ্জুর করিতেছি এবং মোবাহালা এখানে প্রকাশ করতঃ ঘোষণা করিতেছি ঃ-

"আম বিনীত লেখরাম (পিতা পণ্ডিত তারা সিংহ শর্ম্মা মহাশয়) 'তক্যীব-ই-বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থের প্রণেতা সুস্থ ও সজ্ঞানে বলিতেছি যে, আমি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 'সুর্মা চশমে আরিয়া' পাঠ করিয়াছি। একবার নয় আরেকবার। ইহার যুক্তিগুলি আমি উত্তমরূপে উপলব্দি করিতে পারিয়াছি। উহাদের ভ্রান্তি সত্য ধর্ম্মনুসারে আমি এই পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছি। আমার অন্তরে মির্যাজীর যুক্তিসমূহ কোনই ক্রিয়া করে নাই। সত্যের সহিত উহাদের কোন সম্পর্কও নাই। আমি আমার জগৎ পিতা পরমেশ্বরকে সাক্ষী জ্ঞানক্রমে একরার করিতেছি যে, পবিত্র চতুর্ব্বেদোক্ত উপদেশ ও পথ প্রদর্শনের ভিত্তি মূলে আমি ইহা দৃঢ়রূপে প্রত্যয় করি যে, আমার আত্মা এবং সকল আত্মাগুলি কখনো অনিস্তিত্ব অর্থাৎ, পরম নাশ নয়, কখনো ছিল না এবং কখনও হইবে না। আমার আত্মাকে কেহ অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব দেয় নাই, সর্ব্বদা পরমাত্মার অনাদি মহিমায় ছিল এবং থাকিবে। সেইরূপে, আমার দেহের মৌলগুলি, অর্থাৎ প্রকৃতি বা পরমাণু অনন্ত বা অনাদি, পরমাত্মার মহিমাতে বিদ্যমান এবং কখনো লয় পাইবে না। সমস্ত জগতের সৃজন একজনেই করিতেছেন, অন্য কেহ না। আমি পরমেশ্বরের ন্যায় সমস্ত বিশ্বের প্রভূ বা স্রষ্টা নই। সর্ব্বব্যাপক এবং অন্তর্য্যামীও নই। আমি মহাশক্তির একজন অধম সেবক। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ও শক্তিতে চিরকাল আছি। কখনো লোপ পাই নাই। কোন 'লোকালয়' বা অনস্তিত্ব বাচক গৃহ নাই। কোন বস্তুরই অনস্তিত্ব নাই। (কোন বস্তুই ছিল না, থাকিবে না, এমন নয়।) সেইরূপ, বৈদিক সেই ন্যায় শিক্ষাও আমি মান্য করি। অর্থাৎ মহাকল্প পর্য্যান্ত কর্ম্মানুযায়ী মুক্তি লাভ হয়। তারপর, পরমাত্মার ন্যায় মতে পুনরায় মানব দেহ গ্রহণ করিতে হয়। সীমাবদ্ধ কর্ম্মের সীমাহীন ফল নাই। আমি ইহাও প্রত্যয় করি যে পরমশ্বর পাপ একটুও ক্ষমা করেন না। .... আমি বেদানুসারে সম্পূর্ণ ও যথার্থরূপ প্রত্যয় করি যে, চতুর্ব্বেদ অবশ্যই ইশ্বরের জ্ঞান। ইঁহাদের মধ্যে অনুমাত্র ভুল মিথ্যা বা কেচ্ছা-কাহিনী নাই। ইঁহাদিগকে চিরদিনই প্রত্যেক নব জগতে পরমাত্মা জগতের সার্ব্বজনীন পথ প্রদর্শনার্থে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সৃষ্টির আদিতে যখন মানব সৃষ্টি আরম্ভ হইল, পরমাত্মা বেদাবলীকে.......চারি ঋষির আত্মায় প্রত্যাদেশ

করিয়াছিলেন। .... অন্যান্য সত্যের বিরোধী কথাগুলি আমি ভ্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করিবার ন্যায় কোরআন ও ইহার বেদ বিরোধী কথাগুলি এবং সূত্রাবলী ও শিক্ষাগুলিকে........ ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলিয়া জানি। কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ মির্যা গোলাম আহমদ কোরআনকে খোদার কলাম বলিয়া জানে এবং উহার সাকল্য শিক্ষাই সত্য ও যথার্থ বলিয়া মনে করে। .... আমি কোরআন প্রভৃতি পাঠ দ্বারা যেমন এগুলিকে ভ্রান্ত বলিয়া জানি, তেমনি সে সংস্কৃতে সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং নাগরী হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত .... বেদ সমূহ পাঠ ব্যতীত বা দেখা ছাড়াই বেদগুলিকে ভ্রান্ত মনে করে। .... হে পরমেশ্বর, আমরা উভয় পক্ষেরই সত্য মীমাংসা কর। ..... কারণ মিথ্যাবাদী তোমার নিকট কদাচ সত্যবাদীর ন্যায় সম্মান পায় না" ('খব্‌তে আহমদিয়া,' ৩৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এতদ্ব্যতীত, পণ্ডিত লেখরাম ইহাও দাবী করিলেন, "এই ব্যক্তি (অর্থাৎ, হযরত মির্যা সাহেব) তিন বৎসরের মধ্যে বিষুচিকা রোগে মারা যাইবে। কারণ, (নাওযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী।" আরো লিখিলেন যে, "তিন বৎসরের মধ্যে ইহার কর্ম্ম শেষ। ইহার বংশধরের মধ্যেই কেহ আর অবশিষ্ট থাকিবে না।" (পণ্ডিত লেখরাম প্রণীত তকযীব-ই-বারাহীনে আহমদীয়া,' ৩১১ পৃঃ এবং তৎ প্রণীত 'কুল্লিয়াতে আরিয়া মোসাফের,' ৫০১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

অন্য কথায়, হযরত মির্যা সাহেবের প্রতিযোগিতাক্রমে পণ্ডিত লেকরামও তাঁহার ঈশ্বরের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া জগতের কাছে ঘোষণা করেন।

এখন, দেখুন খোদা 'জুল-জালাল' কী ফয়সালা করিলেন। হযরত মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর পঞ্চম বর্ষে অর্থাৎ ৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৭ সন ঈদুল্ আয্‌হার পর দিন, হযরত মির্যা সাহেবের প্রভূত উন্নীতি দর্শন করিতে করিতে, কোন অজানিত হস্তে নিহত হইয়া এবং ইস্‌লামের সত্যতার উপর আপনার রক্তের ছাপ দিয়া, অন্তরের বাসনাগুলি অন্তরেই নিয়া পণ্ডিত লেখরাম এ পৃথিবী হইতে বিদায় হইলেন এবং সর্ব্ব প্রকার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঘাতকের কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। জানা যায় না, সে কোন মানুষ ছিল এবং লুকাইয়া পড়িয়াছিল, বা কোন ফেরেশ্‌তা ছিল এবং আকাশে উঠিয়া গিয়াছিল! কারণ, বলা হয় যে, পণ্ডিত লেখরাম নিহত হওয়ার সময় তাঁহার বাড়ীর দেউড়িতে তাহার কোন সাক্ষ্যাৎকারী আসিয়াছিলেন এবং এই সাক্ষ্যাৎকারী কাহাকেও বাহির হইতে গৃহের ভিতরে এবং ভিতর হইতে বাহিরে যাইতে দেখেন নাই। লেখরামের স্ত্রী এবং অন্যান্যেরা বলেন যে, লেখরামকে হত্যা করিয়া ঘাতক সিঁড়ির পথে ছাদের উপরে উঠিয়াছিল এবং তারপর তাহার আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ, ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পণ্ডিত লেখরাম নিহত হইয়া ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার উপর সাক্ষর করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঘটনার ফলে সতর্ক হওয়ার পরিবর্তে এবং খোদার এই জাজ্বল্যমান নিদর্শনের দ্বারা উপকৃত না হইয়া আর্য্যদের ক্রোধাগ্নি আরো বর্ধিত হইল।

তাহাদের বিদ্বেষানল আরো দাও দাও করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা প্রচার করিতে লাগিল যে, হযরত মির্যা সাহেবই যেন লেখরামকে বধ করাইয়া ছিলেন। এই সময়ে বহু পত্র তিনি পাইলেন। ঐ সকল পত্রে লেখরাম হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ তাঁহাকে হত্যা করিবার হুমকি প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে তিনি ইস্তাহারের দ্বারা খোদার কসম পূর্ব্বক তাঁহার নির্দোষিতা প্রকাশান্তে লিখিলেন ঃ-

"যদি এখনো সন্দেহকারীর সন্দেহ দূর না হয় এবং আমি এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলাম বলিয়া মনে করা হয়-যেমন হিন্দু পত্রিকাগুলিতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে- তবে আমি একটি সৎপরামর্শ দিতেছি। তদ্বারা এই সম্পূর্ণ কাহিনীরই মীমাংসা হইয়া পড়িবে। এই সৎপরামর্শটি এই যে, ঐরূপ ব্যক্তি আমার সম্মুখে হলফ করিবে। হলফের ভাষা ইত্যাকার হইবে, 'আমি সুনশ্চিতরূপে জানি যে, এই ব্যক্তি (অর্থাৎ, হযরত মির্যা সাহেব) হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বা তাঁহারই আদেশে হত্যা কাণ্ডটি ঘটিয়াছে। সুতরাং, যদি ইহা সত্য না হয়, হে সর্ব্বশক্তিমান খোদা! এক বৎসরের মধ্যে আমার প্রতি ভয়াবহ আযাব অবতীর্ণ হইক, কিন্তু কোন মানুষের হাতে নয়। মানুষের বলিয়া যেন আদৌ কোনই ধারণা না করা যায়। সুতরাং, যদি এই ব্যক্তি (অর্থাৎ, এইরূপ শপথকারী) এক বৎসর পর্যন্ত আমার বদ দোয়া হইতে নিস্তার পায়, তবে আমি অপরাধী, এবং একজন হত্যাকারীর উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য। এখন যদি কোন বাহাদুর কলিজাওয়ালা আর্য্য থাকে এবং এই প্রকারে সমস্ত বিশ্বকে সন্দেহের নিগড় হইতে উদ্ধার করে, তবে সে এই উপায় অবলম্বন করিতে পারে।" (ইস্তাহার, ১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯৭ সন)

পাঠক! দেখুন আর্য্যদের সম্মুখে এই যে উপায়টি উপস্থিত করা হইয়াছিল, ইহা মীমাংসার কিরূপ সুন্দর উপায় ছিল। তারপর, অন্য এক ইস্তাহারে হযরত মির্যা সাহেব এইরূপ ব্যক্তির জন্য, যদি সে এক বৎসরের মধ্যে উপরোল্লিখিত উপায়ে হলফ করিবার পর ধ্বংস না হয়, দশ হাজার টাকা পুরস্কার পর্যন্ত নিরুপণ করেন, এবং ইহাও স্বীকার করেন যে, তদবস্থায় অবশ্যই অপরাধীর ন্যায় যেন তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং তাঁহার লাশ উল্লিখিত ব্যক্তির সপোর্দ্দ করা হয় (১৮৯৭ সনের ৫ই এপ্রিলের ইস্তাহার দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কোন আর্য্য প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই। দূর হইতে শুধু শৃগালবৎ চাল-চালনায় সন্তুষ্ট থাকিল। 'সুবহানাল্লাহ্.!' (-আমরা আল্লাহর পবিত্রতার জয়গান করি) ইহা কত মহাপ্রতাপন্বিত নিদর্শন ছিল যাহা ইসলামের সত্যতা এবং আর্য্য ধর্ম্মের ব্যর্থতা নির্দ্দেশার্থে প্রকাশিত হয়। হেদায়াতের সূর্য যেন উদয় হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্ধেরা এই সূর্য্যালোক দেখিতে পারে নাই।

হত্যা করিবার সন্দেহ কতই অজ্ঞতা জ্ঞাপক! কতই নির্ব্বোধ জনক!! হে অজ্ঞানেরা, মনে কর পাণ্ডিত লেখরাম হযরত মির্যা সাহেবেরই ষড়যন্ত্রের ফলে নিহত হয়। তাহাতেই বা কি হইল? ইহাতে কি ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার বিষয়ে কোনরূপ অঙ্গহানি হয়? উভয়েই

খোদাতা'লার নিকট মীমাংসার প্রার্থী হন, মিথ্যাবাদীর ধ্বংস হওয়ার এবং সত্যবাদীর সম্মান প্রকাশের জন্য উভয়েই একজন অন্য জনের ধ্বংস হইবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং উভয়েই স্ব স্ব ধর্ম্মের সত্যাসত্য এই মোবাহালার ফলাফলের উপর নির্দ্দেশ করেন-এ কথাগুলি কি সত্য নয়? সুতরাং, এই সকল যাবতীয় বিষয় সত্ত্বেও মির্যা সাহেবের মানবাস্ত্র পণ্ডিত লেখরামের উপর চালিত হইল। সুতরাং, ইহাতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, হযরত মির্যা সাহেবের খোদার কথা তো অনেক দূরের বিষয়, মির্যা সাহেবের খোদা আর্য্যদের খোদা হইতে অধিকতর শক্তিশালী! কারণ, আর্য্যদের খোদা তাহার বিশেষ বান্দা লেখরাম তাহার নিকট মীমাংসার প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও লেখরামের রক্ষা পাওয়া এবং মির্যা সাহেবের ধ্বংস হওয়ার উপর তাহার ধর্ম্মের সত্যতা বিষয়ক মীমাংসা নির্ভর করা, এবং একটি জগতের এই মীমাংসার অপেক্ষায় থাকা সত্ত্বেও মির্যা সাহেবকে ধ্বংস করা তো দূরে থাকুক, তাঁহার একান্ত ভক্ত লেখরামকে মির্যা সাহেবের ষড়যন্ত্র হইতেও রক্ষা করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে ইসলামের খোদা হযরত মির্যা সাহেবকে শুধু যাবতীয় আসমানী ও জমিনী আপদ হইতেই রক্ষা করেন নাই, বরং তাঁহার শত্রুকে তাঁহার সাক্ষাৎ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ধ্বংস করিয়া ইসলামের সত্যতা এবং আর্য্য ধর্ম্মের মিথ্যা হওয়া চিরদিনের জন্য মীমাংসা করিয়া দিলেন।

তারপর, আমরা বলি, হে আর্য্য সমাজ, তোমরা তো হযরত মির্যা সাহেবের সম্বন্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র করিবার সন্দেহ পোষণ কর। কিন্তু বলিতে পার কি, তোমাদের জন-শক্তি, তোমাদের অর্থ-শক্তি বহু অধিক হওয়া সত্ত্বেও তোমরা হযরত মির্যা সাহেবকে কতল করিতে পার নাই কেন? অথচ, তোমাদের হত্যা করিবার হুমকিগুলি ইহাই প্রকাশ করে যে, তোমরা এরূপ কার্য্যে বিশেষ দক্ষ। সত্য নয় কি, তোমাদের মুখপাত্র (লেখরাম) "পঞ্চভুতে" মিশিবার পরেও হযরত মির্যা সাহেব এগার বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদের মাথার উপর বজ্রের ন্যায় নিনাদ করিতে থাকেন? তোমরা তাঁহাকে হত্যা করিবার হুমকিও দিয়াছিলে। এমন কি, সেই সময় মুসলমানদের কোন কোন বে-গুনাহ্ বালক বালিকাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের তোমরা কিছুই করিতে পার নাই। হে দুরাদৃষ্ট জাতি, খোদা তোমাদের চক্ষু খুলিয়া দিন। তোমরা নিদর্শন চাহিয়াছিলে। তাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তোমরা তদ্বারা উপকৃত হইতে পার নাই। তোমরা তোমাদের কুফরীতে আরো বর্দ্ধিত হইলে! খোদাকে ভয় কর, একদিন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে।

তারপর, আমরা সম্মানিত পাঠকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া গভীর প্রেম ও শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন করিতেছি যে, হত্যা মূলক সন্দেহের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি তো হয় না, বরং উহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভিত্তিহীন মিথ্যারোপ হওয়াই মাত্র প্রমাণিত হয়। বলা বাহুল্য যে, অপরাধ দুইভাবেই প্রমাণিত হইতে পারিত। হয়ত গভর্ণমেন্টের অনুসন্ধানে অপরাধ সাব্যস্ত হইত, কিংবা হযরত মির্যা সাহেব খোদার

বিচারে অপরাধী নির্দ্দেশিত হইতেন। সরকারী তল্লাসী আর্য্য মহাশয়েরা প্রাণপনে করাইয়াছিলেন। রিপোর্ট করা হইয়াছিল। অনুসন্ধান করান হয়। গুপ্ত পুলিশের বিশেষ ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে কাজে লাগান হয়। আর্য্য সমাজ নিজেও যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করেন। ফলে, কী হইল? কণামাত্র সন্দেহও কি প্রমাণিত হইয়াছিল? তারপর, অপর আদালত ছিল আল্লাহ্‌র। উহাও আর্য্যদের সম্মুখে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু আর্য্যগণ সে দিকে একটুও অগ্রসর হন নাই। অথচ, ইহার জন্য এই শর্ত্ত করা হইয়াছিল যে, আসমানী অস্ত্রের দ্বারা ধ্বংস-কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে এবং উহাতে মানুষের ষড়যন্ত্রের কোন সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় হইবে। তারপর, দশ হাজার টাকার নগদ পুরস্কারও সেই সঙ্গে ছিল। তারপর, তাঁহাদের ধারণা মত পণ্ডিত লেখরাম হন্তার লাশও তাঁহাদের হস্তগত হইত। তবু, কি কারণে আর্য্যগণ ইহা স্বীকার না করিয়া অযথা বাহানা ও হঠকারিতা দ্বারা সুযোগ নষ্ট করেন? এই সমুদয় যাবতীয় বিষয় হইতে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত রূপে ইহাই প্রতীত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে, আর্যদের এই ভয় ছিল যে, পণ্ডিত লেখরাম তো গিয়াছেনই, আরো কোন প্রধানেরও প্রাণহানি না হয়। কারণ, তাঁহাদের অন্তরাত্মা ইহা অনুভব করিতেছিল যে, হযরত মির্যা সাহেবের সাহায্যার্থে খোদার হাত কাজ করিতেছিল।

পণ্ডিত লেখরাম নিহত হওয়ার পর হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কার্য্যকারিতার দুইটি সুযোগ আর্য্যদের হস্তগত হয়। দুইটিরই তাহারা পরিপূর্ণরূপে যথা ব্যবহার করে। প্রথম সুযোগ ঘটিয়াছিল হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের আনীত খুনের প্রচেষ্টার অভিযোগ মোকদ্দমার সময়। উহাতে কোন কোন আর্য্য উকীল খৃষ্টানদের পক্ষে বিনা ফিসে কার্য্য করেন। তারপর, এমনিও আর্য্যেরা সর্ব্বপ্রকারে তাহাদের পৃষ্টপোষকতা করে। অপর সুযোগ উপস্থিত হয় মৌলবী করম দীন ঝিলমীর পক্ষ হইতে ১৯০৩-৪' সনে হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারী মোকদ্দমার সময়। এই মোকদ্দমার বিচার একাদিক্রমে দুইজন হিন্দু ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে চলিতে থাকে। আর্য্যেরা স্বজাতির ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বেশ কানাঘুষা করিতে থাকে। অন্যান্য সামঞ্জস্যগুলি ছাড়া তাহাদের পূর্ব্বাহ্নিক অভিমত এবং জল্পনা-কল্পনাগুলিও কার্য্য করিতে থাকে। তারপর, সংক্ষেপে ব্যাপার এই, প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট এক্স্ট্রা এ্যাসিসটেন্টের পদ হইতে মুন্‌সেফরূপে অপদস্থ হইয়া গুরুদাসপুর হইতে বদলী হইলে অপর ম্যাজিস্ট্রেট, যিনি পর্ব্বোল্লিখিত ম্যাজিষ্ট্রেটের পরিবর্ত্তে আসেন তিনিও দুইটি যুবক পুত্রের বিয়োগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তবু তিনি তাঁহার স্ত্রীর সেই সময়ে দুইটি স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও হযরত মির্যা সাহেবের উপর পাঁচ শত টাকা জরিমানা করিলে পর আপীল কোর্ট এই রায়ের বিরুদ্ধে কঠোর অসন্তুষ্টি প্রকাশ পূর্ব্বক জরিমানার আদেশ রহিত করিয়া জরিমানা লব্ধ টাকা ফেরতের আদেশ করেন। টাকাও ফেরত পাওয়া গেল। হযরত মির্যা সাহেব খোদা-প্রদত্ত সুসংবাদ অনুসারে- যাহা পূর্ব্বেই সংবাদ-পত্র সমূহে প্রকাশ করা হইয়াছিল- সম্মান সহকারে অভিযোগমুক্ত হন। আর্য্যগণ অবাক্ দর্শক হইয়া রহিল ('হাল্-হাকাম,' 'বদর' ও 'হকীকাতুল অহী' দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য বিষয় শেষ করিবার পূর্ব্বে কাদিয়ানের আর্য্যদের বিষয়ে কিছু বলা জরুরী মনে হয়। কারণ, তাহাদের মধ্যেও খোদার 'কুদরত' (মহিমা) প্রদর্শনের কোন কোন বিশেষ 'তজল্লী', বিশেষ জ্যোতির বিকাশ হয়। সুতরাং, জানা আবশ্যক যে, কাদিয়ানের আর্য্য সমাজ একটি পুরাতন সমাজ। এই সমাজের দুইজন সভ্য লালা শরমপৎ এবং লালা মলওমল প্রথম হইতেই হযরত মির্যা সাহেবের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতেন। ইঁহারা উভয়েই হযরত মির্যা সাহেবের বহু নিদর্শনাবলী পূর্ণ হওয়া দর্শন করেন। কিন্তু ঘোর ধৃষ্টতাবশতঃ হেদায়াত লাভ করিতে পারেন নাই ('তবলীগে রেসালত' এবং 'কাদিয়ান-কে-আরিয়া আওর হাম্' প্রভৃতি দেখুন)।

হযরত মির্যা সাহেব ১৮৮৪-'৮৫ খৃঃ সনে যখন এই ইস্তাহার দিয়াছিলেন যে, কেহ নিদর্শন দেখিতে চাহিলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার নিকটে আসিয়া বাস করিবেন, তখন কাদিয়ানের কোন কোন আর্য্য এবং সনাতন ধর্মীরাও এই ইস্তাহার পাইয়া তাঁহার নিকট লিখিতভাবে নিদর্শন দেখিবার আগ্রহ জানাইল। ফলে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ব্যাপারটি দস্তুর মত লিখিত হইল এবং উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সন্নিবিষ্ট হইল। ঐ সময়েই হযরত মির্যা সাহেব তাঁহার কোন কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, মির্যা নেযামুদ্দিন ও মির্যা ইমামুদ্দিনের আকাঙ্খানুযায়ী একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, আল্লাহতা'লা তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছেন, একত্রিশ মাসের মধ্যে তাঁহাদের গৃহে কাহারো মৃত্যু হইবে এবং ঐ মৃত্যুর ফলে তাঁহাদের অত্যন্ত শোকাকুল হইতে হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর কারণ ছিল মির্যা ইমামুদ্দিন ও মির্যা নেযামুদ্দিন প্রভৃতি হযরত মির্যা সাহেবের চাচাত্ব ভ্রাতারা চরম সীমার বে-দ্বীন ছিলেন এবং এল্হাম ও কালামে-এলাহীর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতেন। ইঁহারা প্রায়ই খোদতা'লার ক্রোধমূলক নিদর্শনের জন্য বলিতেন। যাহা হউক, সংক্ষেপে ব্যাপার এই, কতিপয় স্থানীয় হিন্দু হযরত মির্যা সাহেবের নিকট লিখিতভাবে দাবী প্রকাশ করিলেন, যেন এ বৎসরের মধ্যে কোন নিদর্শন দেখান হয় ('তবলীগে রিসালত,' ১ম খণ্ড)। এখন, খোদাতালা'র কুদরত দেখুন। এদিকে এই বৎসরও শেষ হয় নাই এবং একত্রিশ মাস সম্বলিত মিয়াদের মধ্যেও কিছু বাকী ছিল, এমন সময় বিরুদ্ধবাদিগণ শোরগোল আরম্ভ করিল যে, একত্রিশ মাসও গত প্রায়। সামান্য কয়েক দিন মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোন নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। সকলেই সুস্থ্য, জীবিত! বিরুদ্ধবাদিগণের এইরূপ ঠাট্টা-বিদ্রুপের পর হঠাৎ খোদার তজ্জলী চমক প্রদর্শন করিল। একত্রিশ মাস মিয়াদের পনের দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, মির্যা নেজামুদ্দিনের যুবতী কন্যা কয়েক মাসের পুত্র সন্তান রাখিয়া এই নশ্বর জগত ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। এই মৃত্যুতে এই পরিবার গভীর শোকে নিমজ্জিত হইল। বস্তুতঃ এই একটি মাত্র ঘটনা এক দিকে মির্যা ইমামুদ্দিন এবং মির্যা নেযামুদ্দিনের জন্য এবং অন্যদিকে কাদিয়ানের ঐ সকল হিন্দুদের জন্য নিদর্শন স্বরূপে প্রকাশিত হইল। কিন্তু চক্ষু বন্ধ থাকিলে সূর্যের কিরণ দেখে কে? কোরআন শরীফেও আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন ঃ *"ইইঁ ইয়ারাও আয়াতাই' ইউরেযু ও ইয়াকুলু*

সেহ্‌রুম্‌ মুস্তামের"-"কাফেরগণ কোন নিদর্শন পূর্ণ হওয়া দেখিতে পাইয়াও মানে না, বরং মুখ ফিরাইয়া বলে যে, ইহা তো কোন প্রবঞ্চনা বলিয়া বোধ হইতেছে" ('সূরাহ্‌ কমর,' রুকু-১)।

কাদিয়ানবাসীরা এই নিদর্শন দেখিল। কিন্তু "প্রবঞ্চনা মাত্র" বলিয়া অন্যত্র মুখ ফিরিল। যতই সময় যাইতে লাগিল, আবু জেহেল ও তাহার সাথীদের ন্যায় বর্ধিতাকারে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। লেখরাম কতল হইলে অন্যান্য আর্য্যদের ন্যায় কাদিয়ানের আর্য্যদেরও উষ্মা অতিশয় বৃদ্ধি পাইল। হযরত মির্যা সাহেবের জীবনের শেষ কতিপয় বৎসর কাদিয়ান হইতে তাহারা একটি পত্রিকা বাহির করিতেছিল। ইহার নাম ছিল 'শুভ-চিন্তক'। পত্রিকাখানি আর্য্যদের 'সভ্যতা'র পূর্ণ-আদর্শ ছিল। কারণ, মিথ্যাবাদিতা, মিথ্যারোপ, কুবাচ্য এবং কঠোর ভাষা প্রয়োগ ইহার সর্বপ্রধান নীতি ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ও পরিচালক সোমরাজ, ইশ্বরচন্দ্র এবং ভগৎরাম নামে তিন ব্যক্তি ছিল। এই তিনজনই চরম সীমার জালেম ও কষ্ট প্রদানকারী ছিল। ইহাদের ধৃষ্টতা ও কুবাচ্যের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-

"এই ব্যক্তি (হযরত মির্যা সাহেব) স্বেচ্ছাচারী, ইন্দ্রিয় পরায়ণ, পাপী বলিয়া জঘন্য, অপরিবত্র স্বপ্ন দর্শন করে।" (শুভ চিন্তক,' ২২শে এপ্রিল, ১৯০৬ খৃঃ)

"কাদিয়ানী মসীহ্‌র এল্‌হাম এবং ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের প্রকৃত রূপ প্রকাশক একমাত্র পত্র 'শুভ চিন্তক'। মির্যা কাদিয়ানী দুশ্চরিত্র, খ্যাতির অভিলাষী, পেট পূজারী।" ('শুভ চিন্তক', ১৫ই মে, ১৯০৬)

"দুর্ভাগা উপার্জ্জন বিমুখ, প্রতারণা ও মিথ্যাবাদিতায় পটু।" ('শুভ চিন্তক', ২২শে মে, ঐ সন)

"আমরা পনর বৎসর যাবৎ অবিরত পাশাপাশি একই স্থানে তাহার সহিত বসবাস পূর্ব্বক তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া আসিতেছি। আমাদের ইহাই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রতারক, স্বার্থপর, বিলাস পরায়ণ, দুর্মুখ, প্রভৃতি, প্রভৃতি। নিদর্শন এ পর্যন্ত আমরা কিছুই দেখি নাই। অবশ্য দেখিয়াছি, এই ব্যক্তি প্রত্যহ এল্‌হাম তৈয়ার করে এবং একজন যারপর নাই নির্বোধ।" (শুভ চিন্তক, ১লা মার্চ, ১৯০৭ খৃঃ)

যাহাহোক, ইহার প্রত্যক সংখ্যাই গালাগালিতে পূর্ণ থাকিত। হযরত মির্যা সাহেব আর্য্য ভারতের এই সকল সুসভ্য পুত্রের গালি শুনিতে অভ্যস্ত তো ছিলেনই, আরও শুনিতে লাগিলেন্‌। খোদা নিজেই বিচার করিতেন। কিন্তু তাঁহার দুঃখ হইল যে, ইহারা কাদিয়ানেই বসবাস করে এবং প্রতিবেশী হওয়ার দাবী করে। বাহ্যিকভাবে, এ সবই সত্য। যদি ইহাদের তরফ হইতে কোন কথা বাহিরে লোকদের নিকট পৌঁছে, তবে দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তিগণের অবশ্যই সংশয় উপস্থিত হইবে এবং অকারণে অজানা লোকের সত্য গ্রহণের পথে বাঁধা জন্মিবে। এই জন্য তিনি ১৯০৭ খৃঃ সনে "কাদিয়ান কে আরিয়া

আওর হাম” নামক পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তিকাতে তাহাদিগকে সতর্ক করা হয়, খোদার ভয় দেওয়া হয়। তিনি লিখিলেন যে, লেখরাম সংক্রান্ত নিদর্শন তাহারা দেখিয়াছে। এখন, যদি তাহারা এই মিথ্যারোপ হইতে নিবৃত্ত না হয়, খোদা তাহাদের মধ্যে অন্য কোন নিদর্শন প্রকাশ করিবেন। তিনি কাদিয়ানের আর্য্যদের সম্বন্ধে লিখিলেনঃ-

“মৌতে লেক্ষু বড়ি কেরামত হ্যায়
পর্ সমঝতে নাহি ইয়েহ্ শামত হ্যায়,
মেরে মালেক, তু খোদ্ উন্‌কো সমঝা
আস্‌মান সে ফের এক নেশান দেখা।”

“লেখরামের মৃত্যু মহাকেরামত ছিল। কিন্তু ইহারা বুঝিতে পারে না, দুঃখ এই। আমার মালিক, তুমি ইহাদিগকে নিজে বুঝাও। আস্‌মান হইতে পুনরায় এক নিদর্শন দেখাও (কাদিয়ানকে আরিয়া আওর হাম)।

তারপর, এই পুস্তকেরই ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ-

“দ্বীনে খোদাকে আগে কুছ্ বন না আয়ী আখের, সব গালিওঁ পে উৎরে, দেল্ মে উঠা এহি হ্যায়। শর্‌ম ও হায়া নাহি হ্যায়, আঁখোঁ মে উন্‌কি হর্‌গেয, ওঅহ্ বাড় চুকে হ্যাঁয় হাদ সে, আব্ এন্তেহা এহি হ্যায়।”

হাম্‌নে জিস্‌কো মানা কাদের, হ্যায় ওঅহ্ তাওয়ানা, উস্‌নে হ্যায় কুছ্ দেখানা, উস্‌সে রেজা এহি হ্যায়। আয় আরিউ, ইয়েহ্ কিয়া হ্যায়, কেউঁ দেল্ বিগাড় গিয়া হ্যায়।

ইন শোখিওঁ কো ছোড়ো, রাহে হায়া এহি হ্যায়।

মুঝকো হো কিউঁ সেতাতে সাও এফতেরা বানাতে, বেহ্‌তর থা বায় আতে, দূর আয় বালা এহি হ্যায়। জিস্‌কি দোয়া সে আখের লেক্ষু মরা কাট্ কার, মাতাম পড়া থা ঘর ঘর, ওঅহ্ মির্যা এহি হ্যায়। আচ্ছা নেহি সেতানা, পাকোঁ কা দেল্ দুখানা, গুস্তাখ্ হোতে জানা, উস্‌কি সাযা এহি হ্যায়”

“পরিশেষে, খোদার ধর্মের মোকাবিলায় আর কিছুই সম্ভবপর হয় নাই। সকলেই গালি দিতে তৎপর হয়, তাহাদের মন তাহাদিগকে এই পরামর্শই দিল।

“লজ্জা, শরম আদৌ কিছুই তাহাদের চক্ষে নাই। ইহারা সকল সীমার বাহিরে গিয়াছে। এখন শেষ এখানেই।

“আমরা যাঁহাকে মানিয়াছি, তিনি সর্বশক্তিমান, ‘কাদের’। তিনিই কিছু দেখাইবেন, ইহাই তাঁহার নিকট আশা।

“হে আর্য্যগণ, এ কি? মনোবিকৃতি ঘটিয়াছে কেন? এই সকল ধৃষ্টতা ছাড়। শ্রীলতার ইহাই পথ।

"আমাকে কষ্ট দিতেছ, শত শত মিথ্যা আরোপ করিতেছ। ক্ষান্ত হওয়া ভাল ছিল। বিপদ হইতে রক্ষার ইহাই পথ ছিল।

"যাঁহার দোয়ায়, পরিশেষে, লেখরাম কাটা গিয়া মারা গিয়াছিল-গৃহের পর গৃহ শোকার্তনাদে পূর্ণ হইয়াছিল, এই সেই মীর্যা।

"ভাল নয় কষ্ট দেওয়া, পবিত্র ব্যক্তিগণের অন্তরে দুঃখ দেওয়া, ধৃষ্টতা করিতেই থাকা, ইহার সাজা ইহাই।"

ঐ সময়কার কথা। একদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (সম্পাদক, 'আল্‌কাহাম,' কাদিয়ান) স্থানীয় পোষ্ট অফিসে বসা ছিলেন। তাঁহারই পার্শ্বে উপরোল্লিখিত তিন আর্য্যের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্রও বসা ছিল। সাবপোষ্ট মাষ্টার বাবু আল্লাদাত্তা সাহেবও সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। কথার প্রসঙ্গে শেখ্ সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে বলিলেন, হযরত মির্যা সাহেবকে খোদাতা'লা এল্‌হাম করিয়াছেন যে, তাঁহাকে এবং যাহারাই তাঁহার বাড়ীতে থাকিবে, তাহাদিগকে প্লেগ হইতে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখিবেন এবং ইহা খোদাতা'লার নিদর্শন। ইহাতে হতভাগ্য ঈশ্বরচন্দ্র বলিল, "ইহাও কি কোন নিদর্শন? আমি বলিতেছি যে আমিও প্লেগে মরিব না।" হযরত শেখ সাহেবের ঈমানে জৌশ আসিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "নিশ্চয় এখন তুমি প্লেগেই ধ্বংস হইবে" ('হকিকতুল অহি, ১৫৩ পৃঃ তাতিম্মা) বাবু আল্লাদিত্তা সাহেব এই পুস্তক (তবলীগ হেদায়াত) প্রণয়ণকালে জীবিত আছেন। তিনি আহমদী নহেন। হলফ দিয়া তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। এখন, দেখুন, খোদার কুদরত কিরূপ ঝলক প্রদর্শন করে।

"কাদিয়ান কে আরিয়া আওর হাম্" পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার কয়েক দিন পরেই কাদিয়ানে প্লেগ উপস্থিত হইল। খোদাতা'লার ক্রোধ জনক থাবড়ে তিন দিনের মধ্যেই উপরোক্ত তিন ব্যক্তির কর্ম শেষ হইল। তাহাদের আপদ তাহাদের কুটুম্ব ও পরিবার-পরিজনের উপরেও নিপতিত হইল। কাহারো কাহারো সম্পূর্ণ গৃহই উৎসন্ন হইল। ঈশ্বরচন্দ্র হযরত মির্যা সাহেবের ন্যায় প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকার দাবী করিত। তাহার এই দাবীর কয়েক দিন পরেই প্লেগাক্রান্ত হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিল। 'শুভ-চিন্তক'ও তৎসঙ্গেই ধুলিসাৎ হইল। হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, সতর্ক হউন।

এই নিদর্শনও লেখরামের নিদর্শন হইতে ক্ষুদ্র নয়। ইহা দ্বারা ঐ আপত্তিও উৎখাত হইল যে, লেখরামকে তো তোমাদের ধারণা মতে হযরত মির্যা সাহেবের ছোরা বধ করিয়াছিল। তোমরা এই সন্দেহের দ্বারা চালিত হইয়া অশ্রু মোচন করিতেছিলে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র, সোমরাজ এবং ভগৎরাম কোন্ ছোরা দ্বারা হত হইয়াছিল? চক্ষু থাকিলে এখনো দেখ। কান থাকিলে এখনো শোন। আর হৃদয় থাকিলে এখনো ভাব! উভয় ক্ষেত্রেই একই বস্তু ছিল। খোদার গজব একজনের পেটে লৌহ-ছুরিকা হইয়া প্রবেশ

করিল এবং অন্যদিগকে প্লেগের জীবানু হইয়া ভক্ষণ করিল। অনুসঙ্গক্রমে কাদিয়ানে প্লেগ আসিয়াছিল কেন, এই প্রশ্নেরও সমাধান হইল। কারণ, প্রথম কথা, কাদিয়ানে আদৌ কোন প্রকার প্লেগ দেখা দিবে না, হযরত মির্যা সাহেবের এইরূপ কোন এলহাম নাই। পক্ষান্তরে, এলহাম ছিল এখানে মহামারাত্মক প্লেগের মহামারী উপস্থিত হইবে না। অর্থাৎ, গ্রাম কি গ্রাম উৎসন্ন করে, লোকেরা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া যত্রতত্র পলায়ন করে, এই প্রকার প্লেগ না আসিবার কথা ছিল। খোদাতা'লা বলিয়াছিলেন ঃ- *"লাও লাল্ এক্‌রাম লাহালাকাল্ মকাম"* অর্থাৎ "কাদিয়ান আমার একজন অভিষিক্ত ও প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম সংস্কারকের আবাস ভূমি না হইলে, এই গ্রাম সম্পূর্ণই বিধ্বস্ত হওয়ার যোগ্য ছিল।" কিন্তু - "ইহাকে মহামারাত্মক প্লেগ হইতে রক্ষা করা হইবে।"

তারপর, কাদিয়ানে প্লেগ একেবারেই না আসিলে কিরূপে এই নিদর্শন প্রকাশ পাইত যে, একই স্থানে পাশাপাশি প্রাচীরের মধ্যে হযরত মির্যা সাহেব এবং ঈশ্বরচন্দ্র ও সোমরাজ প্রভৃতি বাস করা সত্ত্বেও এবং উভয় পক্ষই প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকার দাবী করা সত্ত্বেও প্লেগ আসিলে পর ঈশ্বরচন্দ্র এবং সোমরাজ প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিনাশ পাইল, কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব আর্য্যদের সহিত বিশুদ্ধ যুক্তি, ধর্ম্ম পুস্তকীয় প্রমাণ এবং আধ্যাত্মিক সংগ্রাম-এক কথায় প্রত্যেক দিক হইতেই পূর্ণ বিজয় লাভ করেন। অনন্তর আল্লাহ্‌তা'লারই যাবতীয় প্রশংসা।

শিখদের সহিত সংগ্রাম ঃ

তৃতীয়, শিখ ধর্ম্ম। যদিও এই ধর্মের অনুবর্তিগণের সংখ্যা তত অধিক নয় এবং পাঞ্জাবের বাহিরে এই ধর্মের প্রভাব অতি ক্ষীণ, কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, পাঞ্জাবে শিখ জাতির যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। শিখেরা তাহাদের ধর্মের জন্য কিছু না কিছু চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করে। এই ধর্মে এখন পর্যন্ত একটি সৌন্দর্য্য আছে (যদিও ইদানিং ইহার বিরুদ্ধে কোন কোন নমুনা প্রকাশ পাইতেছে এবং ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক) শিখেরা অপর ধর্মের বুজুর্গদের সম্বন্ধে আর্য্য বা খৃষ্টানদের ন্যায় সচারাচর তেমন কুবাচ্য ব্যবহার করে না। ইহা দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে, ইহারা ইসলামের শত্রু নয়। প্রকৃতপক্ষে, তাহাদের সাধারণ জনসমাজের অজ্ঞতা ও বন্য ভাব প্রবাদ-স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করে। কিন্তু শিক্ষিত শিখ সাধারণতঃ অন্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভদ্র। যাহাহোক, শিখদের সহিত হযরত মির্যা সাহেবের কোন আধ্যাত্মিক সংগ্রাম হয় নাই। অবশ্য, অন্য ধর্ম্মসমূহের নামে হযরত মির্যা সাহেবের তরফ হইতে যে সকল প্রতিযোগিতামূলক আহ্বান সাধারণতভাবে করা হইত, শিখগণও তাহা হইতে বাহিরে থাকিত না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই যথারীতি আড্ডা জমাইয়া হযরত মির্যা সাহেবের সম্মুখীন হয় নাই। অবশ্য, শিখদের সম্বন্ধে হযরত মির্যা সাহেব নিজেই যথেষ্টরূপে মনোযোগ দিয়াছেন। দাবীর জীবনের পূর্বে, তিনি শিখ

গুরু বাবা নানক সাহেবকে স্বপ্নে সন্দর্শন করেন। এই স্বপ্নে বাবা নানক স্বয়ং মোসলমান হওয়া তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন। তদ্‌বধি বাবা সাহেবের ইসলাম গ্রহণ প্রমাণার্থে আল্লাহতা'লা কিরূপ সুযোগ আনয়ন করেন, তজ্জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে থাকেন। পরিশেষে, তিনি এদিকে মনোনিবেশ করেন এবং গবেষণা করিতে গিয়া অতি শক্তিশালী ঐতিহাসিক সাক্ষ্যাবলী প্রাপ্ত হন যদ্দারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতপক্ষে বাবা নানক একজন মুসলিম 'অলি' ছিলেন। তিনি হিন্দু গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পরে, মোসলমান হইয়া তিনি দরবেশী তরিকায় এক সেল্‌সেলার প্রবর্তন করেন। হযরত মির্যা সাহেব বাবা সাহেবের মোসলমান হওয়া নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির সাহায্যে প্রমাণ করেন ঃ-

১। বাবা সাহেব মোসলমান দরবেশদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিতেন।

২। বাবা সাহেব ইসলামী তরিকা মত নামায রোযা পালন করিতেন।

৩। বাবা সাহেব মক্কার উদ্দেশ্যে সুদূর ভ্রমণ করেন এবং ইসলামী তরিকা মত হজ্ব করেন।

৪। বাবা সাহেব ইসলামী মতে আল্লাহতা'লার একত্ব-তাঁহার তৌহীদ, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লামের রেসালত এবং কোরআন করীমের উপর ঈমান রাখিতেন।

৫। বাবা সাহেব স্থানে স্থানে ইসলামী আকায়েদ, ইসলামের ধর্ম্ম বিশ্বাসসমূহ তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগকেও শিক্ষা দিয়াছেন।

৬। বাবা সাহেবের সর্বাপেক্ষা বড় 'তবররুক' 'চোলা সাহেব' (দীর্ঘ কামিজ) শিখদের মধ্যে বংশাদিক্রমে সংরক্ষিত হইয়া গরুদাসপুর জেলাস্থ 'ডেরা বাবা নানক' নামক স্থানে (পাঞ্জাব) রক্ষিত আছে। শিখদের ধর্মীয় কিংবদন্তী অনুসারে এই "চোলা" শিখদের মধ্যে অতি সম্মানের চক্ষে দেখা হয়। কিন্তু এই চোলা হযরত মির্যা সাহেব তাঁহার কোন কোন বন্ধুসহ যাইয়া খুলিয়া দেখিলে পর জানিতে পারিলেন যে, ইহার স্থানে স্থানে কোরআনের আয়াতসমূহ লিখিত আছে এবং ইসলামী কলেমা "লা-ইলাহা ইল্লাল্-লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্"ও পরিস্কার লিখিত আছে।

৭। ফিরোজপুরের এক গুরুদোয়ারে বাবা সাহেবের আরেক 'তবররুক' (আশীষ স্বরূপে প্রাপ্ত বাবা নানক সাহেবের ব্যবহৃত বস্তু) আছে। উহা দেখার ফলে জানা গিয়াছে যে, উহা এক খানি কোরআন শীরফ।

৮। বাবা সাহেব তাঁহার ব্যবহারিক জীবন, তাঁহার 'আমল' এবং স্থানে স্থানে তাঁহার শিক্ষার মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম, উহার মূল সূত্রগুলি এবং উহার ধর্ম্ম পুস্তক অর্থাৎ বেদের খণ্ডন করিয়াছেন এবং বিরুদ্ধ শিক্ষা দিয়াছেন। এই কারণে তিনি হিন্দু মতাবলম্বী না থাকা সুনিশ্চিত।

৯। শিখ ধর্ম্মের কোন 'শরীয়ত' নাই। আলাদা বিধি-ব্যবস্থা না থাকায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইহা কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে।

১০। শিখদের সাধারণ সভ্যতা ও কৃষ্টি হইতেও প্রকাশ পায় যে, ইসলামের সহিতই তাহাদের প্রকৃত সম্বন্ধ। পরবর্তী সময়ে যে সকল বিষয় হিন্দু ধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বাদ দিলে শিখগণ ইসলামী রঙ্গে রঙ্গীন বলিয়া দেখা যায়।

এই সকল যুক্তির সাহায্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাম বাবা সাহেবের ইসলাম প্রতিপন্ন করেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারেন যে, এই সকল বিষয় প্রমাণিত হইলে বাস্তবিকই বাবা সাহেবের ইস্‌লাম সম্পর্কে কোনই সন্দেহ থাকে না। বাবা সাহেবের ইসলাম প্রমাণিত হইলে অর্থাৎ তিনি একজন সত্যই মোসলমান 'অলি' ছিলেন বলিয়া নির্ণিত হইলে শিখ-ধর্ম্মের যে অবস্থান ও প্রকৃতস্বরূপ, তাহা অতি দেদীপ্যমান হইয়া পড়ে। অন্য কথায়, এই একটি মাত্র প্রমাণের দ্বারাই শিখ ধর্ম্মদুর্গ ভেদ হইয়া ইসলামের পক্ষে উহার জয় সাধন হয়। তিনি এই সকল তাবৎ কথাই শিখদের পবিত্র পুস্তক 'গ্রন্থ সহেব', 'জন্‌ম্ সাক্ষী', শিখ ধর্মের ইতিবৃত্ত, ইতিহাস এবং বাস্তব ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন। তাহা হইতে মহাশক্তিশালী যৌক্তিকতাক্রমে ১+১=২ হওয়ার ন্যায় বাবা সাহেবের মোসলমান হওয়া নির্ণিত হয়। ('সৎবচন', 'চশমায়ে মারফত' প্রভৃতি এবং তদীয় শিষ্য "নূর" পত্রিকার সম্পাদক, শেখ মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব প্রণীত 'বাবা সাহেবের জীবনী,' 'বাবা সাহেব কা মজ্‌হব' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

আশ্চার্যের বিষয়, হযরত মির্যা সাহেব অপর ধর্ম্মসমূহের উপর প্রত্যেকটি আঘাতই করিয়াছেন মূল মন্ত্র ও সূত্র সম্পর্কীয়। এইগুলি প্রমাণিত হইলে ঐ সকল ধর্ম্মের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দৃষ্টান্তস্থলে খৃষ্টানদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মসীহ্ আলায়হেস্ সালাম ক্রুশে প্রাণ ত্যাগ করেন নাই। বহু বৎসর পরে, তিনি অন্যান্য মানুষের ন্যায় মৃত্যু লাভ করেন এবং তাঁহার কবর কাশ্মীরে বিদ্যমান। আর্য্যদের সম্বন্ধে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, তাহাদের ধর্ম্মের যাবতীয় মূলসূত্রগুলি খোদাতা'লার পবিত্র সত্তার উপর ভীষণ আক্রমণাত্মক এবং স্রষ্টার সহিত মানুষের যে প্রকৃতিগত সম্বন্ধ তাহা এই সকল শিক্ষার ফলে শিথিল হইয়া মৃত্যু লাভ করে। আর্যদের অন্য বিশ্বাসগুলিই তাহাদের ঐ সকল বিশ্বাসের অপনোদন করে। শিখদের সম্বন্ধেও তিনি প্রমাণ করিলেন যে, তাহাদের ধর্ম্মশৃঙ্খলের প্রবর্তক মোসলমান ছিলেন। পরে, এই সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন কতকটা যুগ বিবর্তন, এবং কতকটা স্বয়ং মোসলমানদেরই উদাসীনতা বশতঃ ঘটিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই নীতি মান্য করিতেন যে, কোন ধর্ম্মশৃঙ্খল স্থায়ীভাবে, স্বাধীনরূপে পৃথিবীতে চলিতে পারে না- ইহার মূল ও শিকড়গুলি পৃথিবীর বক্ষে বিস্তৃত হইয়া সুদৃঢ় বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না- অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির উহাতে আস্থা স্থাপন,

উহা সর্বসাধারণ্যে গৃহীত হওয়া এবং বংশদিক্রমে উহা লোক-সমাজে মান্য ও সম্মাদৃত হইতে পারে না, এক কথায় উহা সতন্ত্র সত্তারূপে পৃথিবীতে তিষ্ঠিতে পারে না- যদি আদিতে উহার প্রবর্তন কালে উহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া থাকে। অন্যথায়, জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় উঠিয়াই বিলীন হইয়া যাওয়া, কিংবা দুই এক পুরুষ পর্যন্ত চলিয়াই বিলুপ্ত বা বিলোপ প্রায় হওয়া সত্য হওয়ার পরিচায়ক নহে। এই জন্য আমরা আহমদীগণ হিন্দুদের মহারাজ কৃষ্ণ (আলায়হেস্ সালাম) এবং রামচন্দ্রজী মহারাজ, বৌদ্ধদের গৌতম বুদ্ধ, পারসিকদের জরথস্ত্র, চীন-বাসীগণের কনফিউসস্ (আলায়হেমুর রহমত) প্রমুখ সকল ধর্ম্ম নেতাগণকে শ্রদ্ধার নেত্রে অবলোকন করি। সেইরূপ, বাবা নানক সাহেবকে (আলায়হের রহমত) আমরা একজন বকামাল অলি বলিয়া জানি। আমাদের অন্তরে হযরত মির্যা সাহেব ইহাদের সকলেরই সম্মান কায়েম করিয়াছেন। হযরত মির্যা সাহেব ইহাও দাবী করেন যে, তিনি হযরত কৃষ্ণ আলায়হেস্ সালামের অনুরূপ বা 'মসিল' (শিয়ালকোট বক্তৃতা)। একবার তিনি এলহাম পাইয়াছিলেন ঃ-

"হে রুদ্রগোপাল, তেরী মহিমা গীতা মেঁ ভি লিক্ষি হ্যায়"। অর্থাৎ, হে অনচার বিনাশকারী, হে সাধুতা স্থাপনকারী, তোমার প্রশংসা, তোমার আগমনের প্রতিশ্রুতি হিন্দুদের ধর্ম্মীয় পুস্তক শ্রীগীতায়ও বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সংগ্রাম ঃ

চতুর্থ, ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহার সহিত হযরত মির্যা সাহেবের মোকাবিলা হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ সামাজিকভাবে হিন্দুদের মধ্যে শামিল থাকিলেও তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়গুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইহারা কোন কোন মতের দিক দিয়া নতুন মোসলমান ফির্‌কা 'নেচারিয়া' বা প্রকৃতিবাদীদের সহিত অনেকটা মিল খায়। অর্থাৎ, 'নেচারিয়াগণ' এল্‌হাম, দোয়ার কবুলিয়ত, এবং অলৌকিকতা অস্বীকার করে। অর্থাৎ, এরূপ অর্থ গ্রহণ করে যে উহার ফলে মূল বিষয়ই অন্তর্হিত হয়। তেমনি এই সকল ব্যক্তিরা রসূল আগমনের প্রথা, এল্‌হাম, দোয়া প্রভৃতি অস্বীকার করে। ইহারা শুধু যুক্তি ও **বুদ্ধির** উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করে। ইহারা অবশ্য খোদা স্বীকার করে। কিন্তু এল্‌হাম এবং রেসালতের সেল্‌সেলার ইহারা ঘোর বিরোধী। অবশ্য, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মান্য ব্যক্তিদের প্রতি তাহারা কোন প্রকার কুবাক্য প্রয়োগ করে না। বরং জ্ঞানের দিক হইতে সম্মানের চক্ষে দেখে। এই ধর্ম্ম ততটা প্রচারমূলক ধর্ম্ম নহে।

অর্থাৎ, আর্য্য এবং খৃষ্টানদের মত বহস-মোবাহাসা, তর্ক-বিতর্কের প্রতি তেমন মনোযোগ দেয় না। ইহারা শুধু জ্ঞান মূলক উপায়ে স্বমত প্রকাশ করিয়া থাকে। ধর্ম্মের উত্তেজনা-উদ্দীপনা, ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। এই জন্য ইহাদের সহিত হযরত মির্যা সাহেবের কোন আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতা হয় নাই। অবশ্য, ইহাদিগকেও সার্বজনীন

প্রতিযোগিতার আহবানে সম্বোধন করা হইয়াছিল। হযরত মির্যা সাহেব উহা দ্বারা সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীকেই আহবান করেন। কিন্তু ইহাদের পক্ষ হইতে কেইহ যথারীতি সম্মুখীন হয় নাই।

বিশুদ্ধ যুক্তি ও ধর্ম্ম পুস্তকীয় প্রমাণের দিক হইতেও ইহাদের সহিত হযরত মির্যা সাহেবের কোন যথারীতি মনাযারাও (তর্কযুদ্ধ) হয় নাই। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব নিজেই ইহাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রণীত বহু পুস্তকে উহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের সমালোচনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ 'বারাহীনে আহমদীয়া' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের অধিকাংশে ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্ম বিশ্বাসগুলিই খণ্ডন করা হয়। এতদ্ব্যতীত, 'আয়না-ই কামালাতে ইসলাম', 'বারাকাতুদ দোয়া', 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়' পঞ্চম খণ্ড, এবং 'মক্‌তুবাতে'ও তাহাদের যথেষ্ট খণ্ডন বিদ্যমান। হযরত মির্যা সাহেব বারবার লিখিয়াছেন যে, খোদার উপরে ঈমানের দাবী সত্ত্বেও এল্‌হাম, দোয়া এবং সেল্‌সেলা-রেসালতের অস্বীকার দুইটি পরস্পর বিরোধী মত।

একাকী যুক্তি বা বুদ্ধি কোন খোদা থাকা সম্ভবপর-এই পর্যায়ের উর্দ্ধে উপনীত করিতে পারে না। যুক্তির শেষসীমা কোন খোদা থাকা আবশ্যক, শুধু এই পর্যন্ত জ্ঞানমূলক উপায়ে প্রতিপাদন করা মাত্র। কিন্তু 'হওয়া উচিত' এই পর্যায়ে কখনো শান্তি-স্বস্তি দিতে পারে না। বরং সত্যিকার খোদা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত ঈমান কোনই ঈমান নয়। এই প্রকার নামেমাত্র ঈমান সত্যিকার প্রেমিক ও সত্যানুসন্ধিৎসুর স্বাভাবিক তৃষ্ণা নিবারণ করিতে অক্ষম। যদিও ইহার ফলে মানুষ কোন কোন সময়, শুষ্ক দার্শনিকদের ন্যায় নাস্তিকতার সীমায় গিয়া পৌঁছে। প্রকৃত ঈমান দ্বারা মানুষ খোদা সম্বন্ধে 'হওয়া উচিত' ব্যঞ্জক সন্দেহের আপজ্জনক স্তর হইতে বহির্গত হইয়া দৃঢ়প্রত্যয় এবং নিরাপদ পর্যায়ে উন্নীত হয়। ইহা একা বুদ্ধির ক্রিয়া নয়। কারণ, খোদার অস্তিত্ব 'সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম', পরাৎপার। বুদ্ধি একাকী সেখানে পৌঁছাইতে পারে না। সে কেবল দূর হইতে ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতে পারে মাত্র। সুতরাং, খোদা পর্যন্ত পৌঁছায়, অবশ্য এইরূপ কোন উপায় থাকা উচিত। ইহা পূর্ণ হয় শুধু বান্দাগণের নিকট খোদার এল্‌হামের দ্বারা। তাহাদের কাছে তাঁহার রসূলগণের আগমনের ফলে তাঁহার অস্তিত্ব যেন অনুভূত ও প্রত্যক্ষ হইয়াই-পড়ে এবং এই সীমায় উপনীত হইয়াই আটকায় না যে, খোদা থাকা উচিত, বরং এই সীমায় পৌঁছায় যে, খোদা আছেন এবং মানুষ তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ। 'হওয়া উচিত' বা 'থাকা সম্ভবপর' শুধু এক প্রকার শুণ্যতা বা কাল্পনিক প্রতীমা উপস্থিত করে মাত্র। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব বলেন ঃ-

'বিন দেখে কিসতরেহ্‌ কিসি মাহে রুখপে, আয়ে দেল কেওঁউ করে কোয়ী খিয়ালী সনম সে লাগায়ে দেল?"

অর্থাৎ, 'না দেখিয়া কোন চন্দ্র মুখের প্রতি কিরূপে হৃদয় আকর্ষিত হইতে পারে? কোন কাল্পনিক পুতুলে কীরূপে মন মজিতে পারে?"

তারপর, তিনি তাঁহার এল্‌হাম সমূহকে এবং খোদার কুদরত প্রকাশক বহ নিদর্শনাবলী, যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের মারফত এবং এ যুগে স্বয়ং হযরত মির্যা সাহেবের দ্বারা খোদা প্রদর্শন করেন, অকাট্য প্রমাণরূপে পেশ করেন এবং অস্বীকারকারীদিগকে পরীক্ষার জন্য আহবান করেন। কেহই সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। ইসলামের পতাকা উচ্চ আকাশে উড়িতে থাকে।

দেব সমাজের সহিত সংগ্রাম ঃ

পঞ্চম, ধর্ম্ম নাস্তিকতা এবং দেব সমাজ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মও আজকাল ভিতরে ভিতরে অধিকাংশ ব্যক্তির মনকে গ্রাস করে। কেহ কেহ সাহস পূর্বক ইহা প্রকাশ করিল এবং সতন্ত্র সম্প্রদায়বদ্ধ হইল। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিরাই তাহাদের সন্দেহ মনে মনে গোপন করিয়া রাখিল, যদিও একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, তাহাদের ঈমান কীটে ধ্বংস করিয়াছে। হিন্দু, খৃষ্টান স্বয়ং মোসলমান ও অন্যান্য জাতিদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ তাহাদেরই দ্বারা গঠিত, যাহাদের ঈমানে পোকা ধরিয়াছে এবং এ যুগের বিষাক্ত বায়ু, নব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রভাব ও জড়বাদিতার আঁধার যাহাদের ধর্ম্ম লোপ করিয়াছে।

এই সকল ব্যক্তি শুধু প্রথা হিসাবে এবং জাতিগতভাবে ধর্ম্মের সহিত সম্পর্ক রাখে- ধর্ম্মগত উপায়ে নহে। এই সকল গোপন নাস্তিকদের ছাড়া, প্রকাশ্যতঃ লক্ষ লক্ষ সম্প্রদায় খোদা অস্বীকার করিল। হিন্দুদের মধ্য হইতে প্রকাশ্যরূপে অভূত্থিত এইরূপে সম্প্রদায় 'দেব সমাজ' নামে খ্যাত। হযরত মির্যা সাহেবের সহিত এই সমাজের যথারীতি সংগ্রাম হয় নাই। কিন্তু অমনি দেখিতে গেলে, তাঁহার সমস্ত জীবনই এই সম্প্রদায়ের সহিত সংগ্রামে কাটে। তাঁহার প্রণীত সমস্ত গ্রন্থাবলী এই সম্প্রদায়েরই খণ্ডনে লিখিত। কারণ, চিন্তা করিলে প্রতীত হয় যে, যে সকল যুক্তির দ্বারা তিনি অন্যান্য ধর্ম্মগুলিকে পরাস্ত করেন, ঐ সকল যুক্তিই এই ধর্ম্মেকেও ধুল্যবৎ উড়ইয়া দেয়। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের প্রমাণ সমূহের দ্বারা এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রখর মার্তণ্ডের উদয় হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, আথামের কতল হওয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ও তাহার সঙ্গীদের ধ্বংস হওয়া প্রভৃতি। এইসব আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতামূলক নিদর্শনাবলী শুধু খৃষ্টান এবং আর্য্য ধর্ম্মেরই মূলোচ্ছেদ করিতেছে না, নাস্তিকতা ও দেব সমাজের উপরেও সুতীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতেছে।

প্রকৃতপক্ষে, যখন তিনি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আমন্ত্রণ করেন, তখন দেব সমাজকেও বিশেষভাবে আহ্‌বান করেন। কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা, নাস্তিকের প্রাণ দুর্বল। ইহাদের কেহই সম্মুখে বাহির হয় নাই। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি খোদা মানে, সে ভ্রান্তভাবেই মানুক না কেন, তবু তাহার হৃদয়ে এক প্রকার বল থাকে। কিন্তু নাস্তিকদের মন সর্বদা কাঁপিতে থাকে। তাহারা কখনো শান্তি পায় না। তাহাদের মন স্থির থাকে না।

এই জন্য তাহারা, সাধারণতঃ সম্মুখীন হওয়ায় ভয় পায়। কখনো কোন নাস্তিক, কোন দেব সমাজীই হযরত মির্যা সাহেবের সম্মুখীন হওয়ার সাহস করে নাই। তিনি দুইভাবে তাহাদের সম্মুখীন হন। একে তো তিনি প্রমাণ করিলেন যে, অবিকৃত বুদ্ধি সঠিক ব্যবহারের ফলে তাহাদের প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারে যে, একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ, এই জড়-বিশ্ব মহাসূক্ষ্ম কৌশলসমূহ ও অতুলনীয় সুশৃঙ্খলাসহ একজন স্রষ্টা নির্দেশ করে। এই অনুপম কারুকার্যময় মহা শিল্প মহা প্রতিষ্ঠান স্রষ্টা ব্যতীত হওয়া ও থাকা স্পষ্টতঃ বিবেক বুদ্ধি বহির্ভূত কথা। সুতরাং, আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, এই বিশ্বের কোন স্রষ্টা ও কর্তা থাকা উচিত। একজন সত্যান্বেষী 'থাকা উচিত'-এই পর্যায়ে পৌঁছিলে পর তাহার জন্য এল্‌হাম ও মহিমা প্রদর্শক নিদর্শনাবলী দ্বারা লাভবান হওয়ার দরোজা খোলে। উহা তাহাকে 'আছেন' পর্যায়ে উপনীত করে। অন্য কথায়, 'থাকা উচিত' পর্যন্ত পৌঁছা খোদার ফজলে মানুষের কাজ এবং 'আছেন' পর্যায়ে পৌঁছানো আল্লাহ্‌র কাজ। ইহা তিনি তাঁহার মহিমা প্রকাশ এবং এল্‌হামের দ্বারা সম্পাদন করেন। হযরত মির্যা সাহেব বলেন ঃ

"কুদরত সে আপনি জাতকা দেতা হ্যায় হক্ সবুত, ইস্ বে-নেশান কি চেহ্‌রানুমায়ী এহী তো হ্যায়। জিস্ বাতকু কহে কে করুঙ্গাহ ইয়েহ্ জরুর, টলতি নহি উহ্ বাত, খোদায়ী এহী তো হয়।"

"মহিমা দ্বারা তিনি তাঁহার সত্তার পরিচয় দেন; সেই পরাৎপরের রূপ প্রদর্শনত ইহাই।

যে কাজ তিনি অবশ্যই করিবেন বলেন, তাহা কখনো টলে না- ইহাইত খোদায়ী,"

খোদা যেমন পরমপদ, পরাৎপর অস্তিত্ব, তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ মনে করা যে, বহিরেন্দ্রিয়গুলি দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করা যায়, ইহা অতীব মূর্খতার কথা। কোরআন শরীফ বলে ঃ-

"লা তুদরেক্‌হুল্ আব্‌সারু ও হুয়া ইউদ্‌রেকুল আব্‌সারা ও হুয়াল্ লাতীফুল খবীর।" ('সূরাহ্ আন্‌আম,' রুকু-১৩)

"খোদা সূক্ষ্ম। তজ্জন্য বহিরেন্দ্রিয়গুলি তাঁহার নিকটে পৌঁছিতে পারে না। তিনি অন্তর্য্যামী। তিনি জানেন যে, তিনি তাঁহার বান্দার নিকট না পৌঁছা পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিকভাবে সে জীবিত থাকিতে পারে না। তাহার ঈমান সম্যক পরিপুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, শান্ত ও স্থির থাকিতেও পারে না। তজ্জন্য, তিনি নিজেই মানবেন্দ্রিয়দের কাছে অবতরণের দ্বারা আপনিই আপনাকে অনুভূত হইতে দেন।" অর্থাৎ, রসূল প্রেরণ এবং এল্‌হাম ও 'কুদরত' (মহিমা) প্রকাশের দ্বারা আপন দর্শন দেন, যেন মানুষের ঈমান "থাকা উচিত" স্বরূপে সন্দেহের গহ্বর হইতে বর্হিগত হইয়া সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছে। হযরত মির্যা সাহেব সমগ্র বিশ্বকে আহবান দ্বারা এইরূপ কহিলেন, "এসো,

আমি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিব, খোদা আছেন এবং তিনি অতীব জ্ঞানী। কারণ, আমি একজন মানুষ মাত্র হওয়ায় আমার জ্ঞান অপূর্ণ। কিন্তু খোদা আমাকে বলেন যে, এই এই ব্যাপার হইবে। অতঃপর, তাহা শত শত আড়ালের পিছনে লুক্কায়িত থাকিলেও পরিশেষে তাহা খোদাতা'লার বলা অনুসারেই প্রকাশ পায়। এসো, ইহা পরীক্ষা কর। আমি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিব, খোদা আছেন এবং তিনি অতি শক্তিমান। আমি মানুষ হওয়ার কারণে আমি পূর্ণ শক্তিমান নই। কিন্তু খোদা আমাকে বলেন যে, তিনি অমুক কাজ এই প্রকারে সম্পাদন করিবেন। সেই কাজ মানব শক্তি দ্বারা তদ্রূপ সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইয়া পড়ে। এসো, পরীক্ষা কর। আমি তোমাদিগকে দেখাইব যে, খোদা আছেন এবং তিনি দোয়া শোনেন। কারণ, আমি খোদার নিকট এমন কাজের বিষয়ে দোয়া করি, যাহা সংঘটিত হওয়া চর্ম্ম চক্ষের নিকট কখনো সম্ভবপর নহে। কিন্তু খোদা আমার দোয়ার ফলে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করেন। এসো, পরীক্ষা কর। আমি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিব খোদা আছেন এবং তিনি ইসলামের শত্রুদের উপর যাহারা কুবাচ্য প্রয়োগে সীমার বহির্গমন করে, যুক্তি প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিবার পর তাঁহার গজব নাজেল করেন। এসো, পরীক্ষা কর। আমি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিব খোদা আছেন এবং তিনি স্রষ্টা। আমি মানুষ বলিয়া সৃষ্টি করিতে পারি না। কিন্তু তিনি আমার দ্বারা তাঁহার সৃষ্টিবাচক গুণের জ্যোতিঃ প্রদর্শন করেন। দৃষ্টান্তস্থলে, তিনি কোন জড়োপকরণ ব্যবহার না করিয়া আমার কামিজের উপর কালির ফোঁটা ছিঁটাইয়াছিলেন। সুতরাং, এসো, পরীক্ষা কর। আমি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিব খোদা আছেন। তিনি তৌবা কবুল করেন এবং বান্দার অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাঁহার আযাবের ফয়সলাও পরিবর্ত্তন করেন। কারণ, তিনি অতীব দয়াবান, জালেম নহেন। এসো, ইহার পরীক্ষা গ্রহণ কর। আমি তোমাদিগকে প্রদর্শন করিব খোদা আছেন। এবং তিনি তাঁহার বিশেষ বান্দাগণের সহিত প্রেম পূর্ণ বাক্যালাপ করেন। তিনি আমার সহিত এরূপ করেন। এসো, ইহা পরীক্ষা কর। আমি তোমাদিগকে খোদা আছেন প্রদর্শন করিব। তিনি 'রাব্বুল-আলামীন,' সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। কোন বস্তুই তাঁহার প্রতিপালনের বহির্ভূত নহে। কারণ তিনি কোন বস্তুর প্রতিপালন পরিত্যাগ করিবেন বলিলে, উহা যেমন বস্তু হউক না কেন কায়েম থাকিতে পারে না। এসো, ইহার পরীক্ষা নেও। আমি তোমদিগকে দেখাইব যে খোদা আছেন। তিনি সকল বস্তুর মালিক, সর্ব্বময় কর্ত্তা ও স্বত্বাধিকারী। সৃষ্টির কোন বস্তুই তাঁহার আদেশ অমান্য করিতে পারে না। তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চান, করিতে পারেন। সুতরাং এসো, আমি তোমাদিগকে আকাশে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিব। এসো, আমি তোমাদিগকে পৃথিবীর উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিব। এসো, আমি তোমাদিগকে পানির উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিব। এসো, আমি তোমাদিগকে পাহাড়ের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিব। এসো, আমি তোমদিগকে জাতি সমূহের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিব। এসো, তোমাদিগকে রাষ্ট্র সমূহের উপর তাঁহার কর্ত্তৃত্ব প্রদর্শন করিব। এসো, আমি তোমাদিগকে মানব হৃদয় সমূহের উপর তাঁহার কর্তৃত্ব প্রদর্শন করিব। সুতরাং, এসো, পরীক্ষা কর।"

ইহা এক মহাদাবী। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, ইহা সপ্রমাণ হইলে নাস্তিকতা কায়েম থাকে কি? কিন্তু আমি ঐ সত্তার শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, যাঁহার মুষ্টিতে আমার জীবন নিহিত, হযরত মির্যা সাহেব খোদাতাআলার চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে এসকল বিষয়ই করিয়া দেখাইয়াছেন। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তবে লোকেরা তাঁহাকে মানে নাই কেন? উহার উত্তর, প্রশ্নটি অজ্ঞাতা জ্ঞাপক। কোন্ রসূল আসিয়াছেন, যাঁহাকে সকল মানুষই গ্রহণ করিয়াছে? মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম অপেক্ষা বড় রসূল আর কে? হযরত মির্যা সাহেব তাঁহার গোলামী নিজের জন্য মহাগৌরবজনক মনে করিতেন। তিনি (সঃ) নিজেও বলিয়াছিলেন এবং সত্যই বলিয়াছেন, "ঈসা ও মূসা জীবিত থাকিলেও তাঁহাদিগকে আমার গোলামীর জোয়াল বহন করিতে হইত।" কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি (সঃ) আসিলেন, খোদার আশ্চার্য্য হইতে আশ্চার্য্য কুদরত (মহিমা) প্রদর্শন করিলেন, তবু অন্ধ-চিত্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে মানে নাই। এমন কি, সাড়ে তের শত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, তাঁহার অস্বীকারীদের সংখ্যা স্বীকারকারীদের চেয়ে বহু অধিক। সুতরাং অজ্ঞানোচিত প্রশ্ন করিতে নাই। কোরআন শরীফ খোলিয়া দেখুন খোদাতা'লা বলেন ঃ-

"ইয়া হাসরাতান্ আলাল এবাদ, মা ইয়াতীহেম্ মির রাসূলিন্ ইল্লা কানু বেহি ইয়াস্‌তাহ্ যিউন।"

অর্থাৎ, "আক্ষেপ, লোকদের প্রতি! পৃথিবীতে এমন কোন রসুলই আসেন নাই, যাঁহাকে অস্বীকার পূর্ব্বক তাহারা তাঁহাকে লইয়া হাসি-বিদ্রূপ করে নাই।" অতএব, আমরা এ জন্য সন্তুষ্ট যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীগণও নবীগণের বিরুদ্ধবাদীদের আচরিত চিরপ্রথা স্বহস্তে পূর্ণ করিয়াছেন। সুতরাং, ভাবিয়া দেখুন, এই বিরোধিতাও হযরত মির্যা সাহেবের সত্যতার একটি প্রমাণ।

উপরোল্লিখিত পাঁচটি ধর্ম্মকে হযরত মির্যা সাহেব যেরূপ প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়াছিলেন, এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণের দ্বারা উহাদের উপর প্রাধান্য প্রদর্শন করেন, সংক্ষেপে আমরা তাহা বর্ণনা করিয়াছি। সবিস্তারে জানার জন্য কেতাবের হওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ধর্ম্ম বাদেও জগতে বৌদ্ধ ধর্ম্মও আছে। ইহা এখন একটি মৃত-প্রায় ধর্ম্ম। অর্থাৎ, ইহার অনুবর্ত্তীরা সম্ভবতঃ সংখ্যায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণ অপেক্ষা অধিক হইলেও উহাদের মধ্যে বিশেষ কোন জীবনী-শক্তি পাওয়া যায় না। এই ধর্ম্মের, কার্য্যতঃ কোনই প্রচার-ব্যবস্থা নাই। তবু ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না ('রিভিউ অব রিলিজিয়নস' দ্রষ্টব্য)। তারপর, ইহুদী ধর্ম্ম। প্রসঙ্গক্রমে বহু স্থানে হযরত মির্যা সাহেব তাঁহার বহুল গ্রন্থে ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তারপর, পারসিক ধর্ম্ম। বর্ত্তমানে ইহা একটি জাতীয় ধর্ম্ম স্বরূপে মাত্র কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মাকারে প্রচলিত আছে। ইহারও অল্প বিস্তর সেবা 'রিভিয়ু অব্ রিলিজিয়ন্‌স্' পত্রে করা হইয়াছে। তারপর মুর্ত্তি-পুজা। হযরত মির্যা সাহেব বিভিন্ন স্থানে তাঁহার গ্রন্থাবলীতে

ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তারপর, 'থিওসফি'। ইহা কোন ধর্ম্ম না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে ('রিভিয়ু অব রিলিজিয়ন্স্' দ্রষ্টব্য)। তারপর, 'বাবী বা বাহাই' ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে বাঁচিয়া থাকার মত স্পন্দন পাওয়া যায়। কারণ ইহা একটি সম্পূর্ণ আধুনিক মতবাদ। কিন্তু এখন ইহারও পতন ঘটিতেছে। তারপর, চিন্তা করিলে জানা যায় ইহা কোন ধর্ম্ম নয়। ইহা একটি নৈতিক সমাজ বিশেষ মাত্র। ইহার প্রবর্ত্তকের. প্রথমে, ইসলামের সহিত সম্পর্ক ছিল। পরে বিভিন্ন ধর্ম্মের যে সকল শিক্ষা ভাল বোধ হইতেছিল এবং কানে ভাল শুনাইতেছিল, তাহা লইয়া একটি প্রতিষ্ঠানের আয়োজন হইল। এই জন্য, ইহাতে কোন প্রকার মূল-সূত্র স্বরূপে ধর্ম্মবিশ্বাস বা অবশ্য পালনীয় কর্ম্মনীতি পাওয়া যায় না, যাহার সহিত অন্য কোন ধর্ম্মের সংঘর্ষ হইতে পারে, বরং ইহা মোটামুটি সকল ধর্ম্মেরই প্রশংসা করে এবং এক প্রকার সমন্বিত নৈতিক শিক্ষা দেয়। বর্ত্তমান যুগের কোন কোন আজাদ খেয়াল ব্যক্তি ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, প্রকৃতপক্ষে, এই ধর্ম্ম স্বাধীন চিন্তাধারার একটা শাখা মাত্র। কাদিয়ানের 'রিভিয়ু অব্ রিলিজিয়ন্স্' পত্রে ইহারও ধারাবাহিক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। আহমদীয়া জমাতের পক্ষ হইতে ইহার সম্বন্ধে কোন কোন পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম গবেষণার দুইটি স্বর্ণোজ্জ্বল নীতিঃ

এখন ধর্ম্ম সমূহের সহিত সংগ্রামের বিস্তৃত সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে, আমরা সম্যক বিষয়টির উপর একবার সরাসরিভাবে নযর করিতেছি। আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব, হযরত মির্যা সাহেব সাধারণভাবে ইসলামের কী খেদমত করিয়াছেন।

প্রথম কথা, হযরত মির্যা সাহেব ধর্ম্মীয় তর্ক-বিতর্ক, বহস্-মোবাহাসার জন্য অতি সুন্দর নীতি দিয়াছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মের তর্ক ইহা দ্বারা অত্যন্ত খাঁটো হইয়া পড়িয়াছে এবং একজন সত্যান্বষী সত্য ও মিথ্যার মধ্যে অতিশয় সহজে মীমাংসা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এই নীতির প্রতিই আমরা আথামের সহিত তর্ক উপলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিয়াছিল।

এই নীতিটি হইল, কেহ তাঁহার ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন দাবী উপস্থিত করিলে তাহার প্রথম কর্ত্তব্য হইবে, তাহার ধর্ম্মীয় পুস্তক হইতে উহা সপ্রমাণ করিবে এবং তাহার ধর্ম্ম-পুস্তক হইতেই যুক্তি দিবে। দৃষ্টান্তস্থলে, একজন খৃষ্টান বলে যে, খোদা তিন। সে ইঞ্জীল হইতে ইহা সপ্রমাণ না করা পর্য্যন্ত তাহার এই দাবী আদৌ বিবেচনার অযোগ্য। অর্থাৎ, তাহাকে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, বাস্তবিক ইঞ্জীলেও 'খাদা তিন'-এই দাবী বিদ্যমান। তারপর, তাহারা যদি ইঞ্জীল হইতে এই দাবী সপ্রমাণ না করিতে পারে, তবে ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে যে, এই বিশ্বাসটি ইঞ্জীলোক্ত বিশ্বাস নহে। তদবস্থায় ইহা খৃষ্টান ধর্ম্মের পক্ষ হইতে উপস্থিত করা যাইবে না। উহা টমস্, জেমস্ বা প্যারীর মত বলিয়া বিবেচিত হইবে, যাহা সে ইঞ্জীলের প্রতি আরোপক্রমে উপস্থিতি করিয়াছে। কিন্তু মূল ইঞ্জীলে ত্রিত্ববাদের কোন দাবী ও প্রমাণ না থাকায় এই এক বিবেচনার ফলে তর্কের অবসান

হইবে। কারণ তর্ক খৃষ্টান ধর্মের বিষয়ে-টমাস্, জেমস্, বা প্যারীর মতের বিষয়ে নয়। প্রকাশ্য কথা, সেই ধর্ম্ম-পুস্তকও আদৌ বিবেচ্য নহে, যাহা উহার ধর্ম্মীয় মন্ত্রগত বিশ্বসের শুধু দাবী উপস্থিত করিতেও অক্ষম এবং শুধু দাবীর জন্যও টমাস্, জেমস্ প্রভৃতির মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়। যদি কোন ধর্ম্ম-পুস্তক দাবী পেশ করে সত্য, কিন্তু যুক্তি পেশ করিতে না পারে, অর্থাৎ, উহাতে দাবী থাকে, 'দলীল' না থাকে এবং দলীল দেওয়ার জন্য উহাকে অপরের কৃপাভাজন হইতে হয়, তবে উহাও ঐ পুস্তক এবং ঐ ধর্ম্মের ব্যর্থতার একটি সুনিশ্চিত দলীল হইবে। কারণ যে ধর্ম্ম প্রমাণের জন্য অপরের শরণাগত হয় এবং অপরের মুখাপেক্ষী থাকে- শুধু দাবীই করিতে জানে এবং প্রমাণের বেলায় চুপ করে, উহা খোদার তরফ হইতে নহে। বস্তুতঃ, উভয় দিক দিয়াই এই ধর্ম্মের মৃত্যু হইয়াছে। আমরা অবশ্য স্বীকার করি যে, কোন কোন সমর্থন সূচক বাহিরের যুক্তিও থাকিতে পারে। বাহিরের কোন কোন প্রমাণ দোষণীয় নয়। কিন্তু কোন ধর্ম্মপুস্তক প্রমাণ দেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অক্ষম হইলে, ইহা অতি মারাত্মক দুর্ব্বলতা। এই অবস্থায় সে ধর্ম্ম কখনই গ্রহণীয় নয়।

এখন দেখুন এই নীতি কেমন মজবুত, ইহা কত সুদৃঢ়। কিন্তু ইহা স্বীকারের ফলে, ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্মের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দৃষ্টান্তস্থলে, খৃষ্টানদের বিশ্বাস,. খোদা তিন এবং খৃষ্টও খোদা, এবং প্রায়শ্চিত্ত্ববাদ সত্য। এখন অনুসন্ধান করিলে ইঞ্জীলে এই বিশ্বাসের যুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, শুধু দাবীটিও নাই। খৃষ্টানেরা তাহাদের মুখে যাই ইচ্ছা বলিতে পারে, কিন্তু আমাদের তো প্রয়োজন ইঞ্জীলের শিক্ষার। উহাকে তাহারা তাহাদের ধর্ম্ম-পুস্তক বলিয়া উল্লেখ করে। ইঞ্জীল এই সকল বিষয়ে মূর্ত্তিবৎ নিস্তব্ধ। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, খোদা এক। তাঁহার কোন শরীক নাই। মসিহ্ তাঁহার একজন অনুগৃহীত দান। শুধু এই টুকুই। বস্ ছুটি। সকল তর্কেরই অবসান।

খুবই চিন্তা করুন। ধর্ম্মের মূল সূত্রের উপর উহার সব কিছু নির্ভর করে। পূর্ব্বাপর অবস্থানের বিরুদ্ধে জটিল অবরোহণের দ্বারা উহার নির্ণয়, একটি হাস্যোদ্দীপক ব্যাপার মাত্র। মুল নীতিগুলি সম্বন্ধে ধর্ম্মের পরিষ্কার, সুস্পষ্ট দাবী উপস্থিত করা উচিত। তাহা অতি প্রকাশ্য সত্যের ন্যায় প্রতিপন্ন অত্যাবশ্যক। যদি ধর্ম্মের মূল সূত্রের ব্যাপারেও জটিল অবরোহণের ব্যবহার করিতে হয়, তবে ধর্ম্মের বিশ্বাসাবলীর নিরাপত্তা অন্তর্হিত হয়। দেখুন, কোরআন শরীফে ইসলামের মূল সূত্রগুলি সম্বন্ধে তাহার দাবী কেমন খোলাখুলিভাবে, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তারপর, উহাদিগকে বারবার উল্লেখ করিবার দ্বারা যেন সূর্য রশ্মির কিরণ পাত করা হইয়াছে। ইঞ্জীলে ইহা একেবারেই নাই। দ্বিতীয় স্থান যুক্তি ও প্রমাণের। ইঞ্জীল এদিক হইতেও, একেবারেই মুক। দাবীর ব্যাপারে তো খৃষ্টানেরা যাহা হোক, দূরবর্ত্তী অর্থ গ্রহণ এবং জটিল অবরোহণের দ্বারা কোন একটা কিছু দাঁড় করিলেও প্রমাণের জোগাড় করিবে কোথায়? সুতরাং কিছু অমুকের মস্তিষ্ক হইতে গ্রহণ 'এবং কিছু অমুকের নিকট জিজ্ঞাসা দ্বারা ইঞ্জীলের ভিক্ষা-পাত্র পূর্ণ করিতে হয়। ইহা এক আশ্চর্য্য ধর্ম্ম। ইহা ইহার দাবীও উপস্থিত করিতে পারে না এবং যে দাবী করা হয়, উহার কোন দলীলও দিতে পারে না। ইহা মোমের ন্যায়।

ভক্তেরা যে দিকে ইচ্ছা, ইহার মোড় ফিরাইতে পারে। খৃষ্টানেরা বলিবেন কি, তাঁহারা ইঞ্জীল হইতে কী উপকার লাভ করিয়াছে? এতে ইঞ্জীলের প্রতি তাদের দয়া দাক্ষিণ্যের দ্বারা হউক আর যেভাবেই হউক, তাঁহারা কোনরূপে লাঞ্ছনার মুখ হইতে ইঞ্জীলকে রক্ষা করিয়াছেন। 'লাহাওলা ওলা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্' (–আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কেহ পাপও ছাড়িতে পারে না, পুণ্যও করিতে পারে না)।

আর্য্যদেরও একই অবস্থা। তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিষয়, আত্মা ও পরমাণু অনাদি। কিন্তু বেদ হইতে ইহার দাবী চাহিলে, পাওয়া যায় না। চতুর্ব্বেদ অন্বেষণের পর কেবল মাত্র একটি শ্লোক উপস্থিত করেন। উহাকে তাঁহাদের মতে রূপকভাবে, অলঙ্কার স্বরূপে আত্মা ও পরমাণু অনাদি হওয়ার দাবী বর্ণিত হইয়াছে। এই দেখুন, ইহা কেমন ধর্ম্ম। ভারী ভারী চারিটি পুস্তক বিদ্যমান। সম্ভবতঃ দুর্ব্বল আর্য্য উহাদিগকে উঠাইতেও পারে না। কিন্তু প্রমাণ দেওয়া তো দূরের কথা, ধর্ম্মের মূল মন্ত্রের দাবী পর্য্যন্তও উহাদের মধ্যে নাই। চারি বেদের মধ্যে কিছু থাকিবার মধ্যে শুধু একটি শ্লোক মাত্র আছে। উহার সম্বন্ধে আর্য্যগণ স্বয়ং স্বীকার করেন যে, উহা হইতে রূপাত্মকভাবে এই বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায়। কেহ বলিয়াছেন,–

"জো চীরা তো এক্ কাৎরায়ে খুন না নিকলা।"

এইরূপ জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ মূলমন্ত্র সম্বন্ধে বেদের কর্ত্তব্য ছিল স্পষ্ট, খোলা ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহার ধর্ম্মমত ব্যক্ত করা এবং স্থানে স্থানে উহার পুনরুক্তি করা, যেন কোনরূপ সন্দেহ স্থান না পায়। কিন্তু এরূপ করা হয় নাই। তজ্জন্য এই বিপুল সন্দেহের উৎপত্তি হয় যে, আত্মা ও পরমাণু অনাদি হওয়া বৈদিক মত নয়। ইহা বর্ত্তমান আর্য্যদের মনগড়া অনুমান, যাহা বেদের উপর অযথা আরোপ করা হইয়াছে। কারণ ব্যাপারটা 'দাবীকারক শিথিল এবং সাক্ষী তেজস্বী' হওয়ার।

তারপর প্রমাণের দিক হইতে বেদ মহাশয় প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় মূক। কিন্তু চেলারা আকাশ পাতাল তুলপাড় করিয়া থাকে। যে পুস্তক উহার মূল মন্ত্রও নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করে নাই, প্রমাণও কোথাও দেয় নাই এবং উভয় ক্ষেত্রেই পরের দুয়ারে সাহায্যের প্রার্থী হয়, উহা আমাদিগকে কী পথ প্রদর্শন করিবে? সে ত নিজেই অন্যের নিকট পথ প্রদর্শনের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। হযরত মির্যা সাহেব সুন্দর বলিয়াছেনঃ

"মুর্দ্দা সে কব্ উমেদ হ্যায় কে জিন্দা কর সকে, ইস্ সে তো খুদ মুহাল কে রহ্ ভি গুযর সকে?"

"মৃত ব্যক্তি অন্যকে জীবিত করিবে, ইহা কখনো আশা করিবার নয়। সে ত নিজেই বাঁচিয়া থাকিতেও পারে না।"

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার এই। চিন্তা করিলে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, এই সকল ধর্ম্ম আদিতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমানে ভ্রান্ত, শির্‌কে পরিপূর্ণ ধারণাগুলি পরে মিশিয়াছে এবং বাহির হইতে কালক্রমে আমদানী হইয়া ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

এই ধর্ম্মের মূল পুস্তক মানুষের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত বহুলাংশে ঐ সকল ভ্রান্ত ধারণা হইতে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আছে, যদিও আনুবর্ত্তীরা কার্য্যতঃ ঐ সকল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছে। বস্তুতঃ মূল শিক্ষা, মূল সত্যপূর্ণ অংশ এখনো ঐ সকল ধর্ম্মীয় মূল পুস্তকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। এই কারণেই এই সকল পুস্তকে ঐ সকল ভ্রান্ত ধারণার প্রমাণ পাওয়া দূরের কথা, শুধু দাবীরও সন্ধান করা যায় না।

বস্তুতঃ হযরত মির্যা সাহেব ধর্ম্ম গবেষণার ক্ষেত্রে এই একটি অতি শক্তিমান নীতি সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাকে সম্মুখে রাখিয়া ইসলামের শত্রুদের সম্মুখীন হইলে, তাহারা এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা সত্যান্বেষীকে মীমাংসার্থে অতি উত্তম সুযোগ সরবরাহ করে। পাঠক, বিবেচনা করিবেন, হযরত মির্যা সাহেবের এই একই আঘাতে কী প্রকারে সর্ব্ব ধর্ম্মাবলীর মীমাংসা হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে খৃষ্টান এবং আর্য্য ধর্ম্ম-বিশ্বসগুলি সম্বন্ধে যথাক্রমে ইঞ্জীল ও বেদ সম্পূর্ণ নীরব থাকায় ইসলামের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় সুনিশ্চিতরূপে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। অবশ্য রাম, শ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের ধারণাগুলি রহিয়াছে হযরত মির্যা সাহেব উহাদেরও যে অবস্থায় পরিণত করিয়াছেন উপরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মগুলিরও একই অবস্থা।

তারপর যে মহানীতি হযরত মির্যা সাহেব ধর্ম্ম সমূহের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা হইল কোন ধর্ম্মের সত্যতা পরীক্ষার্থে উহার ভূত ও ভবিষ্যৎই মাত্র দেখা যথেষ্ট নহে বরং উহার বর্ত্তমানও দেখা কর্ত্তব্য। যদি কোন ধর্ম্ম উহার অতীত সম্বন্ধে বড়ই জোর গলায় কেচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করে, এবং ভবিষৎ সম্বন্ধেও বড় বড় ওয়াদা করে, কিন্তু বর্ত্তমান কালে উহার অনুবর্ত্তীদের জন্য কোন আশা ভরসা পেশ করে না, তবে এইরূপ ধর্ম্ম কখনো বিবেচনার যোগ্য নয়। ইহার যাবতীয় শিক্ষাই শুধু প্রতারণা মাত্র। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই উহা হইতে আত্ম-রক্ষা করিবে। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে লোকেরা কোন্ ধর্ম্ম পালনের ফলে কি লাভ করিয়াছিল বা ভবিষ্যতের জন্য কোন্ ধর্ম্ম কি ওয়াদা করিতেছে, উহার দ্বারা আমাদের কাজ কি? এই উভয় কালই পর্দ্দার আড়ালে লুক্কায়িত। উহাদের প্রকৃত অবস্থা এক মাত্র আল্লাহতা'লাই জানেন। আমাদের যাহার প্রয়োজন, তাহা শুধু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা। আমাদের বর্ত্তমান ভাল না হইলে অতীত যুগের ইতিহাস আমাদের জন্য একটা গল্প এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি মরীচিকা মাত্র। অবশ্য যদি কোন ধর্ম্ম বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে সত্য ধর্ম্মের অনুমোদিত প্রত্যাশিত ফল দেয়, তবে অবশ্য আমরা অতীত যুগের গল্পগুলিও সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। কিন্তু শুধু অতীতের এবং ভবিষ্যতের উপর বরাদ্দের দ্বারা আমরা আদৌ কোনই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি না।

সুতরাং হযরত মির্যা সাহেব বলিয়াছেন যে, সত্য ধর্ম্ম নির্ণয়ের মাপ-কাঠি হইল উহা উহার সুমিষ্ট তাজা ফল হাতে হাতে দিবে এবং অতীতের গল্প বা ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দ্বারা ভুলাইবার চাহিবে না। দৃষ্টান্তস্থলে, যদি কোন ধর্ম্ম খোদা পর্য্যন্ত মানুষকে পৌঁছাইবার দাবী করে, তবে মানব প্রকৃতি কখনো এ কথায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না যে, উহার ধর্ম্ম-পুস্তকে লিখিত আছে যে, অতীত যুগে এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ খোদা পর্য্যন্ত পৌঁছিতেন বা এই ধর্ম্ম দাবী করে যে, মৃত্যুর পর ইহার অনুবর্ত্তীরা খোদা পাইবে। এই

উভয় প্রকার সান্ত্বনাই ছেলে ভুলানোর চেয়ে অধিক নহে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এইরূপ সান্ত্বনা দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে পারে না, বরং নিশ্চিতরূপে তাহার একথা জানার প্রয়োজন যে, আমাদের ধর্ম্ম আমাদিগকে ইহলোকেই খোদা পর্য্যন্ত পৌছায় এবং আমরা খোদার জ্যোতির অভ্রান্ত বিকাশ এ জীবনেই স্বচক্ষে দর্শন করিতে পারি এবং তাঁহার নৈকট্য একটি জাজ্বল্যমান সত্যরূপে অনুভব করিতে পারি। যদি তিনি অনুপম, সূক্ষ্ম, অসীম ও পরাৎপর হওয়ায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে না পারিলেও অন্ততঃ তাঁহার জীবন-প্রদ বাণী স্বকর্ণে শুনিতে পাই, এবং তাঁহার নিদর্শনাবলী স্বচক্ষে দর্শন করি, যেন তাঁহার অস্তিত্ব আমাদের জন্য শুধু একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত রূপেই না থাকিয়া একটি জীবন্ত, অনুভূত ও অভিজ্ঞাত অস্তিত্ব স্বরূপ হইয়া পড়ে, তদবস্থায় অবশ্য অতীত যুগের গল্পগুলিও আমাদের জন্য এক প্রকার জ্বলন্ত শিক্ষা হইবে এবং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিও কোন কাল্পনিক বস্তুরূপে আর থাকিবে না। কিন্তু ভাবুন ত, জগতে কতগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহারা আমাদের জন্য এই প্রকার জীবনের সামগ্রী সরবরাহ করে?

হযরত মির্যা সাহেব দাবী করিয়াছেন যে, এই প্রকার যে আধ্যাত্মিক জীবন তাজা, সদ্য ফল স্বরূপ লাভ করা যায়, তাহা শুধু ইসলামেই পাওয়া যায় এবং অন্য কোন ধর্ম্ম এই প্রকার জীবনের লক্ষণ প্রদর্শন করিতে পারে না। কারণ অন্যান্য সকল ধর্ম্ম সমূহের সবই নির্ভর করে শুধু পুরাতন কাহিনী বা ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির উপর। দৃষ্টান্তস্থলে, খৃষ্টানদের মধ্যে এরূপ কোন ব্যক্তি পাওয়া যায় না যে, তিনি খোদাতা'লার তাজা কালাম হইতে জীবন লাভ করেন এবং খোদার হস্ত পদে পদে তাঁহার সাহায্য করে। সেইরূপ, আর্য্য-ধর্ম্মের এরূপ কোন অনুবর্ত্তী দেখা যায় না যে, তিনি বর্ত্তমান যুগে খোদাতা'লার সাহায্যের জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিতে পারেন এবং খোদাতা'লার তাজা কালাম তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ হয়। অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহেরও একই অবস্থা। উহাদের নিকট প্রাচীন কাহিনী বা ভবিষ্যতের জন্য মনোরম ওয়াদা ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেব প্রদর্শন করিয়াছেন, ইসলাম খোদার এক জীবন্ত ধর্ম্ম। কারণ, ইহা আজিও তেমনি ফল দেয়, যেমন আঁ-হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম-এর সময় প্রদান করিত। ইহা আজিও ইহার অনুবর্ত্তীদিগকে খোদার সহিত মিলিত করে, যেমন পূর্ব্বকালে করিয়াছে। আজিও ইহার আজ্ঞানুবর্ত্তী তেমনি খোদাতা'লার তাজা কালাম শ্রবণ করেন, যেমন পূর্ব্ববর্ত্তীগণ শুনিতেন। আজিও, ইহার অনুবর্ত্তী তেমনি খোদাতা'লার জেন্দা নিদর্শন সমুহ প্রদর্শন করেন, যেমন পূর্ব্বকালে বিশিষ্ট লোকেরা প্রদর্শন করিতেন। সুতরাং জীবিত ধর্ম্ম শুধু ইসলাম, এবং অন্যান্য ধর্ম্মগুলির আয়ুষ্কাল শেষ হইয়াছে। হযরত মির্যা সাহেব বারবার তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগকে প্রতিযোগিতা মূলক উপায়ে আহ্বান করিয়াছেন যে, এই দিক দিয়া যে-কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার সম্মুখীন হইয়া স্বধর্ম্মের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে পারেন। তাঁহার সম্মুখীন হওয়ার সাহস কেহই করে নাই। লেখরাম, ডুই প্রভৃতির ন্যায় যে কেহ দুঃসাহস করিয়াছিল, সে ইসলামের সত্যতায় তাহার ধ্বংস হওয়ার স্বাক্ষরের দ্বারা চির নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। এখন, দেখুন, ইসলাম ইহা দ্বারা কত মহাবিজয় লাভ করিয়াছে এবং ইহা কত সত্য ও সুদৃঢ় নীতি, যাহা ইসলামের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় প্রতিপাদন করিয়াছে। ('হকিকতুল-অতি,' 'বারাহীনে-আহ্মদীয়া' পঞ্চম খণ্ড প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।)

হযরত মির্যা সাহেব কর্ত্তৃক সমস্ত ধর্ম্মাবলীর উপর ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন

এখন আমরা হযরত মির্যা সাহেবের আরো একটি বড় কাজের উল্লেখ করিতেছি। ইহা দ্বারা ইসলামের প্রাধান্য প্রদর্শন করিবার ঐশী অঙ্গীকার অত্যন্ত উত্তমরূপে পূর্ণ হইয়াছিল।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে লাহোরে কোন কোন হিন্দু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পরামর্শ পূর্ব্বক একটি মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। সকল ধর্ম্মেরই প্রধান প্রধান সমর্থকগণকে ইহাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রাণ স্বরূপ কয়েকটি প্রশ্ন নির্ব্বাচিত হয়। সকল ধর্ম্মেরই প্রতিনিধিগণ ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মানুযায়ী বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হন। কিন্তু এই সকল বক্তৃতায়, অপর কোন ধর্ম্মের উপর আক্রমণ না করিয়া সত্যান্বেষীরা শান্ত মনে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সুযোগ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক বক্তাই স্ব স্ব ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য মাত্র বর্ণনা করিবেন, স্থিরীকৃত হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। আয়োজনটি সুদৃঢ় ভিত্তি অবলম্বন করিল। পরিচালকগণের একটি সাব্-কমিটি গঠিত হইল। বক্তৃতার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিরূপিত হইলঃ-

১) মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সমূহ।

২) মানব জীবনের পরবর্ত্তী অবস্থা।

৩) পৃথিবীতে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং কিভাবে উহা পূর্ণ হইতে পারে?

৪) কর্ম্মফল ইহলোকে ও পরলোকে কিরূপে প্রকাশ পায়?

৫) জ্ঞান ও তত্ত্ববোধের উপায় কী?

অতঃপর প্রত্যেক ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান নেতাদিগকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে বা মৌখিক উপায়ে সম্মিলনীতে বর্ণনা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানো হইল। প্রত্যেক ধর্ম্মের পক্ষ হইতেই দুই জন বা তিন জন ব্যক্তি মনোনীত হইলেন। ইসলামকে উপস্থিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত তিন জনকে মনোনয়ন করা হইলঃ-

১) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব, কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসিহ্ ও মাহ্দী।

২) মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, বটালবী

৩) মৌলবী আবুল্-ওফা সানা উল্লাহ্ সাহেব, অমৃত সহরী।

সেইরূপ, খৃষ্টান, আর্য্য, সনাতন ধর্ম্মীয়, ব্রাহ্ম, শিখ, থিওসোফিক্যাল সোসাইটি, ফ্রিথিঙ্কার প্রভৃতি সকল পক্ষেরই প্রতিনিধিগণ নিয়োজিত হইলেন। সকলকেই অনুরোধ করা হইল যে, তাঁহারা কেবল মাত্র স্ব স্ব ধর্ম্মের শিক্ষা বর্ণনা করিবেন এবং অন্য ধর্ম্মের উপর কোন প্রকার আক্রমণ করিবেন না। সভার তারিখ নির্দ্ধারিত হইল ২৬শে, ২৭ শে ও ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ। সভা অনুষ্ঠানের জন্য আঞ্জুমনে হেমায়েতে ইসলামের হল সাময়িক প্রয়োজনে লওয়া হইল। ইস্তাহার এবং পত্রিকাদিতে ঘোষণা দ্বারা সভার কথা সর্ব্বসাধারণকে জানানো হইল।

হযরত মির্যা সাহেব উল্লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তরে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উহা সহ তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য হযরত মৌলবী আবদুল করীম শিয়ালকোটিকে লাহোর পাঠাইলেন এবং ঐ সঙ্গে ২১শে ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ অর্থাৎ সভার ৫/৬ দিন পূর্ব্বে একটি ইস্তাহারও এই মর্ম্মে প্রকাশ করিলেন যে, খোদার বিশেষ সাহায্যে তিনি এই সন্দর্ভ লিখিয়াছেন এবং খোদা তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার এই প্রবন্ধ অন্যান্য সকল প্রবন্ধের উপরে স্থান লাভ করিবে। সেই ইস্তাহারটি ছিল এই ঃ-

"লাহোর টাউন হলে (পরে এই সভা, কার্য্যতঃ লাহোর ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয়) ২৬শে ২৭শে ও ২৮ শে ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ যে মহা ধর্ম্ম সভা হইবে, উহাতে এই অধমের একটি প্রবন্ধ কোরআন শরীফের সৌন্দর্য্য ও আলৌকিকতা সম্বন্ধে পঠিত হইবে। এই প্রবন্ধটি মানব শক্তির বাহিরে এবং খোদার নিদর্শন সমুহের অন্যতম। ইহা তাঁহারই বিশেষ সাহায্যে লিখিত। ইহাতে কোরআন শরীফের যে সকল তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বারা ইহা সূর্য্য স্বরূপ উজ্জ্বল হইয়া পড়িবে যে, ইহা বাস্তবিক খোদার কালাম– ইহা রাব্বুল আলামীনের কেতাব। যে কেহ প্রবন্ধটিতে বর্ণিত পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আদ্যোপান্ত শুনিবেন, আমি সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁহার মধ্যে এক প্রকার নূতন ঈমান উৎপন্ন হইবে, এক প্রকার নূতন আলো তাঁহার মধ্যে প্রস্ফুটিত হইবে, এবং খোদাতা'লার পবিত্র কালামের একটি পরিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত তফসীর তাঁহার হস্তগত হইবে। আমার এই বক্তৃতা মানুষের বৃথা কথা হইতে পবিত্র। ইহাতে লম্ফ-ঝম্ফের কোন চিহ্নই নাই। এখন আমি শুধু মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া এই ইস্তাহারটি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি, যেন সকলেই কোরআন শরীফের পরম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করেন এবং দেখিতে পান যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণ কতই না অত্যাচার করিতেছেন যে, তাঁহারা অন্ধকার ভালবাসেন এবং আলো ঘৃণা করেন। আমাকে সর্ব্বজ্ঞ, 'আলীম' খোদা এলহাম দ্বারা জানায়াছেন যে, এই প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের উপরে স্থান লাভ করিবে। বস্তুতঃ ইহাতে সত্য, হেকমত ও মারেফাতের যে আলো আছে অন্যান্য জাতিগণ সভায় উপস্থিত হইলে এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহা শ্রবণ করিলে অভিভূত হইবেন, এবং খৃষ্টানই হউন, আর্য্যই হউন বা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, কিংবা অন্য যে কোন হউন, কখনো তাঁহাদের ধর্ম্ম পুস্তকে এই সৌন্দর্য্যপ্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কারণ, খোদাতা'লার অভিপ্রায় এই যে, তিনি সে দিন ঐ পবিত্র পুস্তকের জ্যোতিঃ প্রকাশ করিবেন। এ সম্বন্ধে আমি, 'কাশ্‌ফে,' (জাগ্রত আধ্যাত্মিক স্বপ্ন জগতে) দেখিয়াছি যে, আমার ভবনে গায়েব হইতে একটি হস্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং ইহার স্পর্শে এই ভবনে এক প্রকার আলোক-রশ্মির সম্পাত হইয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া আমার হস্তদ্বয়কেও আলোকিত করিয়াছে। তখন নিকটে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে বলিল, "আল্লাহু আকবার খারেবাত খয়বর" –('আল্লাহু আকবর,' খয়বর ধ্বংস হইয়াছে)। ইহার তাৎপর্য্য, এই ভবনটির দ্বারা আমার অন্তঃকরণ বুঝায়। ইহাতে জ্যোতির কিরণ মালা নিপতিত হয় এবং সেগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্বাবলির কিরণচ্ছটা। "খয়বর" দ্বারা ঐ সকল ধর্ম্মগুলিকে বুঝায়, যাহাদের মধ্যে 'শের্‌ক' ও মিথ্যার সংযোগ ঘটিয়াছে এবং মানুষকে খোদার স্থান দেওয়া হইয়াছে বা খোদার গুণাবলীকে স্থানচ্যুত করা হইয়াছে। সুতরাং আমাকে জানানো হইয়াছে যে,

এই প্রবন্ধটি বেশ বিস্তার লাভ করিলে পর মিথ্যা ধর্ম্ম সমূহের মিথ্যা খুলিয়া পড়িবে এবং কোরআনের সত্য দিন দিন বিশ্বে বিস্তার লাভ করিবে-এমন কি, উহার চক্র পুর্ণাকার লাভ করিবে। তারপর, আমি এই এলহাম প্রাপ্ত হই ঃ-

"ইন্নাল্লাহা মাআকা, ইন্নাল্লাহা ইয়াকুমু আয়নামা কুমতা।" অর্থাৎ,"খোদা তোমার সঙ্গে আছেন। তুমি যেখানে দাঁড়াও, খোদাও সেখানে দাঁড়ান।" রূপকভাবেই ইহাতে ঐশী সাহায্যের কথা বলা হইয়াছে। এখন আমি অধিক লিখিতে চাই না। সকলকেই জানাইতেছি যে, তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই সকল তত্ত্বাবলী শোনার জন্য অবশ্যই সভার তারিখে লাহোরে আসিবেন। ইহাতে তাঁহাদের বুদ্ধি এবং ঈমান যেরূপ লাভবান হইবে, তাহা তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন না।"

এই ইস্তাহার লাহোর এবং দেশের অন্যান্য স্থানে সভার কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত করা হয়। সভার তারিখে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। সকল ধর্ম্মেরই প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বেশ সাজাইয়া গোছাইয়া বক্তৃতা করলেন। হযরত মির্যা সাহেবের বক্তৃতার সময় উপস্থিত হইলে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব দাঁড়াইলেন।

তিনি হযরত মির্যা সাহেবের লিখিত বক্তৃতা পাঠ আরম্ভ করিলেন। এই বক্তৃতা শোনার জন্য বহু লোকের বিশেষ সমাগম হইল। হলে তিল মাত্র জায়গা রহিল না। বক্তৃতার ফলে সকলে মুগ্ধ হইলেন এবং তন্ময় হইয়া শ্রবণ করিলেন । বক্তৃতার জন্য দুই ঘন্টাকাল সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বক্তৃতার অধিকাংশই রহিয়া গেল। সময় উত্তীর্ণ হইল। সকলেই সমকণ্ঠে চাহিলে এই প্রবন্ধের জন্য আরো এক দিন বৃদ্ধি করা হয়। ২৯শে মে ডিসেম্বর বৃদ্ধি করা হইল। কিন্তু ইহাতেও বক্তৃতার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় পার হইলে পর বক্তৃতা শেষ না হওয়ায় শ্রোতাগণ এক বাক্যে আরো সময় দেওয়ার জন্য আবেদন করিলেন। তাঁহারা ইহা শেষ পর্যন্ত শুনিতে চাহিলেন। তখন প্রোগ্রাম অতিক্রম করিয়া আরো সময় দেওয়া হইলে শ্রোতৃমন্ডলীর প্রশংসা ও ধন্যবাদ সূচক ধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হইল। একজন গণ্যমান্য হিন্দু ভদ্র মহোদয় সভাপতি ছিলেন। তিনি অবলীলাক্রমে ঘোষণা করিলেন,"এই প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের উপরিস্থান অধিকার করিয়াছে।" লাহোরে প্রসিদ্ধ ইংরাজী পত্রিকা 'সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট'ও মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কাদিয়ানের মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ সর্ব্বোচ্চ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। এবং প্রায় বিশটি উর্দ্দূ পত্রিকাও প্রবন্ধের সফলতার সাক্ষ্য দান করেন। অতি কঠিন একদর্শিতা পরায়ণ ব্যক্তিগণ ছাড়া সভায় উপস্থিত সকলেই ইহা বিজয়ী হওয়ার কথা স্বতঃই প্রকাশ করেন। আজ পর্য্যন্তও শ্রোতাগণ এই সাক্ষ্যই দেন যে, সে দিন এই প্রবন্ধটি সকলের উপরে ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট' হইতে অনুবাদ প্রদত্ত হইলঃ-

"লাহোর ধর্ম্ম মহাসম্মেলনের বৈঠক ২৬শে, ২৭শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ লাহোরস্থ ইসলামিয়া কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রশ্নের (পরে প্রশ্ন গুলি উদ্বৃত করা হয়) উত্তর প্রদান করেন। কিন্তু সকল প্রবন্ধ অপেক্ষা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর প্রবন্ধ অধিকতর মনোযোগ ও প্রীতির সহিত শুনা হয়। তিনি ইসলামের একজন মহা সমর্থক ও বিজ্ঞ ব্যক্তি। এই বক্তৃতা শুনিবার

জন্য দূর হইতে ও নিকট হইতে সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই অতি অধিক সংখ্যায় যোগদান করেন। মির্যা সাহেব নিজেই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া একজন সুযোগ্য বাগ্মী শিষ্য মৌলবী আবদুল করীম শিয়ালকোটী প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ২৭ তারিখে প্রবন্ধটি প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেও তখন পর্যন্ত প্রথম প্রশ্নেরই উত্তর শেষ হয় নাই। শ্রোতৃবর্গ প্রবন্ধটি মোহাবিষ্ট হইয়া শুনিতে থাকে। তারপর, কমিটি উক্ত সভার অধিবেশন আরো একদিন ২৯শে ডিসেম্বর বৃদ্ধি করেন।"

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 'সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট' হযরত মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেন নাই। হিন্দুগণের পক্ষ হইতে এই সভার যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, উহাতে হযরত মির্যা সাহেবের বক্তৃতা সম্বন্ধে বিবৃত হইয়াছিল ঃ-

"পন্ডিত গুরুধন দাস মহাশয়ের বক্তৃতার পর আধ ঘন্টা বিশ্রাম ছিল। কিন্তু বিশ্রামের পর একজন স্বনামখ্যাত প্রতিনিধি ইসলামের পক্ষ হইতে বক্তৃতার জন্য উপস্থিত হইবার কথা ছিল, সে জন্য অধিকাংশ আগ্রহশীল ব্যক্তিগণ স্থান ত্যাগ করেন নাই। দেড়টা বাজিবার এখনো বহু সময় ছিল, ইসলামিয়া কলেজের বিস্তীর্ণ গৃহ অতি তাড়াতাড়ি ভর্তি হইতে আরম্ভ হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সম্পূর্ণ গৃহ পূর্ণ হইল। তখন অন্যূন সাত হাজার লোকের জনতা। বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজের বহু ব্যক্তি এবং বিজ্ঞ লোকগণ উপস্থিত হইলেন। চেয়ার, টেবিল ও ফরস প্রচুর সরবরাহ করা হইয়াছিল, তাহা সত্ত্বেও শত শত লোকের দাঁড়ানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই সকল দন্ডায়মান আগ্রহান্বিত জনতায় বড় বড় রয়িস, পাঞ্জাবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, আলেম ফাযেল, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, উকীল ব্যরিষ্টার, প্রফেসার, এক্সটা এ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার, ডাক্তার- বস্তুতঃ উচ্চ শ্রেণীর বিভিন্ন বিভাগের সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত সাগ্রহে বরাবর চারি পাঁচ ঘন্টা কাল তখন এক পায়ের উপর তাঁহাদের দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের জন্য যদিও কমিটির পক্ষ হইতে মাত্র দুই ঘন্টা কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমন্ডলীর ইহার প্রতি এতই আগ্রহ জন্মিয়াছিল যে, মডারেটার মহোদয়েরা অতিশয় আনন্দ ও উৎসাহের সহিত অনুমতি জ্ঞাপন করিলেন যে, এই প্রবন্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্মেলনের কার্য্য শেষ করা হইবে না। তাঁহাদের ইহা করা সভাস্থ উপস্থিত ভদ্র সহোদয়গণের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুমোদিত ছিল। কারণ সময় অতিক্রম করিলে মৌলবী মোবারক আলী সাহেব তাঁহার সময়ও এই প্রবন্ধের জন্যই দোয়ায় শ্রোতৃবর্গ এবং মডারেটর মহোদয়েরা আনন্দ ধ্বনি উত্থাপন পূর্ব্বক মৌলবী সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের সহিত আগাগোড়া প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এইরূপ ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বিদ্যমান ছিল।" (লাহোর মহাধর্ম্মসভার রিপোর্ট)

তারপর এই সম্মিলনীতেই শিখ বক্তা সর্দ্দার জোয়াহের সিংহ সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে হযরত মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন, "গতকল্যকার লিখিত বক্তৃতার দ্বারা সন্তুষ্ট হন নাই এবং উহাকে পসন্দ করেন নাই, এমন কেহই ছিলেন না।"(লাহোর মহাধর্ম্মসভার রিপোর্ট)

পাঠক, ভাবুন ত, ইহা ইসলামের জন্য কেমন মহাবিজয় ছিল! একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই প্রশ্নগুলি নির্দ্ধারিত হইয়া প্রচার করা হইল। সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণই প্রস্তুত হইয়া ইহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের শিক্ষা উপস্থিত করেন। আর্য্যগণও মঞ্চে উপস্থিত হন। খৃষ্টানেরাও উপস্থিত হন। ব্রহ্মরাও উপস্থিত হন। শিখেরা উপস্থিত হন। হযরত মির্যা সাহেবও ইসলামের পক্ষে একটি সন্দর্ভ লিখিয়া উপস্থিত করেন এবং পূর্ব্ব হইতেই ইস্তাহারের দ্বারা ঘোষণা করেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে। তারপর, শত্রু মিত্র, আপন পর, মোসলেম, অ-মোসলেম, নিজ নিজ কথা ও কার্য্যের দ্বারা ইহাই স্বীকার করিলেন যে, বাস্তবিক এই প্রবন্ধটিই সর্ব্বোচ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

এই প্রবন্ধ এখন ইংরেজীতেও অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে -(The Philosophy of the Teachings of Islam)। (এ যাবৎ পুস্তকটির বাংলাসহ প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে-প্রকাশক)। ইহার দ্বারা পাশ্চত্য দেশগুলিতে ইসলামের প্রচার ব্যাপারে আমরা বড়ই সাহায্য পাইয়াছি। ইউরোপ ও আমেরিকার জ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তিগণ ইহা পাঠে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদের অন্তর ইসলামের প্রেমে পূর্ণ হয়।

কোন কোন মনিষী এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-

'দি স্কট্‌স্‌ম্যান' (পত্রিকা) লিখিয়াছেন, "তুলনা মূলক ধর্ম্ম গবেষণাকারীরা বাস্তবিক এই পুস্তক অতি আদরের সহিত অর্ভ্যথনা করিবেন।"

পি, ই, কিদাউ, কাল্পেনী দ্বীপ, লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তক ঐশী-তত্ত্বাবলীর একটি প্রশ্রবণ।" 'ব্রিষ্টল টাইমস্ এ্যাণ্ড মিরর' (পত্রিকা) লিখিয়াছিলেন, "অবশ্যই যিনি প্রাচ্যকে এইরূপে সম্বোধন করিয়াছেন, তিনি কোন সাধারণ মানব নহেন।"

'স্পিরিচ্যুয়াল জারনেল' বোষ্টন, লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তক মানবজাতির জন্য একটি খাঁটি সুসংবাদ।"

'থিওসফিক্যাল বুক নোটসে' লিখিত হইয়াছিল, "এই পুস্তক মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র।"

'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তক অত্যন্ত মুগ্ধকর ও প্রীতিদায়ক। ইহার ভাবধারা স্পষ্ট, সর্ব্বাঙ্গীন ও জ্ঞানপূর্ণ। পাঠকের মুখ হইতে আপনাপনি ইহার প্রশংসা নির্গত হয়। বাস্তবিক এই পুস্তক মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও আলিহী ও সাল্লাম) ধর্ম্ম পাঠেচ্ছু প্রত্যেকেরই হাতে থাকার যোগ্য।"

'মুসলিম রিভিউ' লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তকের পাঠক ইহার মধ্যে বহু বিশুদ্ধ, গভীর, মৌলিক এবং আত্মার উদ্বোধনকারী ভাবরাশি প্রাপ্ত হইবেন। মুসলিম, অমুসলিম সকলের পক্ষেই তাহা প্রীতিকর। আমরা অত্যন্ত জোরের সহিত এই পুস্তকটি অনুমোদন করিতেছি।" (এই সকল অভিমত ইংরাজী হইতে অনূদিত এবং কেবল মাত্র নমুনা স্বরূপ প্রদত্ত হইল। নতুবা এই প্রকার বহু অভিমত পাওয়া গিয়াছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য ১৯১২ খৃঃ অব্দের জুলাই সংখ্যা 'রিভিউ অব্ রিলিজিয়ন্স' এডিশন দেখুন)।

বিনীত গ্রন্থকারের একজন বিশেষ অনুগ্রাহক এবং টিউটার লাহোর গবর্ণমেন্ট কলেজের ইংরাজীর প্রধান প্রফেসার মিঃ জি, এ, ওভেন্‌জ মহোদয়কে আমি উল্লেখিত ইংরাজী অনুবাদ এক কপি পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে পত্র দ্বারা জানাইলেন যে, তিনি অতিশয় আগ্রহ ও প্রীতির সহিত উহা পাঠ করেন এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, এই পুস্তক পাঠে খৃষ্টান জগতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি ছড়াইয়াছে, বহুল পরিমাণে অপসারিত হইবে।

ইসলামের প্রচারের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া জামাতের প্রচেষ্টা ঃ

ইসলাম প্রচার উপলক্ষে হযরত মির্যা সাহেব এবং তাঁহার খলিফাগণের সমবেত তবলীগ প্রচেষ্টা যাহা করা হইয়াছে এবং করা হইতেছে, সংক্ষেপে এখন আমি বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বে ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের জামাতের লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে কয়েক লক্ষ মনে করা হয় (বর্তমানে দুইকোটির উর্দ্ধে-প্রকাশক)। প্রকৃতপক্ষে, যাঁহারা চাঁদা দেন, এবং যাঁহারা সাহায্য করেন, এইরূপে সঙ্গবদ্ধ, সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা আশি হাজারের অধিক নয়। বস্তুতঃ আমাদের জামাতে গরীব লোকের সংখ্যাই অধিক। ধনীগণের সংখ্যা অত্যল্প বা নামে মাত্র। এই দারিদ্রই এই জামাতের সত্যতার একটি লক্ষণ। কারণ, খোদায়ী সেল্‌সেলাগুলিতে প্রথমে গরীব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণই যোগদান করেন। কোরআন শরীফে উক্ত হইয়াছে, হযরত নূহ্‌ আলায়েহেস্‌ সালামের বিরুদ্ধবাদীরা ইহাই বলিতঃ *"আরাযেলুনা বাদিয়ার রায়"*–"নুহের অনুবর্ত্তী এই যে সমস্ত লোক, ইহারা সকলেই একেবারে গরীব ও দুর্ব্বল।" সেইরূপে, রোমক সম্রাট হারকিউলিসের প্রশ্নের উত্তরে আবু সুফিয়ানও এই উত্তরই দিয়াছিলেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করেন, "মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌কে (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম) গরীব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরা স্বীকার করিতেছে? না, ধনী ও বড় বড় লোকেরা মানিতেছে?" আবু সুফিয়ান বলিয়াছিলেন, "বাল্‌ যুআফাউহুম," "তাঁহাকে গরীব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই স্বীকার করে।" বস্তুতঃ, আল্লাহতা'লার সুন্নত, তাঁহার ইহাই বিধান যে, এলাহী জামাতের শুরুতে দুর্ব্বল ব্যক্তিগণই অধিক প্রবিষ্ট হন এবং বড় লোকেরা যোগদান করেন পরে। হযরত মসীহ্‌ নাসেরীও (আঃ) ইঞ্জীলে বলিয়াছেন, 'ধনীরা গরীবদের বহু পরে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।' ইহাতে হেকমত এই যে, প্রথমতঃ ঈমান এবং আমলে সালেহার জন্য নানা প্রকার ত্যাগের আবশ্যক। ধনীরা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বশতঃ তজ্জন্য প্রস্তুত থাকেন না। তাঁহাদের গৌরব, তাঁহাদের বিলাসপরায়ণতা, আরাম-প্রিয়তা, ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা এলাহী সেল্‌সেললায় যোগদানে তাঁহাদের পরিপন্থী হয়। দ্বিতীয়তঃ, খোদাতা'লা শুরু শুরুতে সত্য ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানে গরীবদিগকেই দাখিল করিয়া পৃথিবীতে এই দৃশ্য প্রদর্শন করেন যে, প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ তাঁহারই পরিচালিত এবং তিনিই ইহাকে স্থাপন করিয়াছেন। নতুবা, এই জামাতের যে শক্তি ও সামর্থ্য তাহা ত ইহাতেই প্রকাশ পায় যে, এই জামাতে কতিপয় মুষ্টিমেয় গরীব ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই মাত্র যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় গরীব লোকদের জামাত যে কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা বড় বড় ধনী লোকদের শক্তিশালী জামাত পৃথিবীতে করিবার নাই। এই জন্য ইহা পৃথিবীবাসীর জন্য একটি মহানিদর্শন। যাহা হোক, আমাদের জামাত অর্থাৎ আহমদীয়া জমাত সাধারণতঃ গরীব লোকদের মাত্র একটি জামাত।

এই ভূমিকার পর আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে, হযরত মির্যা সাহেব এবং তাঁহার খলীফাগণ ইসলাম-প্রচারের জন্য যে সকল প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন বলিতেছি। যখন হযরত মির্যা সাহেব আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহাকে 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম সংস্কারক) করিয়াছেন, তখন তিনি একটি ইস্তাহার বিশ হাজার সংখ্যায় ইংরাজী ও উর্দ্দু ভাষায় মুদ্রিত করাইয়া ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় বহুলরূপে বিতরণ করেন। এই ইস্তাহারে তিনি বলিলেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে ইসলামের খেদমতের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং, ইসলাম সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ বা কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে পারে। তিনি তাহার সন্তোষ করিবেন এবং প্রত্যক্ষ নিদর্শনও দেখানো হইবে। তারপর, তিনি তাঁহার কার্য্যারম্ভ করিলে পর বিভিন্ন জাতির সহিত তাঁহার যে মহাসংগ্রাম হয় উহার এক অতি সংক্ষিপ্ত কাঠামোর উল্লেখ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার সমগ্র জীবন জেহাদের পুরোভাগে কাটিয়াছে। বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করেন যে, তিনি কখনো এক মুহূর্তও কোন শান্ত সিপাহীর ন্যায় অস্ত্র ত্যাগের দ্বারা বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। অনেক সময় তিনি বলিতেন যে, পানাহার এবং বাহ্য-প্রস্রাব ইত্যাদির জন্য যে সময় অতিবাহিত হইত, তজ্জন্যও দুঃখ বোধ করেন। জীবন কাল সঙ্কীর্ণ। এই সময় ধর্ম্মের সেবায় অতিবাহিত হইলে, ভাল হইত। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ তবলিগী পুস্তক প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাকে তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। লিখার মধ্যেই খোদার পয়গাম আসিল। তিনি পরম প্রেমময়ের নিকট যাইয়া মিলিত হইলেন। ঐ পুস্তক অসম্পূর্ণ রাখায় এই ঐশী কৌশল নিহিত ছিল বলিয়া মনে হয় যে, ঠিক যুদ্ধাবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হওয়া যেন জগদ্বাসীর নিকট প্রকাশিত হয়। তিনি উহা শেষ করিবার পর গ্রন্থ অন্য প্রণয়ন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ওফাত পাইলেও যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহার জীবন পাত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা স্পষ্টতঃ, ইহা অপেক্ষা অধিক মহান, অধিক সম্মানিত। তিনি ৮০টি অপেক্ষাও অধিক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি অতি বৃহদাকার। তারপর, শত শত ইস্তাহার, হাজার হাজার সংখ্যায় প্রকাশ করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই উর্দ্দু ভাষায় লিখিত। আরবী ভাষাতেও যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তকাবলী লিখিত। সেইগুলি আরব দেশ সমূহ, মিশর, সিরিয়া, ফেলিস্তিন প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়। ফারসী ভাষাতেও তাঁহার পুস্তক আছে। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে ধর্ম্মসাহিত্যের কোন বিভাগই পরিত্যক্ত হয় নাই। এক দিকে যেমন অন্যান্য ধর্ম্মের ব্যর্থতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তেমনি ইসলামের সত্যতা এবং ইহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক ইহার পূর্ণ মর্য্যাদা স্থাপন করা হইয়াছে। মোসলমানগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ধারণা সমূহের সংস্কার সাধন এবং নিজ জামাতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধনের প্রতিও সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার জীবন কালেই তিনখানা উর্দ্দু মাসিক পত্র এবং একখানা ইংরাজী মাসিক নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। তন্মধ্যে ইংরাজী মাসিক 'রিভিয়ু অব্ রিলিজিয়ন্‌সের' কার্য্য সম্বন্ধে একজন আমেরিকান পাদ্রীর অভিমত দৃষ্টান্তস্বরূপে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

"এই মাসিক পত্রটির নামেই ইহার কার্য্য প্রকাশ পায়। কারণ, ধর্ম্মসমূহের এক মহাবিস্তীর্ণ আয়তন ব্যাপী ইহার কর্ম্মক্ষেত্র। ধর্ম্মীয় বিষয়াবলীর এক সুবিস্তীর্ণ অঙ্গনে ইহা নজর করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, সনাতন ধর্ম্ম, আর্য্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ, থিওসোফি, শিখ ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, জৈন ধর্ম্ম, জরথস্ত্রীয় ধর্ম্ম, বাহাই ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম ও খৃষ্টান জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের সমালোচনা এই পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সেইরূপ, ইহা ইসলামের প্রাচীন-আধুনিক শাখা সমূহ, যেমন শিয়া, আহলে হাদীস, খারেজী, সুফি এবং বর্ত্তমান যুগে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খান ও সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ নেতাগণের ভক্তদের সম্বন্ধে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছে।" (পাদ্রী এইচ, এ, ওয়েল্‌টার এম্‌-এ প্রণীত "আহমদীয়া মুভমেন্ট," ১৭ পৃঃ)

কাওনণ্ট্ টলস্টয়, বিখ্যাত রশিয়ান গ্রন্থকার লিখিয়াছিলেন, "এই পত্রের ভাবাবলী অতি গুরুত্বপূর্ণ ও অতি সত্য।"

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্ ইসলামের সর্ব্ব প্রধান সম্পাদক প্রফেসার হাওষ্টমা লিখিয়াছেন, "এই পত্রিকা অতিশয় মনোমুগ্ধকর।"

রিভিয়ু অব্ রিভিউজ, লণ্ডন, লিখিয়াছে, "ইয়ুরোপ ও আমেরিকার যে সকল ব্যক্তি মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) ধর্ম্ম সম্বন্ধে জানিতে আগ্রহান্বিত তাঁহারা অবশ্য এই পত্রের গ্রাহক হইবেন।"

মিস্ হান্ট (পয়েট লরেট) আমেরিকা হইতে লিখিয়াছেন, "এই পত্রের প্রত্যেক সংখ্যাই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সভ্যরূপে পরিচিত জাতিরা এ যুগে পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়া থাকে, এই পত্র সেগুলি আপনোদন করে।" (উল্লেখিত অভিমতগুলি ইংরাজী হইতে অনূদিত। বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'রিভিউ অব্ রিলিজিয়ন্‌স্' দেখুন)।

সেইরূপ, আহমদীয়া জামাতের মাসিক ও অন্যান্য পত্রগুলি স্ব স্ব সীমানার মধ্যে ইসলামের খেদমত করিতেছে। হযরত মির্যা সাহেবের ওফাতের পর জামাত যতই উন্নতি করিতেছে, আমাদের ধর্ম্মীয় পত্রসমূহ ততই বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। বর্ত্তমানে পাঁচটি উর্দ্দু পত্রিকা (একটি দৈনিক, তিনটি সাপ্তাহিক, একটি পাক্ষিক) এবং দুইটি মাসিক পত্র আছে। তদ্ব্যতীত একটি ইংরাজী ত্রৈমাসিক, একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকাও আছে। ডাচ ও জার্ম্মান ভাষায়ও কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হইতেছে। [বাংলা ভাষায় পাক্ষিক 'আহমদী' বাহির হয়-অনুবাদক] তদ্ব্যতীত হ্যাণ্ডবিল, প্যামফ্ল্যাট, এবং বই-পুস্তকও বহু সংখ্যায় প্রকাশ পাইতেছে। কাদিয়ান হযরত মির্যা সাহেবের সময় একটি গণ্ড গ্রাম ছিল। এখন এখানে কয়েকটি উর্দ্দু মুদ্রণ যন্ত্র আছে। তদ্ব্যতীত বহু দপ্তর এবং স্কুল কলেজ ছাড়া ধর্ম্ম শিক্ষার এক মহান বিদ্যালয়ও আছে। উহাতে দীনিয়াত, আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ইসলাম প্রচারার্থে মোবাল্লেগগণ প্রস্তুত হন। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র ফযলে দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে, বিশেষতঃ খৃষ্টান ও মুশরিক দেশগুলিতে তবলীগের এক ব্যাপক ও আশিষমন্ডিত কর্মকান্ডের বিস্তার দেওয়া হইয়াছে এবং দীনের সেবায় জীবন উৎসর্গীকৃত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বহুল সংখ্যক মুবাল্লেগ ও জামাতের সর্বসাধারণ অসংখ্য নিষ্ঠাবান ব্যক্তিগণ দিবারাত্র ইসলামের প্রচারকার্য্যে নিয়োজিত

রহিয়াছেন। সুতরাং এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে আল্লাহ্ ও রসূল (রঃ)-এর কলেমা ও বাণীকে সমুন্নত করার স্রোতধারা খুব জোরে-শোরে প্রবহমান রহিয়াছে, যদ্দরুন এই সমস্ত দেশে এক অর্থবহ মহান পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। যে সকল খ্রীষ্টান দেশে ইসলামের প্রত্যেক বিষয়কেই আপত্তির দৃষ্টিতে দেখিত এবং নাউযুবিল্লাহ্ আঁ হযরত সল্লালাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তাহাদের নাপাক হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়া উল্লসিত হইত, এখন তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া তাহা সঠিক মূল্যায়ন ও প্রশংসার দিকে মোড় নিয়াছে, যাহা আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে ইসলামের স্বপক্ষে নিঃসন্দেহে সত্যিকার মহা বিপ্লবের ইঙ্গিত বহন করিতেছে।* হযরত মির্যা সাহেব আজ হইতে পঞ্চান্ন (বর্তমানে একশত-প্রকাশক) বৎসর পূর্বে তাঁহার আধ্যাত্মিক চক্ষে ইসলামের এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেন এবং ইসলামের বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয় সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন ঃ

"আসমান পর্ দা'ওয়াতে হক্ক কে লিয়ে এক্ জোশ হ্যয়/ হো রাহা হ্যয় নেক তাবওয়োঁ পর্ ফিরিশতোঁ কা উতার"॥

আ রাহা হ্যয় ইস্ তরফ আহ্‌রারে ইয়োরোপ কা মেযাজ/ নব্‌য ফের্ চালনে লগি মুরদোঁ কি নাগাহ্ যিন্দাওয়ার॥

কাহ্‌তে হ্যঁয় তাস্‌লীস কো আব আহ্‌লে দানেশ আল্‌ভিদা/ফের হুয়ে হ্যয়ঁ চাশ্‌মায়ে তৌহীদ পর আয্‌জাঁ নিসার॥

বাগ মেঁ মিল্লাত কে হ্যয় কোই গুলে রা'না খিলা/ আয়ী হ্যয় বাদে সাবা গুলযার সে মাস্তানাওয়ার॥

আ রহি হ্যয় আব্ তো খুশ্‌বু মেরে ইউসুফ কি মুঝে/ গো কহো দিওয়ানা ম্যয়ঁ কর্‌তা হুঁ উস্‌কা ইন্তেযার॥

অর্থাৎ, 'আকাশে সত্যের আহ্বানের উদ্দেশ্যে এক আলোড়ন বিরাজ করিতেছে। সচ্চেতা সজ্জনদের উপরে ফিরিশ্‌তাদের অবতরণ ঘটিতেছে।

এইদিকে ইউরোপের স্বাধীন চেতাদের মন-মানিসকতা ধাবমান হইয়াছে। মৃতদের শিরায় সহসা শিহরণ জাগিয়া উঠিয়াছে।

দেখ, এই উম্মতের বাগানে কী মনোরম এক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে!

ভোরের স্নিগ্ধ সমীরণ পুষ্পোদ্যান হইতে বহিয়া হেলিয়া দুলিয়া আসিয়াছে॥

চিন্তাশীল জ্ঞানী-গুনীরা ত্রিত্ববাদকে জানায় বিদায়। তৌহীদের ঝরণা প্রবাহে তারা অতঃপর আত্মহারা হইয়া উৎসর্গ হইয়াছে।

এখন তো আমি আমার ইউসুফের খুশবু পাইতেছি, যদিও আমায় বল কিনা দেওয়ানা; আমি যে তার প্রতীক্ষায় আছি॥

** পাদটীকা ঃ উল্লেখ্য, পুস্তকটি ১৯২২ ইং সালে প্রণিত এবং ১৯৫৮ ইং সালে এর ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।*

দেশ-বিভাগের পর জামাতের দ্বিতীয় কেন্দ্র রাবওয়ায় খোদার ফযলে ইহাপেক্ষাও ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

ইহা হযরত মির্যা সাহেব এবং তাঁহার মুষ্টিমেয় জামাতের প্রচার কার্য্যের একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র। কিন্তু দেখুন, ইহা কত বিরাট কার্য্য খোদাতা'লার ফযলে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। এখন এক দিকে এই কাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যদিও এখনো ইহা অবশ্য প্রারম্ভিক অবস্থা মাত্র। তারপর আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং সাধারণ মোসলমানগণকেও দেখুন, অন্যান্য মোসলমান ৪০ কোটি (বর্তমানে একশত কোটি –প্রকাশক) হাওয়ার দাবী করেন। তাঁহাদের মধ্যে বাদশাহ্‌ আছেন। বড় বড় রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টও আছেন। বড় বড় রিয়াসতের নবাবগণও আছেন। বড় বড় পদপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও আছেন, বড় বড় জায়গীরদার এবং জমিদাররেরাও আছেন। কোটিপতি, লক্ষপতি ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাও আছেন। আমীর কবীর, মহাধনীরা ও দীনের আলেম বলিয়া অভিহিত ব্যক্তিগণও আছেন এবং পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিরাও আছেন। তারপর, আহ্‌মদীয়া জামাতও মাশাল্লাহ্‌, বড় হইয়া উঠিলে মহাপ্লাবনের ন্যায় সারা বিশ্ব প্লাবিত করিতে পারে। বর্তমানে আমাদের জামাতের লোকসংখ্যার কথা উল্লেখ করিলে লোকেরা হাসে। আর্থিক অবস্থা এরূপ যে শতকরা ৭৫

বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রায় একশ' সাতান্নটি দেশে দিন-রাত অধ্যাবসায়ের সাথে নিজেদের ধন, মান, প্রাণ ও সম্পদের ত্যাগ স্বীকার করে ইসলাম ও মানবতার সেবা করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত এ জামাত পঞ্চাশটিরও বেশী ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআন শরীফের তফসীরসহ অনুবাদ প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। শতাধিক ভাষায় কুরআন শরীফ ও হাদীসের বিষয়-ভিত্তিক কতিপয় অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আরো পঞ্চাশটির অধিক ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ মুদ্রণ ও প্রকাশনাধীন রয়েছে। এই জামাত কর্তৃক ইসলামী সাহিত্য সম্বলিত পুস্তক-পুস্তিকা ছাড়াও সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় প্রায় ৫০টি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দেড়শ'র অধিক স্কুল-কলেজ এবং শতাধিক হাসপাতাল আহমদীয়া মুসিলম জামাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ জামাত এখন পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার মসজিদ ও ইসলাম প্রচার কেন্দ্র নির্মাণ করেছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের হাজার হাজার ধর্মহীন ও খৃষ্টধর্মাবলম্বী আজ ইসলাম গ্রহণ করছে। উল্লেখ্য যে, বিগত বছর এক কোটি বিশ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক লোক এই জামাতে দীক্ষিত হয়েছেন।

এ জামাতের বর্তমান খলীফা হচ্ছেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)। তিনি আহমদীয়া মুসিলম জামাতের খেলাফতের ক্রম-ধারায় চতুর্থ খলীফা। তাঁর প্রদত্ত জুমুআর খুৎবা 'মুসলিম টেলিভিশন (MTA)- কর্তৃক ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের ৫টি মহাদেশে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। বাংলাসহ বিশ্বের প্রধানতম ৮টি ভাষায় MTA ইসলামের মহান শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে দিনরাত বিরতিহীন প্রোগ্রাম প্রচার করে চলেছে। সারা দুনিয়ার মানুষকে খাঁটি তৌহীদের ঝান্ডাতলে সমবেত করার লক্ষ্যে ইহা এক অনন্য পদক্ষেপ।- প্রকাশক।

জন সারা দিন পরিশ্রমের ফলে পরিবারের জন্য শুধু এই পরিমাণ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ যে, খোদা না করুন কয়েক দিনের জন্যও কোনরূপে অসুস্থ হইয়া পড়িলে এবং কাজে উপস্থিত না হইতে পারিলে গৃহে অনটন দেখা দেয়। এমতাবস্থায়, লক্ষ্য করলে এই শিশু-জামাতের এবম্প্রকার কার্য্য এবং বড় বড় সম্প্রদায়গুলির ইসলামের খেদমতের নামও স্মরণ নাই। পাঠকগণ, একটু চিন্তা করুন। স্মরণ রাখিবেন ইন্সাফ্ - ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন। "ওয়াল্লাহু ইয়ুহিব্বুল্ মুক্সেতীন।"

হযরত মির্যা সাহেবের সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত ঃ

এখন আমি অ-আহমদী এবং অ-মুসলেমগণের কতিপয় অভিমত যাহা তাঁহারা হযরত মির্যা সাহেব সম্বন্ধে সময় সময় প্রকাশ করিয়াছেন উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। প্রথম অভিমতটি মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বটালবীর। তিনি 'বারাহীনে আহমদীয়ার' সমালোচনা করিতে যাইয়া ইহা প্রকাশ করেন। তিনি তখনো হযরত মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধাবাদী ছিলেন না। মৌলবী সাহেব লিখিয়াছিলেনঃ-

"আমাদের মতে এই কেতাব (অর্থাৎ, হযরত মির্যা সাহেব প্রণীত 'বারাহীনে আহমদীয়া') এ যুগে বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমন পুস্তক যে, ইহার অনুরূপ কোন পুস্তক আজ পর্যন্ত ইসলামে প্রকাশিত হয় নাই। এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। "লাআল্লাহা ইয়ুহ্দেসু বাদা যালেকা আম্রা।" ইহার প্রণেতাও ইসলামের সাহায্যের ব্যাপারে ধন, প্রাণ, লেখনী, বক্তৃতা এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবের দিক হইতে এমনই সত্যনিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত সাব্যস্ত হইয়াছেন যে, ইহার নজীর পূর্ববর্ত্তী মোসলমানগণের মধ্যেও অতি বিরল। আমাদের এই সব কথাকে কেহ এশীয় অতিরঞ্জন বলিয়া মনে করিলে আমাদিগকে অন্ততঃ একটি মাত্র পুস্তকের নাম বলুন যে, উহাতে সকল সম্প্রদায়ের ইসলাম বিরোধীগণের বিশেষতঃ আর্য্য ও ব্রাহ্ম সমাজের এমন জোরে-শোরে সম্মুখীন হইতে পাওয়া যায় এবং দুই চারিজন এরূপ ইসলাম সমর্থকদের চিহ্নিত করুন, যাঁহারা ধন, প্রাণ, কলম ও কথা দ্বারা ইসলামের সাহায্য করা বাদেও আধ্যাত্মিক প্রভাবের দিক হইতেও সাহায্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইসলামের বিরোধী ও এল্হাম অস্বীকারকারীদের সম্মুখীন হইয়া প্রতিযোগিতা মূলক উপায়ে জোরালো এই দাবী জানাইয়াছেন যে, এল্হামের বাস্তবতা সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহ থাকিলে সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং তাঁহার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আস্বাদও জাতিদিগকে গ্রহণ করাইতে পারিয়াছেন। .... গ্রন্থকার ও আমি একই অঞ্চলের অধিবাসী, প্রথম জীবনে যখন আমরা 'কতবী' ও 'শহরে মোল্লা' পাঠ করিতাম, আমরা সহপাঠী ছিলাম। সেইকাল হইতে এখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে পারস্পরিক চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান এবং দেখা-সাক্ষাৎ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। ঐ জন্য আমার একথা বলা যে আমি তাঁহার অবস্থা এবং তাঁহার ভাবধারার সহিত সুপরিচিত, কোন অতিশয়োক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবার নয়।

.... 'বারাহীনে আহমদীয়া' প্রণতা মোসলমানগণের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন এবং ইসলাম বিরোধীদিগকে প্রতিযোগিতা মূলক উপায়ে সম্মুখীন হওয়ার জন্য আহ্বান করিয়া শর্ত্তাবলী নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারো কোন সংশয় থাকিলে সে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে। .... হে খোদা, তোমার অন্বেষীদের তুমি পথ প্রদর্শক! তুমি তাঁহার প্রতি, তাঁহার মাতা পিতার প্রতি, বিশ্বের তোমার সকল প্রিয়ভাজনগণের চেয়ে অধিক দয়া কর। তুমি লোকের মনে এই কেতাবের প্রেম সৃষ্টি কর এবং ইহার আশীষ, ইহার বরকত সমূহ দ্বারা লাভবান কর। তোমার কোন সালেহ্ বান্দার দরুন এই দীনহীন, লজ্জিত গোনাহ্গারকে তোমার দান, তোমার পুরস্কার এবং এই কেতাবের বিশেষাপেক্ষা বিশেষ বরকত ও ইহার আশীষ সমূহের দ্বারা ধন্য হইতে দাও। "ও লিল্ আরদে মিন্ কাসিল কেরামে নাসীবু"-দানশীল মহান ব্যক্তিদের পাত্র হইতে মাটিও যৎকিঞ্চিৎ হইলেও পায়।" ('এশাতুস্ সুন্নাহ্,' ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

সম্ভবতঃ, এখানে একথা বলিবার কোনই প্রয়োজন নাই যে, হযরত মির্যা সাহেব 'মসীহ্ মাওউদ' হইবার দাবী প্রকাশ করিলে এই মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীই সর্বপ্রথমে কুফরী ফতোয়া লইয়া দেশব্যাপী ছুটাছুটি করিয়া হযরত মির্যা সাহেবকে "দাজ্জাল, কাফের, মুল্হিদ এবং ইসলামের গণ্ডী হইতে বহির্ভূত" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "ব-বীন তাফাওতে রাহ্ আয্ কুজা আস্ত তা বকুজা"- 'প্রান্ত দুইটিতে কত তফাত দেখুন'।

এই প্রসঙ্গে যে অভিমতটি এখন আমি উদ্ধৃত করিতেছি, ইহা অমৃতসরের সুপ্রসিদ্ধ অ-আহমদী পত্রিকা 'উকীলের' অভিমত (পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। -প্রকাশক)। হযরত মির্যা সাহেবের ওফাতের পর ইহার 'সম্পাদকীয়তে' প্রকাশিত হয়ঃ

"সেই ব্যক্তি, এক মহামানব। তাঁহার কলম ছিল ঐন্দ্রজালিক। তাঁহার কথা ছিল যাদু। সেই ব্যক্তি! তাঁহার মস্তিষ্ক ছিল মুর্ত্তিমান বিস্ময়। তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রলয়স্বরূপ। তাঁহার কণ্ঠস্বর ছিল কিয়ামত সদৃশ্য। তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে বিপ্লব উপস্থিত হইত। তাঁহার মুষ্টিদ্বয় বিজলির দুইটি ব্যাটারীর মত ছিল। সেই ব্যক্তি ধর্ম্ম-জগতের জন্য ৩০ বৎসর পর্যন্ত ভূমিকম্প ও তুফান স্বরূপ ছিলেন। তিনি কিয়ামতের কোলাহল স্বরূপে গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগকে জাগ্রত করিতেছিলেন। তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন শুন্য হস্তে (অর্থাৎ দুনিয়া যথাযথ তাঁহার কদর করিতে পারে নাই, অথচ তিনি হেদায়াতের তোহ্ফা নিয়া আসিয়াছিলেন এবং আকিদতের পুষ্প লইয়া বিজয়মাল্যে ভুষিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন-গ্রন্থকার) মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর মহাপ্রয়াণ শিক্ষণীয় নয়, এরূপ নহে। যাঁহারা ধর্ম্ম-জ্ঞান জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন, এইরূপ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পৃথিবীতে আসেন না।"

মির্যা সাহেবের মহাপ্রয়াণ-তাঁহার কোন কোন ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে ঘোর বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার এই চিরবিদায়ে মুসলমানগণ, হ্যাঁ, শিক্ষিত ও দীপ্তবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানদিগের অন্তরে এই তীব্র অনুভূতির সঞ্চার করিয়াছে যে, তাহাদের একজন মহান ব্যক্তিকে তাহারা হারাইয়াছে, আর সেই সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় ইসলামের ঐ শক্তিশালী মহান প্রতিরোধেরও পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে, যাহা ওতপ্রোতভাবে তাঁহারই সহিত সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যে ইসলাম বিরোধীগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজন বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করিতে থাকেন তাঁহার এই অসামান্য বৈশিষ্ট্য আমাদিগকে উক্ত অনুভূতির কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য করে।

খ্রীষ্টান ও আর্যসমাজীদের মোকাবেলায় মির্যা সাহেব প্রণীত যে ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সর্বসাধারণের মধ্যে সমাদর ও ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই রচনাবলীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য, আজ যখন ইহা স্বীয় কার্য সম্পন্ন করিয়াছে, আমাদের তাহা অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার এই প্রতিরোধ বৃটিশ রাজশক্তির প্রাণ-কেন্দ্রস্বরূপ, রাষ্ট্রীয় ছত্রচ্ছায়ায় গড়িয়া উঠা খ্রীষ্টানদের প্রাথমিক প্রভাব-প্রতিপত্তিকে নস্যাৎ করিয়া দেয়। কেবল তাহাই নয় বরং তাঁহার এই প্রতিরোধে খোদ খ্রীষ্টধর্মের ধূম্রজালও ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া হাওয়ায় বিলীন হইতে আরম্ভ করে।

মোট কথা, মির্যা সাহেবের এই খিদমত ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে এহ্‌সানের ভারী বোঝার নীচে রাখিবে। তিনি কলমের জেহাদকারীগণের প্রথম সারিতে থাকিয়া ইসলামের পক্ষ হইতে প্রতিরোধের কর্তব্য পালন করিয়াছেন এবং এইরূপ সাহিত্যকর্ম স্মৃতি হিসাবে রাখিয়া গিয়াছেন যে, যতদিন মুসলমানদিগের ধমণীতে তাজা শোণিত প্রবাহ থাকিবে এবং ইসলামের সংরক্ষণ ও সমর্থনের প্রেরণা ও আবেগ-অনুভূতি তাহাদের জাতীয় চরিত্রের শিরোনামরূপে পরিদৃষ্ট হইবে, ততদিন পর্যন্ত এই সাহিত্যকর্মের স্মৃতি কায়েম থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত, আর্যসমাজের বিষাক্ত দাঁত উচ্ছেদেও মির্যা সাহেব ইসলামের সবিশেষ খিদমত সম্পাদন করিয়াছেন। আর্যসমাজের মোকাবেলায় মির্যা সাহেবের ক্ষুরধার রচনাবলী এই দাবীর (সত্যতার) উপর স্পষ্ট আলোকসম্পাত করিতেছে যে, ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিরোধের ধারা যে পর্যায় পর্যন্ত যত সম্প্রসারিতই হোক না কেন, সেক্ষেত্রে তাঁহার এই রচনাবলীকে কখনও উপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না। স্বভাবজ প্রতিভা ও ধী-শক্তি, অনুশীলন ও দক্ষতা এবং ক্রমাগত বহস-বিতর্ক মির্যা সাহেবের মধ্যে এক অনন্য শান ও মর্যাদার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। নিজের ধর্ম (ইসলাম) ব্যতীত অপরাপর ধর্মের উপর (তাঁহার) দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক এবং নিজের জ্ঞানলব্ধ তত্ত্ব-তথ্যকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে সক্ষম ছিলেন তিনি। তবলীগ ও হিতোপদেশের দ্বারা তাঁহার মধ্যে এই প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়াছিল যে, প্রতিপক্ষ যে-কোন বিদ্যাবুদ্ধি, যোগ্যতা, ধর্ম ও মতবাদেরই হউক না কেন তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত চমৎকার জবাবের দ্বারা অন্ততঃ একবার সে অবশ্যই গভীর চিন্তাভাবনায় পড়িয়া যাইত। ভারতবর্ষ আজ ধর্মসমূহের লীলাভূমিই বটে, যেখানে ছোট-বড় সব ধর্ম মজুদ এবং পরস্পর সংঘাত-সংঘর্ষের মাঝে প্রত্যেকে

যে নিজের অস্তিত্বের বহুল ঘোষণা দিতে থাকে ইহার দৃষ্টান্ত হয়ত দুনিয়ার অন্য কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মির্যা সাহেবের দাবী ছিল যে, তিনি হইতেছেন উহাদের সকলের জন্য ন্যায়বিচারক মীমাংসাকারী (হাকাম ও আদাল)। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য এবং ইহাতে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই যে, এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্মের মোকাবেলায় ইসলামকে স্পষ্টতঃ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরার প্রকৃষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। এবং ইহা ছিল তাঁহার স্বভাবজাত ক্ষমতা ও প্রতিভারই ফলশ্রুতি; অধ্যয়নের অকৃত্রিম আগ্রহ এবং বহুল অনুশীলনের ফসল। ভারতবর্ষের ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে এই শান ও মর্যাদা বিশিষ্ট এহেন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যিনি তাঁহার উৎকৃষ্টতম ইচ্ছা-আকাঙক্ষাকে ধর্মের অধ্যয়ন ও সেবায় নিয়োজিত করেন, ভবিষ্যতে আর সে-আশা নাই।"

তৃতীয় অভিমত হিসাবে আমি এখানে দিল্লির পত্রিকা 'কার্জন গ্যাজেট'-এর অভিমত উপস্থাপন করিতে চাই। এই পত্রিকার সম্পদক মির্যা হায়রত দেহ্‌লভী হযরত মির্যা সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষ্যে লিখিয়াছেনঃ

"আর্যসমাজী ও খ্রীষ্টানদের মোকাবেলায় মরহুম মির্যা সাহেব ইসলামের যে উৎকৃষ্ট খিদমত করিয়াছেন, উহা বস্তুতঃই অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। তিনি মুনাযারার (ধর্মীয় বিতর্কের) রূপকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিয়াছেন এবং হিন্দুস্থানে এক নতুন সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। একজন মুসলমান হিসাবে এবং গবেষণাকারীরূপে আমি ইহা স্বীকার করিতেছি যে, কোন বড় হইতে বড় আর্যসমাজী অথবা পাদ্রীর এই ক্ষমতা ছিল না যে, মরহুমের মোকাবেলায় তাহার মুখ খুলে।... যদিও মরহুম পাঞ্জাবী ছিলেন কিন্তু তাঁহার কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, আজ সারা পাঞ্জাবে কেন বরং সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহার পর্যায়ের শক্তিশালী লেখক নাই। তাঁহার রচনা নিজ গুণে ও মানে সম্পূর্ণ অপূর্ব। বস্তুতঃ তাঁহার কোন কোন রচনা পড়িলে আত্মবিভোর হইতে হয়। তিনি ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী, বিরুদ্ধাচরণ এবং কু-সমালোচনার অগ্নিসাগর পার হইয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন এবং উন্নতির উচ্চতম মর্গে উপনীত হইয়াছিলেন" (কার্জন গেজেট, দিল্লী ১লা জুন, ১৯০৮)।

আমি এখানে হিন্দুস্থানের বিখ্যাত একটি ইংরেজী পত্রিকা 'পায়োনিয়ার' এলাহাবাদ-এর অনূদিত অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। ঐ পত্রিকাটি হযরত মির্যা সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষ্যে উহা প্রকাশ করেঃ

"যদি বিগতকালের ইস্রাইলী নবীগণের মধ্যেকার কোন নবী উর্দ্ধলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যুগে প্রচার কার্য করেন তাহা হইলে বিংশ শতাব্দীর এই পরিস্থিতিতে ইহার চাইতে বেমানান বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না, যেমন কিনা ছিলেন মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী। আমাদের সেই যোগ্যতা নাই যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন করিতে পারি। সে সম্পর্কে কোন রায় দেওয়ার মত আমাদের যোগ্যতা নাই কিন্তু আমরা ইহা জানি যে, মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবকে নিজের সম্পর্কে অথবা তাঁহার দাবীর সম্পর্কে কখনও কোন সন্দেহ-সংশয় স্পর্শ করে নাই। তিনি পরিপূর্ণ সততা ও সত্যতার সঙ্গে

এবং পূর্ণ আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত এ বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় ও বিশ্বাস রাখিতেন যে, তাহার উপর ইলহামে-ইলাহী (ঐশীবাণী) নাযেল হয়, আরও এই যে, তাঁহাকে এক অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দান করা হইয়াছে। ঐ সকল ব্যক্তি যাঁহারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে জগতে এক অলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বস্তুতঃ তাহাদের মনমানসিকতায় মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের সঙ্গে অনেক বেশী সাদৃশ্য রাখেন সেই ব্যক্তির তুলনায় যেমন রহিয়াছেন এই যুগে ইংল্যাণ্ডের বিশপ। যদি আর্নেস্ট রিনন (ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক) বিগত বিশ বৎসর কাল হিন্দুস্থানে থাকিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় মির্যা সাহেবের কাছে যাইতেন এবং তাঁহার অবস্থাবলী পর্যবেক্ষণ করিতেন। ইহার ফলশ্রুতিতে বনী ইস্রাইলী নবীদের বিস্ময়কর অবস্থাবলীর উপর এক নতুন আলো পড়িত। মোট কথা, কাদিয়ানের নবী ঐ সকল ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন, যাঁহারা সবসময় দুনিয়াতে আসেন না।"

আরেকজন প্রণেতা মিঃ এইচ. এ. ওয়াল্টার, যিনি হিন্দুস্থানের ক্রিশ্চেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ছিলেন, তিনি তাঁহার রচিত আহ্‌মদীয়া মুভমেন্ট গ্রন্থে লিখেন ঃ-

"এ বিষয়টি সর্বতোভাবে প্রমাণিত যে, মির্যা সাহেব স্বভাবতঃ সাদা-সিধা, সরল এবং মহানুভবতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বিরোধীদের পক্ষ হইতে কঠোর বিরুদ্ধাচারণ এবং অত্যাচার-উৎপীড়নের মোকাবেলায় তিনি যে নৈতিক সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন নিশ্চয় তাহা প্রশংসাযোগ্য। কেবল চুম্বকধর্মী আকর্ষণী শক্তি এবং চিত্তাকর্ষক চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিই এরূপ লোকদের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা অর্জন করিতে পারেন, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন আফগানিস্থানে নিজেদের বিশ্বাসের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন কিন্তু মির্যা সাহেবের আঁচল ত্যাগ করেন নাই। আমি ১৯১৬ সালে কাদিয়ানে গিয়া যদিও তখন মির্যা সাহেবের মৃত্যুর পর আট বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল, এইরূপ একটি জামাত অবলোকন করি যাহার মাঝে ধর্মের জন্য সেই সত্যিকার প্রেরণা ও শক্তিশালী উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল, যাহা হিন্দুস্থানের অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে আজ অনুপস্থিত। কাদিয়ানে যাইয়া মানুষ অনুধাবন করিতে পারে যে, একজন মুসলমান মহব্বত ও ঈমানের যে রূহ্ (প্রাণ) অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে অনর্থক খুঁজিয়া থাকে তাহা আহমদের জামাতে সে পর্যাপ্ত পরিমাণ ও অজস্রধারায় পাইবে।"

- ৪ -